اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

এল্‌ম ও আ'মল (১)

ভলিউম-৩

লেখক
কুত্‌বে দাওরান, মুজাদ্দিদে যমান, হাকীমুল উম্মত
হযরত মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানভী চিশ্‌তী (রঃ)

অনুবাদক
মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান এম, এম; এফ, আর
প্রাক্তন সহকারী অধ্যক্ষ, রায়পুর আলিয়া মাদ্রাসা, নোয়াখালী

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার ঃ ঢাকা

সূচী-পত্র

আল্‌ফাযুল কোরআন ... ... ২—৮৭

কোরআন সম্পর্কে—৩, তেলাওয়াতে কোরআন ফরযে কেফায়াহ্—৩, হরূফে মোকাত্তাআত—৫, মুসলমানের প্রকারভেদ—৬, আধুনিক শিক্ষা এবং উন্নতি—৭, আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের রহস্য—৯, আলেমদের সংসর্গে থাকার প্রয়োজনীয়তা--৯, আধুনিক শিক্ষা লাভের পদ্ধতি—১২, ধর্মীয় এবং পার্থিব স্বার্থের প্রভেদ—১৩, স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া—১৪, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এড়াইবার বাহানা—১৬, অর্থের ক্ষেত্র—১৭, শব্দের অর্থ—১৯, কোরআনের শব্দগুলির হেফাযত—২০, আল্লাহ্‌র আলো নিভিতে পারে না—২২, আল্লাহ্‌র মরযীর প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা--২৫, খোদা তা'আলার সহিত সম্পর্কহীনতা—২৭, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উপায়—৩০, হুযূর (দঃ)-এর মুখস্থ শক্তি ও দৈহিক শক্তি—৩০, শব্দ সংরক্ষণের গুরুত্ব—৩৩, খেলাফতের কর্তব্য—৩৪, বিপদ সঙ্কেত—৩৬, হেফাযতের স্বরূপ—৩৬, বিদ্যা ও গুণবত্তার গৌরব— ৩৮, আখেরাতের মুদ্রা— ৪০, জ্ঞান প্রসূত ও স্বাভাবিক মহব্বত—৪১, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথোপকথন—৪৪, আলফাযে কোরআনের প্রতি মহব্বত—৪৬, কোরআনের শব্দের প্রতি মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা—৪৭, শব্দ ও অর্থের আনন্দ—৪৮, শব্দের গুরুত্ব—৪৯, "মতনবিহীন" কোরআনের উর্দু তরজমা—৫১, উর্দুতে নামায—৫১, বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠের গুরুত্ব—৫২, পার্থিব এবং অপার্থিব অকৃতকার্যতার ফল— ৫৪, আত্ম-সমর্পণ ও অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা—৫৫, আরাম-প্রিয়তার পরিণাম—৫৮, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের শাস্তির রহস্য—৫৯, শাসক শ্রেণী এবং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সম্মানের পার্থক্য—৬০, আওলিয়াদের প্রতি সম্মানের নিয়ম—৬২, এখ্‌লাছের মর্যাদা ও মূল্য—৬৪, কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য—৬৫, সেমার (সঙ্গিতের) শর্ত—৬৭, কবর পাকা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা—৬৮, কবরের ফয়েযের রকম—৬৯, এবাদতের বরকত—৭০, নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর ত্রুটি—৭০, মুর্খ দরবেশদের ভুল—৭২, কলন্দরীর স্বরূপ—৭৩, আলেম সমাজের ভুল—৭৫, আলেম সমাজকে সতর্কীকরণ—৭৯, আমলের উপযোগী দৃষ্টান্ত—৮০, দুনিয়া ও ধর্মের শাস্তির রহস্য—৮০, সাধারণ লোকের সংশোধনের উপায়—৮২, কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্মতত্ত্ব—৮৩, হুরূপে মোকাত্তাআতের রহস্য—৮৫।

তা'মীমুত্ তা'লীম ... ... ৮৮—২০৭

ভূমিকা—৮৯, যাদু বিদ্যা—৮৯ নিয়তের প্রভাব—৯১, এশ্কের মর্যাদা—৯৩ শরীয়ত-বিধান এবং কারণ—৯৭, শরীয়তের মুলনীতি—৯৯, আত্মগরীমা ও অহংকার—১০৩, যুক্তি সঙ্গত কারণ—১০৫ বিধানসমূহের হেকমত—১০৮, আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক—১১০, হারাম হওয়ার ভিত্তি—১১২, ওযূ ছাড়া নামায—১১৪, লীডারদের নামায—১১৫, মৌলবীরপরিচয়—১১৬, বিস্মিল্লাহ্ পড়া—১১৮, তন্ত্র-মন্ত্র এবং ওযীফা আমল করা—১২১, মোহিনী শক্তি ও মেস্মেরিযমের স্বরূপ—১২২, কোরআনহাদীসে অনুরূপ আমলের সীমা—১২৬ যাদুর ক্রিয়া—১২৮, কাশফের বিপদ—১৩১, স্ত্রী-শিক্ষার পদ্ধতি—১৩২, ধর্ম-কর্মে সীমাহীন বাড়াবাড়ি—১৩৬, জনসাধারণের বিশ্বাস—১৩৮, ওয়ায়েযগণের রুচি—১৩৯, হারূত-মারূত—১৪১, মাজযুব এবং তরীকত পন্থির প্রভেদ—১৪৬, কামেলদের কামালত—১৪৮, যাদুর নানাবিধ ক্রিয়া—১৫২, প্রশংসনীয় এল্ম—১৫৪ মুনাযারা বা বিতর্কের কুফল—১৫৫, অনিষ্টকর ও হিতকর বিদ্যা—১৬২, আলেমদের ভুল—১৬৫, সাধারণ লোকের ভুল—১৬৬, আলেমদের ত্রুটি —১৭০, আলেমদের প্রতি হেদায়েত—১৭৭, এল্মের পরশমনি—১৮০, এল্মের ফযীলত—১৮২, সংসর্গের ফল—১৮৪, আমীর ও বড় লোকদের ত্রুটি—১৮৬, এলমের মূল্য—১৮৭, তালেবে এল্ম নির্বাচন—১৯০, কতিপয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা—১৯৫, হিতকর বিদ্যা—২০২, কাজের কথা—২০৫।

এল্মের ব্যাপকতা ... ... ২০৮—২৫৫

প্রয়োজনীয় বিষয়ের এল্ম—২০৯, এল্মের আধিক্য—২১০, লয্যতের প্রভেদ—২১৩, খোদা-ভীতি ও একাগ্রতার স্বরূপ—২১৪, সৃষ্টিকর্তা ও জ্ঞানী হওয়া—২১৬, খোদা-ভীতির সীমা—২২০, স্বাদ উপভোগ এবং মোহিত থাকা—২২৩, পারিশ্রমিক এবং খোরাক পোশাকের পার্থক্য—২২৪, নেস্বত বা সম্বন্ধের স্বরূপ—২২৫, পারিশ্রমিক ও খোরাকি-ভাতার প্রভেদ—২২৭, এল্মের হাকীকত—২২৯, তাকওয়ার হাকীকত—২৪১, তাকওয়ার দৃষ্টান্ত—২৪৫, তালেবে এল্মদের ত্রুটি—২৪৬, আলেমদের সম্মান—২৪৮, আন্ওয়ার ও আস্রার—২৪৯, কতিপয় তাওজীহ্—২৫৩।

—×—

মুখবন্ধ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ

সৃষ্টির আদিকাল হইতে কেবল এই উদ্দেশ্যেই আম্বিয়া আলাইহিমুছ্ছালাতু ওয়াস্সালাম প্রেরিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা আল্লাহ্ পাকের সহিত সম্পর্কহারা মানব জাতিকে ওয়ায-নছীহত এবং এরশাদ ও হেদায়তের সাহায্যে পুনরায় আল্লাহ তা'আলার সহিত তাহাদের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া দিবেন। এই মর্মেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

"অর্থাৎ,(হে মোহাম্মদ দঃ !) আপনি (বিভ্রান্ত মানব জাতিকে) সুন্দর নছীহত এবং হেকমতের সহিত আপনার প্রভুর পথের দিকে আহ্বান করুন।"

এই জন্যই যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম উক্ত উদ্দেশ্যকে স্বীয় জীবনের একমাত্র লক্ষ্যরূপে অবলম্বন করিয়াছেন এবং উক্ত উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য দুনিয়ার যাবতীয় লোভ লালসা, ভয়-ভীতি ও তিরস্কার ভর্ৎসনার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দা'ওয়াতে হক্কের মশাল হাতে বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন, একমাত্র তাঁহারাই নবীর সত্যিকারের ওয়ারিশ বলিয়া দাবী করিতে পারেন। এই পবিত্র ও মহান মনীষীদেরই বদৌলতে, অসংখ্য ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বাধা-বিঘ্নের মোকাবেলায়, আজও পৃথিবীর বুকে ইসলামের মশাল প্রজ্জলিত রহিয়াছে। ইন্শাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ইহা প্রজ্জলিতই থাকিবে। এই প্রসঙ্গে হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন :

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِيْ مَنْصُوْرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ -

"অর্থাৎ, আমার উম্মতের একদল সর্বদা সত্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। শত্রু পক্ষ তাহাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। সুতরাং কোন শতাব্দী এবং কোন যুগই এই পবিত্র সত্য-পন্থীর দল হইতে শূন্য থাকিতে পারে না। প্রত্যেক যুগেই ইহাদের এক দল বিদ্যমান থাকিয়া ইসলাম প্রচার করেন এবং আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চে তুলিয়া ধরার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর (রঃ)(জন্ম—১২৮০ হিঃ মৃত্যু—১৩৬২ হিঃ) মহান ব্যক্তিত্ব ছিল এই খোদায়ী সাহায্য প্রাপ্ত দলের শিরোমণি। সমগ্র জগত তাঁহাকে হাকীমুল উম্মত (আত্মার চিকিৎসক) এবং মুজাদ্দিদুল মিল্লাৎ (যুগ সংস্কারক) আখ্যায় আখ্যায়িত করিত। এই আখ্যা বাস্তবিকই তাঁহার প্রাপ্য ছিল। তিনি নিজের রচিত ও সংকলিত প্রায় সহস্রাধিক কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই মহামূল্য ও অমর অবদান ওয়াযসমূহের কতিপয় ওয়ায বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়া বাংলাভাষী ভাইদের খেদমতে পেশ করা হইতেছে।

ধর্মের অপরাপর শাখার ন্যায় পেশাদার ওয়ায়েযগণ জনসাধারণের চক্ষে ধর্মীয় ওয়াযের মর্যাদা খর্ব ও হীন করিয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ ধর্মীয় ওয়াযের নামে বাংলা ও উর্দু ভাষায় আজ পর্যন্ত যে সমস্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে উহা পাঠ করিয়া ধর্মীয় ওয়াযের স্বরূপ সম্বন্ধে জনমনে এরূপ ধারণা জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ধর্মের সুন্নত, মুস্তাহাব এবং কতিপয় নিষ্প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্বন্ধে

অতিরঞ্জিত এবং অচিন্তনীয় বা বিবেক বহির্ভূত ফযিলত ও উদগ্র বাসনা সৃষ্টি এবং মিথ্যা ও অলীক হাদীস এবং সত্যের সহিত সংগতিহীন কাল্পনিক জগতের কতিপয় চিত্তাকর্ষক ও মুখরোচক কেস্সা কাহিনীর সমষ্টির নামই ওয়ায। অবশ্য ইত্যাকার ধারণা পোষণের জন্য তাহাদিগকে দোষারোপ করা যায় না। কারণ সচরাচর যে সমস্ত ওয়ায শ্রবণ বা ওয়াযের বহি পুস্তক পাঠের সুযোগ তাহারা পাইয়া থাকে, সত্য বলিতে কি, উহার অধিকাংশই জ্ঞান বুদ্ধির উন্নতি সাধন এবং সামাজিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার সংস্কার বা সংশোধনের পরিপন্থী। এমনকি, ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের ভুল বিশ্বাস, বিরূপ ধারণা এবং নৈরাশ্যের সৃষ্টি হইতে থাকে।

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার এই সংকলন পাঠ করিবার পর ইহারা নিজেদের সেই ভ্রান্ত ধারণা পরিবর্তন করিতে নিশ্চয়ই বাধ্য হইবে। তাহাদের চোখ খুলিয়া যাইবে। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, সত্যিকার ওয়ায, যাহা নবীদের দায়িত্ব ছিল, কাহাকে বলে এবং মানব প্রকৃতির উন্নতি বিধান এবং সামাজিক জীবন গঠন ও উহার উন্নতি সাধনে ইহা কত প্রয়োজনীয় এবং কত উপকারী।

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার প্রশংসায় কিছু বলিতে যাওয়া সূর্যকে আলো দেখানোরই সমতুল্য :

آفتاب آمد دلیل آفتاب অর্থাৎ, সূর্য নিজেই নিজের প্রমাণ।

مشک آنست که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید -

"আতরের সুগন্ধিই আতরের পরিচয়; আতর বিক্রেতার প্রশংসার মুখাপেক্ষী নহে।"

মাওয়ায়েযে আশরাফিয়ার পাঠকবৃন্দ প্রথম দৃষ্টিতেই উহার মধ্যে নিম্নলিখিত গুণাবলী উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

১। এই ওয়াযগুলি কোরআন-হাদীসের সত্যিকারের ব্যাখ্যা হিসাবে ইহার উপকারিতা কোন স্থান বা কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; বরং ইহা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক স্তরের জন্য সর্বদা প্রাথমিক কালের ন্যায়ই সমান উপকারী ও শিক্ষণীয়।

২। প্রতিটি ওয়াযের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত—প্রত্যেকটি কথাই জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্ম তত্ত্ব সারগর্ভ চিন্তার বিকাশ এবং সংস্কারমূলক হেদায়াতে পরিপূর্ণ। শুধু জোর গলাবাযী ও বিচিত্র বর্ণনা ভঙ্গী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থহীন ও অমূলক বাক্যের সংমিশ্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

৩। প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত, সমস্ত কেস্সা কাহিনী এবং কৌতুকবাক্যই উপদেশমূলক এবং জ্ঞান বর্ধক। এমন কোন কেস্সাই ইহাতে নাই যাহা কেবল সাময়িক আনন্দ প্রদান এবং শ্রোতৃবর্গকে চমৎকৃত করিয়া বাহবা হাসিল করার উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪। ইহাতে মিথ্যা ও অলীক রেওয়ায়েত এবং কাল্পনিক কেস্সা কাহিনীর নাম গন্ধও নাই। যাহাকিছু বলা হইয়াছে—নির্ভরযোগ্য সনদ, সঠিক বরাত এবং সুষ্ঠু জ্ঞান ও বিবেকের কষ্টি পাথরের যাচাই করিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫। পেশাদার ওয়ায়েযদের ন্যায় স্থান, কাল এবং শ্রোতৃবর্গের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রত্যেক ওয়াযে একই জাতীয় কয়েকটা কথা বার বার আওড়ান হয় নাই যাহাতে দুই চারিটি ওয়ায শ্রবণ বা পাঠ করার পরই বিরক্তি ও বিতৃষ্ণভাব উৎপন্ন হয়; বরং ইহার প্রত্যেকটি ওয়াযেই শ্রোতৃবর্গের ধর্মীয় প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী নূতন নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় এবং শরীয়ত বিধানসমূহের হেকমত ও রহস্যসমূহ দৃষ্টিপথে তরঙ্গায়িত হইবে। অর্থাৎ, একটি ওয়ায পাঠ করার পর আর একটি পাঠের পিপাসা বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে।

৬। আমলের ফযিলত বর্ণনা, বেহেশ্‌তের প্রতি আগ্রহান্বিত করা এবং দোযখের ভয় প্রদর্শনের মধ্যেই এই ওয়াযগুলি সীমাবদ্ধ নহে ; বরং অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আহকাম এবং দ্বীনী মাসায়েলের ব্যাখ্যা রহস্য ও হেকমত সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ এবং এল্‌মে মা'রেফাত ও হাকীকতের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, ইহার বিভিন্ন স্তরের অতুলনীয় বিশ্লেষণের মহা মূল্য ও অফুরন্ত ভাণ্ডারে এসমস্ত ওয়ায পরিপূর্ণ।

৭। এই পবিত্র মাওয়ায়েযের সর্বপ্রধান ও মৌলিক বিশেষত্ব এই যে, ইহা এমন একজন মহা পুরুষের ওয়ায যাঁহার কথা ও কাজ এবং ভিতর বাহিরের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। এই কারণেই তাঁহার ওয়াযের মধ্যে কোথাও লৌকিকতা এবং কৃত্রিমতার নাম গন্ধ পর্যন্ত নাই। নিয়মও তাইঃ

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے ضرور -

অন্তর হইতে যে কথা বাহির হয় উহার ক্রিয়া অবশ্যই হয়।" সুতরাং উহার সক্রিয় আকর্ষণে প্রত্যেক শ্রোতা ও পাঠকের অন্তরে সত্যান্বেষণের স্পৃহা এবং নেক আমলের আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে জাগিয়া উঠে। ইহা বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতারই ফল :

این سعادت بزور بازو نیست + تا نہ بخشد خدائے بخشندہ -

"আল্লাহ্‌ তাআলা দান না করিলে এই সৌভাগ্য বাহুবলে অর্জন করা যায় না।"

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের কারণে তৎকালীন বিশিষ্ট আলেমগণ হযরত মাওলানা থানভীর (রঃ) ওয়াযগুলিকে যথাসময়ে শব্দে শব্দে অবিকল নকল করিয়া লওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। এইভাবে তাঁহার অধিকাংশ ওয়াযই লিপিবদ্ধ করা হয়। অতঃপর পুস্তকাকারে প্রকাশ করার পূর্বে সন্দেহযুক্ত হওয়ার জন্য স্বয়ং হযরত মাওলানা কর্তৃক উহার শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করিয়া লন। এই ওয়ায লিপিবদ্ধকারী মানীষীবৃন্দের বদৌলতেই হযরত থানভীর (রঃ) কয়েক শত ওয়ায দ্বারা বিশিষ্ট ও সাধারণ সকল শ্রেণীর লোকের উপকৃত ও লাভবান হওয়ার ধারা আজ পর্যন্ত জারী রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, ইহার তুলনা প্রাচীনকালেও দেখা যায় না। এ সমস্ত ওয়ায পূর্ণ অক্ষতরূপে সংরক্ষিত থাকা তাঁহার অলৌকিক গুণাবলীর অন্তর্গত বটে।

فجزاهم الله تعالى عنا وعن سائر المسلمين خير الجزاء الى يوم الدين -

এমন মহোপকারী মাওয়ায়েয বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন যাবৎ অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। আল্লাহ তাআলা ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা আল্‌হাজ্ব মৌলবী আবদুল করীম সাহেবকে দ্বীন দুনিয়ার উন্নতি দান করুন—তিনি এই বিরাট খেদমত আনজাম দেওয়ার সাহস করিয়াছেন! তাই আজ মাওয়ায়েযের খণ্ডগুলি বাংলা ভাষায় পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করা হইতেছে) প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠক সমাজের পুনঃ পুনঃ তাকীদে দ্বিতীয় জিল্‌দ অতি দ্রুত প্রকাশ করা হইল। ইন্‌শাআল্লাহ অবশিষ্ট মাওয়ায়েযের অনুবাদও পাঠকবৃন্দের খেদমতে ক্রমশঃ পেশ করা হইবে। জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহেবই ইতিপূর্বে হযরত থানভীর (রঃ) সুবিখ্যাত তাফ্‌সীর বায়ানুল কোরআনের বঙ্গানুবাদ 'তাফ্‌সীরে আশ্‌রাফী' এবং 'বেহেশ্‌তী যেওর' ও 'হায়াতুল মুসলেমীন' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত কিতাবগুলি সকল শ্রেণীর লোকের নিকট বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। আল্লাহ পাকের দরবারে দোআ করিতেছি, তিনি যেন তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করেন এবং হযরত থানভীর অবশিষ্ট কিতাবগুলি স্থানীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার তাওফীক দান করেন।

জানাব মাওলানা মোহাম্মদ নূরুর রহমান সাহেব একজন অভিজ্ঞ আলেম ও অনুবাদ কার্যে পারদর্শী। ইতিপূর্বে তিনি সুবিখ্যাত উরদু তফ্সীর বয়ানুল কোরআনের বিরাট অংশ ও পারসী গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সা'আদাত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া বিশেষখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। আমি তাঁহার অনূদিত মাওয়ায়েযে আশ্রাফিয়ার পাণ্ডুলিপি মূল উরদুর সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। তিনি মূল বিষয়-বস্তুর সহিত সংগতি রাখিয়া এমনিভাবে হুবহু অনুবাদ করিয়াছেন যে, ইহা অনুবাদ বলিয়া ধরা যায় না। ইহা অনুবাদকের এক বিরাট কৃতিত্ব। ইহার ভাষা যেমন সরল তেমনি সাবলীল।

বাংলা ভাষায় মাওয়ায়েযে আশ্রাফিয়ার প্রকাশনা বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট সংজোযন এবং স্মরণীয় অবদান বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। আমি আশা করি, দেশের সকল শ্রেণীর লোক ইহার প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দান করিবেন এবং এই কিতাবটি বহুল পরিমাণে কাটতি হইয়া এই শ্রেণীর কিতাবসমূহ প্রকাশনায় প্রকাশকের উৎসাহ বৃদ্ধি করিবে।

এই মাওয়ায়েয একাকী পাঠ করা ছাড়াও সভা-সমিতিতে এবং ঘরে ঘরে পাঠ করিয়া শুনাই-বার যোগ্য। এই উপায়ে নিরক্ষর লোকেরাও ইহা দ্বারা উপকৃত হইতে পারিবে। এল্ম ও আমলের দুর্বলতা লইয়া যে সমস্ত পেশাদার ওয়ায়েয রসমী ওয়ায করিয়া বেড়াইতেছে তাহা শ্রবণ করার চেয়ে এই মাওয়ায়েয পাঠ করা ও শ্রবণ করা সহস্রগুণে উপকারী হইবে। এই মাওয়ায়েযের মধ্যে যেন হযরত থানভী (রঃ) স্বয়ং কথা বলিতেছেন। মাওলানা থানভীর উপস্থিতিতে তাঁহার ওয়ায ত্যাগ পূর্বক যার তার ওয়ায শ্রবণ করা কি কেহ পছন্দ করিবে? (কখনই না।)

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ

هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ -

(হে মোহাম্মদ)! আপনি আমার সেসমস্ত বান্দাদিগকে সুসংবাদ দিন, যাহারা আমার কথা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে, আর ভাল কথার উপর আমল করে। ইহারাই তাহারা…যাহাদিগকে আল্লাহ তাআলা হেদায়ত দান করিয়াছেন। আর ইহারাই বুদ্ধিমান।

ওবায়দুল হক জালালাবাদী,
ফাযিলে দেওবন্দ,
অধ্যাপক, মাদ্রাসা আলীয়া ঢাকা
২৬ শে শা'বান, ১৩৮৬ হিজরী
১০।১২।৬৬ ইং

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

মাওয়ায়েযে আশ্‌রাফিয়া

আল্‌ফাযুল কোরআন

হিজরী ১৩৩১ সালের ২৩শে শা'বান মঙ্গলবার প্রাতঃকালে, মুযাফ্‌ফর নগর জিলার অন্তর্গত কীরানা নগরে জামে মসজিদের মিম্বরে বসিয়া দেড় হাজার লোকের সভায়, সোয়া পাঁচ ঘন্টা ব্যাপী কোরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হযরত থানভী (রঃ) এই ওয়ায করিয়াছিলেন। হযরত মাওলানা যাফর আহমদ ওসমানী ছাহেব উহা লিপিবদ্ধ করেন।

●

[বর্তমানে আমি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতেছি। মুসলমান লেখকদের লেখা কুফরী মিশ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে আর ইউরোপীয়ান লেখকদের লেখাসমূহ ইস্‌লামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। যেন কতিপয় মুসলমান কুফরীর দিকে এবং কতিপয় কাফের ইস্‌লামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অবস্থা দৃষ্টে আশঙ্কা হয়—এই বিপরীতগামী দল যখন নিজ নিজ পথে অগ্রসর হইয়া সীমান্তে উপনীত হইবে, তখন এমন না হইয়া দাঁড়ায় যে, কাফের কুফরী হইতে বহির্গত হইয়া মুসলমান হইয়া যায় আর মুসলমান লেখকগণ ইস্‌লাম হইতে বাহির হইয়া কাফের হইয়া যায়।]

●

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ

بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ

اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ

لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى

عَلَيْهِ وَعَلٰۤى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّاتِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

كَثِيْرًا ○ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٭

الٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

طٰسٓ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۝

কোরআন সম্পর্কে

এখানে দুইটি আয়াত। একটি সূরা-হিজ্‌রের অপরটি সূরা-নমলের। এই দুইটি আয়াত পাঠ হইতেই শ্রোতৃমণ্ডলী বুঝিয়া থাকিবেন যে, এখন আমি কোরআন সম্বন্ধেই বর্ণনা করিব। কোরআনের সহিত মুসলমান মাত্রেরই এক বিশেষ যোগ সম্পর্ক রহিয়াছে। সাধারণ লোকেরাও আয়াত শ্রবণ করিলে উহার মোটামুটি অর্থ বুঝিতে পারে। তদুপরি অত্র আয়াতসমূহে "কোরআন" শব্দের পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে। সুতরাং ইহা উপলব্ধি করা আদৌ কঠিন নহে। এই বিষয়টি অদ্যকার সভায় আলোচনার নিমিত্ত আমি এই কারণে গ্রহণ করিয়াছি যে, আজকাল মুসলমান সমাজে কোরআনের হক্ আদায়ের প্রতি আদৌ মনোযোগ নাই। রমযান মাসে কোরআনের প্রতি যেরূপ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত তাহাতে ত্রুটি করা হইতেছে। রমযান মাস আগত প্রায়। মাত্র ছয় দিন কিংবা সাত দিন বাকী। এই কারণেই আজ আমি এই বিষয়টি গ্রহণ করিয়াছি। কেহ মনে করিতে পারেন হয়ত রমযান মাসের সামঞ্জস্যে রোযার বর্ণনাও করা উচিত। কিন্তু আজ আমি রোযা সম্বন্ধে বর্ণনা করিব না। বলা বাহুল্য, একই মজলিসে সকল বিষয়ের বর্ণনা সম্ভব নহে, অবশ্য জরুরী সবই। তবে এতটুকু হইতে পারে যে, সমস্ত জরুরী বিষয়গুলির মধ্যে যাহা অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হউক। বস্তুতঃ রমযান সংশ্লিষ্টে রোযা এবং কোরআন উভয়ের বর্ণনাই জরুরী।

।। তেলাওয়াতে কোরআন ফরযে কেফায়াহ্ ।

কাজেই এখন আমি কোরআনের আলোচনাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করিতেছি। অবশ্য রোযাও একটি প্রধান বিষয় এবং নামাযের ন্যায় 'ফরযে আইন'। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এই শ্রেণীর প্রয়োজনীয় নহে। কেননা, তাহা 'ফরযে আইন' নহে। অর্থাৎ, কোরআন শরীফ আদ্যান্ত পাঠ করা ফরযে আইন নহে। অবশ্য 'ফরযে কেফায়া' নিশ্চয়ই। আর একটি আয়াত মুখস্থ করিয়া লওয়া তো 'ফরযে আইন'ই বটে। আর সূরা- ফাতেহাও একটি সূরাহ্, যদিও ছোট হউক, শিখিয়া লওয়া ওয়াজেবে-আইন অর্থাৎ নিশ্চিত ওয়াজেব। কিন্তু আজ আমি কোরআনের বর্ণনা এই কারণে অবলম্বন করিয়াছি যে, কোরআনের যেই স্তরটি অতীব প্রয়োজনীয় মুসলমান সম্প্রদায় তাহা হইতেও অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে এবং যতটুকু গুরুত্ব

কোরআনের প্রতি দেওয়া উচিত তাহাতেও ত্রুটি করা হইতেছে। আশ্চর্যের কথা এই যে, অনেকে এই ত্রুটিকে ত্রুটি বলিয়াই মনে করে না। পক্ষান্তরে রোযার বেলায় ফরয পর্যায়ে যাহারা ত্রুটি করে অর্থাৎ রোযা রাখে না, তাহাদের ত্রুটিকে সকলেই ত্রুটি বলিয়া মনে করে এবং রোযা-লঙ্ঘনকারীকে সকলেই খারাপ মনে করিয়া থাকে। স্বয়ং রোযা ভঙ্গকারীও রমযান মাসে চোরের ন্যায় গোপনে গোপনে কাজ সমাধা করিয়া থাকে। অর্থাৎ, সে নিজেও এই জঘন্য কার্যের পরিণাম অবগত আছে। রমযান মাসের রোযার ব্যাপারে যে সমস্ত ত্রুটিকে ত্রুটি বলিয়া মনে করা হয় না, উহা ফরযের পর্যায়ের ত্রুটি নহে। অর্থাৎ, এমন নহে যাহার ফলে রোযাই বিনষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু কোরআনের যেই স্তরে ত্রুটি করা হইতেছে তাহা একটি ফরযে কেফায়া'র স্তর, অপরটি ফরযে আইনে'র স্তর। অর্থাৎ, কেহ কেহ পূর্ণ কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করে না। আবার কেহ কেহ বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও তাজ্‌বীদ শিক্ষা করে না। অথচ এই দুই অবস্থাতেই কোরআনের কোরআনীয়াত লোপ পায়। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ পূর্ণ কোরআন পাঠ না করিলে অংশ বিশেষের অভাবে পূর্ণতা বিনষ্ট হওয়া অবধারিত হয়। দ্বিতীয়াবস্থায় কোরআনের কোরআনীয়াত লোপ পাওয়ার কারণ এই যে, কোরআন আরবী। তাজ্‌বীদ ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের অভাবে উহার আরবীয়াত থাকে না। কাজেই তদবস্থায় কোরআনের কোরআনীয়াত লোপ পায়। অতএব দেখুন, কোরআন সম্বন্ধে এত বড় ত্রুটি করা হইতেছে। তদুপরি জঘন্য ব্যাপার এই যে, ইহাকে ত্রুটি বলিয়াই মনে করা হয় না। এই কারণেই কোরআন সম্বন্ধে বর্ণনা করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়াছে। কাজেই আমি আজ এই বিষয়টি বর্ণনা করিতে মনস্থ করিয়াছি। অবশ্য কয়েকটি কারণে বর্ণনা সংক্ষিপ্তই হইবে। প্রথমতঃ, মানুষ স্বভাবতঃ অলস। দ্বিতীয়তঃ, শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই কাজকারবার ছাড়িয়া ওয়ায শুনিতে আসিয়াছেন, ওয়ায দীর্ঘ করিলে তাঁহাদের ক্ষতি হইতে পারে। (এই কথা বলিতেই সভার মধ্যস্থল হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, হযরত! আপনি স্বাধীনভাবে যতক্ষণ ইচ্ছা বর্ণনা করিতে থাকুন, সকলেই ওয়ায শুনিবার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত, কাহারও কোন ক্ষতির কারণ নাই। হযরত মাওলানা বলিলেন: সকলের প্রয়োজনের খবর আপনি একাকী কিরূপে জানিতে পারিলেন? ইহাতে অন্যান্য দিক হইতেও আওয়ায আসিতে লাগিল, 'হযরত! আমাদের কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না।' তখন তিনি বলিলেন: আচ্ছা ভাল কথা। তথাপি আমি বলিতেছি, আমার ওয়াযের মধ্যভাগে যদি কাহারও যাওয়ার প্রয়োজন হয়— তিনি নিঃসঙ্কোচে চলিয়া যাইতে পারেন। কোন বাধা নাই।) তৃতীয়তঃ, ওয়ায সংক্ষিপ্ত করার ইহাও একটি কারণ যে, এখন আমি কোরআন সম্বন্ধে মাত্র একটি বিষয় বর্ণনা করিব যাহা আজ পর্যন্ত কেহ কোথাও শ্রবণ করেন নাই। কোরআন সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়গুলি

যেহেতু সকলেই নানাস্থানে শ্রবণ করিয়াছেন—যেমন, কোরআনের ফযীলত ও সওয়াব প্রভৃতি। এগুলি এখন আমি বর্ণনা করিব না। বলা বাহুল্য, একটি বিষয়ের বর্ণনা সাধারণতঃ সংক্ষিপ্তই হইয়া থাকে। আর যেই নূতন বিষয়টি আমি বর্ণনা করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, উহা বর্ণনা না করিলে এই রোগটি বৃদ্ধিই পাইতে থাকিবে। সুতরাং এই বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা আবশ্যক। অবশ্য ফযীলত ও সওয়াব সম্বন্ধে আমি বর্ণনা না করিলেও অন্যান্য বক্তাগণের নিকট হইতে আপনারা তাহা অবগত হইতে পারিবেন কিংবা নিজেরাও কিতাব পাঠ করিয়া জানিয়া লইতে পারিবেন। আজকাল উর্দু ভাষায়ও বহু দ্বীনি কিতাব লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আজ যাহা বর্ণনা করিতে যাইতেছি তাহা আপনারা কোন বক্তার মুখে শুনেনও নাই-- শুনিবার আশাও নাই এবং কোন কিতাবেও দেখিতে পাইবেন না। এখন আমি বক্তব্য পেশ করিতেছি।

।। হরূফে মুকাত্তাআত ।।

যেই দুইটি আয়াত আমি একটু আগে তেলাওয়াত করিলাম তাহা হরূফে মুকাত্তাআত অর্থাৎ, পৃথক পৃথক হরফের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। এই অক্ষরগুলি পৃথক পৃথকভাবে পাঠ করা হয়, মিলাইয়া পড়া হয় না। গতানুগতিকভাবে উহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্নতা বুঝা যায়, লেখা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় না। কেননা, লেখার বেলায় সবগুলিই পরস্পর যুক্ত ও মিলিত। ইহাতে উহাদের বিচ্ছিন্নতা বুঝা কঠিন।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা আমার স্মরণ হইল। একবার আমার ছোট ভাই রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার বগীতে একজন ইংরেজ যাত্রীও ছিলেন। আমার ভাইয়ের হাতে টাইপের ছাপা এক জিল্দ্ হামায়েল শরীফ দেখিয়া সাহেব বাহাদুর বলিলেন: "আমি উহা দেখিতে পারি কি?" ভাই বলিলেন: "হাঁ, আদব ও সম্মানের সহিত দেখিতে আপত্তি নাই। ইহা আমাদের আস্মানী কিতাব।" সাহেব একখানি রুমাল হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন: আমি ইহাতে হাত লাগাইব না, রুমালের সাহায্যে ধরিব। ভাই হামায়েল খানি তাঁহার হাতে দিলেন, তিনি রুমালের সাহায্যে উহা খুলিতেই প্রথমতঃ তাঁহার নজরে পড়িল "الر"; টাইপে ر অক্ষরটির মাথা একটু মোড়ানথাকাতে উহা و বলিয়া সন্দেহ হইতে পারিত। অতএব, সাহেব বলিয়া উঠিলেন, এই শব্দটি কি الو 'আলু'? তৎক্ষণাৎ ভাই হামায়েল খানি তাঁহার হাত হইতে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন: "আপনি আমাদের নিকট হইতে শিক্ষা করা ব্যতীত ইহা পড়িতে পারিবেন না (ইহাও আমাদের একটি বিশেষত্ব যে, মুসলমানদের নিকট হইতে শিক্ষা করা ব্যতীত কোন জাতি ইহার অর্থ বুঝিতে পারে না, শুদ্ধ করিয়া পাঠ করা তো দূরের কথা।)

মোটকথা, আয়াত দুইটি পরস্পর সামঞ্জস্যশীল হওয়ার একটি কারণ—উভয় আয়াতই বিচ্ছিন্ন অক্ষর দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে, আর একটি কারণ—ইহাও যে, উভয় আয়াতের মধ্যে آيات শব্দকে 'কোরআনী আয়াত' বলা হইয়াছে। কেননা, উভয় আয়াতেই قرآن শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। শুধু এতটুকু পার্থক্য আছে যে, প্রথম আয়াতে كتاب 'কিতাব' শব্দটি আগে এবং 'কোরআন' শব্দটি পরে এবং দ্বিতীয় আয়াতে 'কোরআন'শব্দটি আগে ও 'কিতাব' শব্দটি পরে। এতদ্ভিন্ন প্রথম আয়াতে কোরআন শব্দটি নাকারাহ্ বা অনির্দিষ্ট এবং কিতাব শব্দটি মা'রেফাহ্ অর্থাৎ নির্দিষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতে উহার বিপরীত। আজ আমার বক্তব্য বিষয়ে উভয় আয়াত হইতেই সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। কাজেই আয়াত দুইটিকে একই সঙ্গে পাঠ করিলাম।

।। মুসলমানের প্রকারভেদ ।।

এই বিষয়টির মোটামুটি পরিচয় এই যে, এই আয়াত দুইটিতে কোরআনের দুইটি উপাধি বা বিশেষণ উল্লেখ করা হইয়াছে। একটি কিতাব অর্থাৎ লেখ্য বা লেখার যোগ্য। অপরটি 'কোরআন' অর্থাৎ পড়িবার উপযোগী। আবার উভয় ক্ষেত্রে উহাদের বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে "مبين" অর্থাৎ প্রকাশ্য বা স্পষ্টরূপে লিখিবার উপযোগী ও পড়িবার উপযোগী। এই অগ্রবর্তী ও পরবর্তী করার এবং বিশেষণ প্রযুক্ত করার সার্থকতা একটু পরেই জানা যাইবে। প্রকৃতপক্ষে এখন একটি সন্দেহ ভঞ্জন করা আমার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি আয়াত দুইটি পাঠ করিয়াছি বা অবলম্বন করিয়াছি। মূলতঃ যে সন্দেহ আমি ভঞ্জন করিতে যাইতেছি তাহা সন্দেহ নহে; বরং ভুল। কেননা, সন্দেহ তো উহাকে বলা যায় যাহার জন্য কোন সঠিক কারণ নিরূপিত থাকে। আর যাহার জন্য কোন সুষ্ঠু কারণ বা লক্ষ্যস্থল নিরূপিত নাই তাহা ভুল। এই ভুলের মধ্যে অল্প বিস্তর সকলেই লিপ্ত রহিয়াছে। কেননা, মুসলমান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী দুনিয়াদার অপর শ্রেণী দ্বীনদার। দুনিয়াদার বলিতে আমি তাহাদিগকে বুঝাইতেছি যাহারা আকীদার বা বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়াদার। আর দ্বীনদার বলিতে ঐ শ্রেণী উদ্দেশ্য যাহারা আকীদা হিসাবে দ্বীনদার যদিও তাহারা আমলের দিক দিয়া দুনিয়াদার।

প্রকৃতিবাদ বা নাস্তিক্যবাদ আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকালে ভারতবর্ষে আকীদার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান উপরোক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল না; বরং আকায়েদের পরিপ্রেক্ষিতে সকলেই দ্বীনদার ছিলেন। মানুষের দ্বীনদারী বা দুনিয়াদারী যাচাই করিবার মাপ কাঠি ছিল একমাত্র তাহাদের আমল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা এমন এক যমানায় আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আকায়েদের

পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদল ইস্‌লামী আকায়েদগুলির মধ্যে সন্দেহ পোষণ করিতেছে। আর একদল আকায়েদ সম্বন্ধে কোন কথা বলে না। এই কারণে সে সমস্ত ফাসেক লোকই উত্তম বলিয়া মনে হয় যাহারা আকায়েদ সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করে না ; বরং ইস্‌লামী আকীদা সমূহের উপর দৃঢ়ভাবে আস্থা স্থাপন করিয়া রহিয়াছে। আল্‌হামদু-লিল্লাহ্‌ ! এখন পর্যন্ত এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অধিক যাহাদের আকীদা ঠিক আছে ; কোন প্রকারের সন্দেহ পোষণ করে না। ইহার কারণ—এখন পর্যন্ত নব্যযুগের শিক্ষা হইতে অনেকেই মাহ্‌রূম অর্থাৎ বঞ্চিত রহিয়াছেন। আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ভাষাতেই 'মাহ্‌রূম' শব্দটি বলিলাম, অন্যথায় আমরা আধুনিক শিক্ষা হইতে বিমুখ লোকদিগকে 'মারহুম' অর্থাৎ 'রহমত প্রাপ্তই' বলি। কেননা, "চুলোয় যাক সেই স্বর্ণালঙ্কার যাহাতে কান ছিঁড়ে"।

॥ আধুনিক শিক্ষা এবং উন্নতি ॥

এই শিক্ষা এবং উন্নতি দ্বারা আমরা কি করিব যাহাতে ধর্মই বিনষ্ট হয় ? উহা তো চুলায় নিক্ষেপ করার উপযোগী। যদি জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে কাহারও এই শিক্ষার প্রয়োজনই হয় —অবশ্য এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন আছে। কেননা পার্থিব উন্নতি আধুনিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নহে—ব্যবসায়, শিল্প প্রভৃতির সাহায্যে তদপেক্ষা অধিক উন্নতি করা যাইতে পারে। কিন্তু আধুনিক সমাজের নিকট নূতন যুগের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এমনভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, কেহ সে সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলে উহা বোকামি বলিয়া মনে করে। সুতরাং আমরা তাহাদের খাতিরে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লইয়া বলিতেছি যে, আচ্ছা ভাল কথা, আমি স্বীকার করিলাম, তাহা দরকারী। কিন্তু তোমরা সেই আধুনিক শিক্ষাকে এইরূপে অর্জন করিতে পার যে, উহার পূর্বে ইস্‌লামী আকায়েদ ও বিধানসমূহের জ্ঞান লাভ কর। কিন্তু স্মরণ রাখিও, সেই দ্বীনী এল্‌ম অর্জন করার জন্য রাহে-নাজাত প্রভৃতি দুই চারিটি চটি কিতাবের সংক্ষিপ্ত পাঠ্য তালিকা যথেষ্ট নহে ; বরং উহার জন্য এমন সুষ্ঠু পাঠ্য তালিকা নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে ইস্‌লামী আকায়েদ ও বিধান সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে আকায়েদ ও বিধান সম্পর্কিত গূঢ়তত্ত্ব এবং যুক্তিও শিক্ষা করিতে হইবে, যাহাতে পাঠক মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারে যে, আমাদের ধর্মীয় বিধানসমূহের গূঢ়তত্ত্বও আছে এবং ইহাদের পশ্চাতে জোরালো যুক্তি প্রমাণও আছে। কেননা ইহাতে সর্ববিধ সুবিধার প্রতিই দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এবং শাসনবিধানও পরিপূর্ণ এবং নিখুঁত। মোটামুটি এতটুকু জ্ঞান লাভ করা একান্ত আবশ্যক যাহাতে আধুনিক শিক্ষা হইতে কোন সন্দেহ উদ্ভূত হইতে না পারে।

॥ আমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার "শ্রেষ্ঠত্ব" জ্ঞানের অভাব ॥

বিশদভাবে দ্বীনী এল্‌ম হাছিল করার প্রয়োজন নাই। কেননা, গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা প্রজা-সাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নহে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি যে, প্রজা-সাধারণ শাসনকর্তার বিধান মানিয়া চলিতে বিধানের রহস্য ও যুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার মুখাপেক্ষী নহে। যদি কেহ প্রত্যেকটি বিধানের কারণ ও যুক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং বলে যে, রহস্য বা যুক্তি না জানা পর্যন্ত আমি এই বিধান মানিব না, তখন জ্ঞানিগণ তাহাকে এরূপ বলিতে নিষেধ করিবেন এবং তাহাকে বোকা বলিয়া সাব্যস্ত করিবেন। কেননা, প্রজাবৃন্দের মধ্যে প্রত্যেকটি লোক রাজ্য শাসনের প্রতিটি বিধানের রহস্য ও যুক্তি অবগত হইতে পারে না। প্রত্যেকে তাহা জানার দাবীও করিতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই জ্ঞানিগণই খোদার সম্মুখে বাহাদুর সাজিয়া তাঁহার বিধানসমূহের যুক্তি ও রহস্য জানার দাবী করিতেছেন। রহস্য অবগত না হইয়া শরীঅতের কোন বিধান মানিতে চাহেন না। যদি তাঁহাদের বলা হয় যে, প্রভুর আদেশ ও নির্দেশের রহস্য অবগত হওয়ার অধিকার ভৃত্যের নাই। তাঁহারা বলেন, নিন্ সাহেব, ধর্মীয় বিধান বলপূর্বক আমাদের দ্বারা মানাইয়া লওয়া হইতেছে।

به بیں تفاوت راه از کجا ست تا بکجا

"দেখুন পথের পার্থক্য কোথা হইতে কোন পর্যন্ত"

আসল কথা এই যে, বিধাতার শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে থাকিলে বিধান সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রশ্ন বা সন্দেহ উত্থিত হইতে পারে না। আমাদের জ্ঞানিগণের হৃদয়ে যুগের শাসনকর্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। এই কারণেই তাঁহাদের আইন-কানুন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন না। কেহ কখনও এরূপ বলেন না যে, প্রচলিত আইন-কানুনসমূহ উকিলদের রচিত। পক্ষান্তরে তাহাদের মনে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব মোটেই নাই। কাজেই খোদার আইন-কানুনের মধ্যে তাহাদের সন্দেহ হইতেছে এবং সেই কারণেই আলেম-দের প্রতি এই অপবাদ দিয়াছে যে, "আলেমগণ এ সমস্ত মনগড়া মাস্‌আলা রচনা করিয়া লইয়াছেন।" আমি বলি, "যদি এযুগের আলেমগণ নিজেদের মতলব অনুযায়ী মাস্‌আলা রচনা করিয়া থাকেন, তবে কি শরহে বেকায়া, হেদায়া প্রভৃতি ফেকার কিতাবের মাস্‌আলাগুলিও ইহারাই লিখিয়া আসিয়াছেন?

বন্ধুগণ! এই কিতাবগুলি তো আমাদের বহু শতাব্দী পূর্বেকার লিখিত। যদি বলেন যে, হেদায়া ও শরহে বেকায়ার প্রণেতাগণ উক্ত মাস্‌আলাসমূহ নিজেরা মনগড়া রচনা করিয়াছেন, তবে বলুন, হাদীস কে লিখিয়াছেন? হাদীসও যদি রাবীগণই (বর্ণনাকারী) রচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তবে কোরআনের মধ্যে উহা কে লিখিয়াছে? কেননা, শরীঅতের আকায়েদ ও বিধানসমূহ তো কোরআন দ্বারাও পরিষ্কারভাবে সাব্যস্ত হয়।

।। আল্লাহ্‌র বিধানসমূহের রহস্য ।।

মোটকথা, প্রজা-সাধারণের পক্ষে যেমন রাজ্যের শাসন বিধানসমূহের রহস্য ও যুক্তি অবগত হওয়া জরুরী নহে, তদ্রূপ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলার বিধানসমূহের রহস্য জানা আবশ্যকীয় নহে। রহস্য অবগত না হওয়া ব্যতীত রাজ্যের আইন-কানুন মান্য করা যেমন জবরদস্তীমূলক নহে, তদ্রূপ শরীয়ত-বিধানের ক্ষেত্রেও রহস্য অবগত না হইয়া পালন করা জবরদস্তীমূলক নহে। আর যদি এখন জবরদস্তী মনে করা হয়, তবে রাজ্যের আইন-কানুন ও রহস্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল করা ব্যতীত মানাইয়া লওয়া জবরদস্তীমূলক হইবে। যদি দুনিয়ার শাসনকর্তাগণের কোন আইন-কানুন জবরদস্তী মানাইয়া লওয়া জায়েয হয়, তবে আল্লাহ্‌র বিধান তো অবশ্যই পালন করার উপযোগী। কেননা, তাহা এমন সত্তার আইন যাঁহার সম্মুখে সৃষ্টিগত বিধানসমূহ মান্য করিতে রাজা-বাদশাহগণও বাধ্য, অপরের আইন-কানুন মানার উপযোগী হউক বা না হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল আল্লাহ্‌র বিধানের কোনই মর্যাদা নাই। তবে হাঁ, রাজ্যের শাসন-বিধানের যথেষ্ট মর্যাদা আছে।

সারকথা এই যে, দীনিয়াতের পাঠ্য তালিকা আলেমদের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রণয়ন করা কর্তব্য। তাঁহারা এমন পাঠ্য নির্বাচন করিয়া দিবেন যাহাতে শরীয়তের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যাইবে এবং ইসলামী আকীদাসমূহ এমনভাবে হৃদয়ে দৃঢ় হইয়া বসিবে যে, পর্বতের আলোড়নেও তাহা অটল থাকিবে এবং উক্ত পাঠ্য হইতে যুক্তি এবং রহস্য সম্বন্ধেও পাঠকদের মোটামুটি জ্ঞানলাভ হইবে। তাহাতে তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, আলেমদের নিকট শরীয়ত বিধানের রহস্য এবং জ্ঞানানুগ যুক্তিও আছে। সুতরাং এই পাঠ্য তালিকা আয়ত্ত করার পর পাঠকগণ আলেমদের শরণাপন্ন হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক শিক্ষার ধ্বজাধারীরা মনে করেন যে, আলেমদের নিকট ক্বোরআন হাদীসের উদ্ধৃতি ভিন্ন আর কোন যৌক্তিক প্রমাণ নাই। এই কারণে তাঁহারা রহস্য অবগত আলেমদের কাছেও ঘেষেন না। আধুনিক শিক্ষা আরম্ভ করার পুর্বে এইত হইল একটি প্রয়োজনীয় কাজ।

।। আলেমদের সংসর্গে থাকার প্রয়োজনীয়তা ।।

আর একটি আবশ্যকীয় কাজ এই যে, আধুনিক শিক্ষার্থী ছেলেদিগকে আলেমদের সংসর্গে রাখুন। বন্ধের সময় কিছুদিনের জন্য তাহাদিগকে বুযুর্গানে-দীনের নিকট পাঠাইয়া দিন। এতদ্ভিন্ন তাহাদিগকে অবসর সময়ে দীনী আলেমদের রচিত কিতাবসমূহ পাঠ করিবার জন্য তাকীদ করুন এবং আলেম ভিন্ন অন্যান্য লেখক-দের রচিত নাটক নভেল প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে বারণ করুন। কেননা, ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত লেখকদের পুস্তক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হওয়াও অপরাধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে

করুন, কোন ব্যক্তি যদি রাজদ্রোহিতামূলক পুস্তকাদি নিজের ঘরে রাখে, তবে বলাই বাহুল্য যে, রাজ্যের আইনানুসারে ইহা জঘন্য অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং গভর্ণমেন্ট এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই আদর্শ শাস্তি প্রদান করিবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিক সমাজের জ্ঞানিগণ যে বিষয়কে তুনিয়ার আইনে অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন, শরীয়তের আইনানুযায়ী তদ্রূপ বিষয় হইতে বারণ করাকে তাঁহারা ধর্মীয় গোড়ামি বলিয়া মনে করেন।

আলেম ভিন্ন অন্যান্য লেখকের পুস্তক পাঠ করিতে বারণ করা যদি ধর্মীয় গোড়ামি হয়, তবে গভর্ণমেন্টের এই আইনকেও গোড়ামি বলিতে হইবে যে, "বিদ্রোহ মূলক পুস্তক ঘরে রাখা অপরাধ"। কিন্তু সমস্ত জ্ঞানী লোকই এই আইনকে প্রয়োজনীয় এবং সঠিক বলিয়া মনে করেন। এই কারণেই তুনিয়াতে এমন কোন রাজ্য নাই যথায় রাজদ্রোহিতামূলক পুস্তক ঘরে রাখাকে অপরাধ বলিয়া নির্ধারণ করা হয় নাই। তবুও তোমরা যে আলেমদের উপর গোড়ামির অপবাদ দিতেছ একবার এতটুকু চিন্তা করিয়া দেখ যে, এই আইন প্রয়োগে আলেমদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কি আছে? বলা বাহুল্য, ইহাতে আলেমদের কোনই স্বার্থ নাই; বরং তাহাদের উদ্দেশ্য শুধু শরীয়তের আইন জনসাধারণের মনঃপূত হওয়া এবং মানিয়া চলা। যে সমস্ত মাস্‌আলা সাধারণের মনঃপূত না হয় এবং আলেমদের উপর তজ্জন্য দোষারোপ করে, তাহাতেই বা আলেমদের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? ইহা হইতেই বুঝিয়া নিতে পারেন যে, যে আলেম আপনাদের মন মত ফতওয়া প্রদান করেন না তিনিই হক্কানী আলেম। কেননা, যিনি মানুষের ইচ্ছানুযায়ী ফতওয়া প্রদান করেন তাঁহার মধ্যে ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার প্রবল সন্দেহ রহিয়াছে। অর্থাৎ তিনি লোকের মতানুযায়ী ফতওয়া প্রদান করিয়া জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে চাহিতেছেন। আর যিনি কাহারও মরজীর প্রতি লক্ষ্য করেন না বুঝিতে হইবে যে, তিনি সঠিক ফতওয়া প্রদান করিয়া থাকেন। ডাক্তার যদি রোগীকে তিক্ত ঔষধ ব্যবস্থা করেন, তবে বলুন, তাহাতে ডাক্তারের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই, কোন স্বার্থ নাই; বরং একমাত্র রোগীর স্বার্থের অর্থাৎ, রোগারোগ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অতএব, যে আলেম এমন বিষয় হইতে বারণ করেন যাহাতে লোকের নাফ্‌স্ স্বাদ ও আমোদ পায়, বুঝিতে হইবে যে, শুধু তাহাদের মঙ্গল কামনা করিয়াই তিনি তাহাদিগকে উহা হইতে বারণ করিতেছেন। কেননা, তিনি সেই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে বিষাক্ত পরিণতি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছেন।

আল্লাহ্‌র কসম! ভ্রান্ত মতাবলম্বীদের পুস্তক পাঠে অনেক আলেমের মধ্যেও কুফল ফলিতে দেখা গিয়াছে। সুতরাং ভাবিয়া দেখুন, ঐ শ্রেণীর পুস্তক পাঠে সাধারণের কি সর্বনাশ হইতে পারে। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে আলেমের পরামর্শ না

লইয়া কোন পুস্তকই পাঠ করা উচিত নহে। কেহ যদি বলেন যে, আমি লেখকদের ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে তাহাদের পুস্তক পাঠ করিতেছি। আমি বলিব, তাহাও সঙ্গত নহে। কেননা, প্রতিবাদ বা খণ্ডন করা আলেমদের কাজ, আপনাদের নহে। এই কাজ আপনাদের নহে বলিলে আপনাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করা হয় না। কেননা, আইন শাস্ত্রে এক ব্যক্তি যদি এল, এল, বি ডিগ্রীধারীও হয়, তবুও তাহাকে ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যায় মূর্খ বলিয়াই গণ্য করা হয়। পক্ষান্তরে একজন ইন্‌জিনিয়ারের পক্ষে উক্ত এল,এল, বি কে একথা বলিয়া দেওয়ার অধিকার আছে যে, আপনি আইন বিশারদ হইতে পারেন,কিন্তু আমার ইন্‌জিনিয়ারিং বিদ্যা সম্বন্ধে আপনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং ইন্‌জিনিয়ারিং বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকার আপনার নাই। অনুরূপভাবে আমি বলিতেছি যে,"ভ্রান্ত"মতবাদের প্রতিবাদ করিতে যে সমস্ত বিদ্যার প্রয়োজন আপনারা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সুতরাং প্রতিবাদের নিয়তেও আপনাদের পক্ষে ভ্রান্ত মতবাদীদের পুস্তক পাঠ করা জায়েয নহে। আমি অজ্ঞ অর্থে "জাহেল" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছি, কাহারও মনঃপুত না হইলে এস্থলে "না-ওয়াকেফ"শব্দ বলিতে পারেন, অর্থ একই।

জনৈক আধুনিক শিক্ষিত লোক একদিন আমার নিকট একটি সূক্ষ্ম মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম: আপনি এই মাস্‌আলা বুঝিতে পারিবেন না। আমার উত্তর তাহার খুবই অপছন্দ হইল। বলিলেন, আমি না বুঝিতে পারার কারণ কি? আমি বলিলাম, ইহা বুঝিবার জন্য যে কতকগুলি প্রাথমিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা আবশ্যক আপনি তাহা লাভ করেন নাই, যে বিষয়ের জ্ঞান কোন প্রাথমিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, উক্ত প্রাথমিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা ব্যতীত তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। আপনি যদি দাবী করেন যে, প্রাথমিক বিষয়ের জ্ঞান ছাড়াই আমি বুঝিতে পারিব, তবে একজন অশিক্ষিত লোককে, যিনি জ্যামিতির প্রাথমিকসূত্র এবং স্বতঃসিদ্ধ নিয়মাবলী অবগত নহে, জ্যামিতির একটি নক্‌শা বুঝাইয়া এবং আমার সম্মুখে তাহার দ্বারা উহার পুনরাবৃত্তিও করাইয়া দিন তাহা হইলে আমিও এ-সম্বন্ধীয় প্রাথমিক জ্ঞান ব্যতীত আপনাকে এই মাস্‌আলাটির উত্তর বুঝাইয়া দিব। তিনি ইহার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া নীরব হইয়া গেলেন।

অনুরূপ এক ব্যাপারে আমি জনৈক লোককে ইহাও বলিয়াছিলাম যে,আপনার মনে হয়ত সন্দেহ হইতে পারে, "বোধ হয় আলেমদের নিকট আমার প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। এই কারণে টাল-বাহানা করিয়া এড়াইয়া যাইতেছেন।" তবে আপনি এক কাজ করুন, সম্মুখস্থ মাদ্রাসায় যে মুদার্‌রেস্‌ ছাহেব পড়াইতেছেন, তাহার নিকট আপনার প্রশ্নটি বিবৃত করিয়া বলিয়া দিন, তিনি যেন আমার নিকট হইতে উহার উত্তর জানিয়া লন। আমি তাহাকে উহার উত্তর বলিয়া দিব, তিনি উহা বুঝিতে পারিবেন। কেননা

তিনি আনুষঙ্গিক প্রাথমিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অবগত আছেন। তাহাতে আপনি ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, আলেমদের নিকট আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে এবং ইহাও বুঝিতে পারিবেন যে, আপনি সে উত্তর বুঝিতে অক্ষম। কারণ আপনি উহার প্রাথমিক বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অজ্ঞ। যিনি উহা অবগত আছেন তিনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আপনার সম্মুখে আমি উক্ত মুদার্‌রেস ছাহেব দ্বারা সেই উত্তরের পুনরাবৃত্তিও করাইয়া দিব। ঐ ব্যক্তি অবশ্য আমার কথা মত কাজ করে নাই যদি সে তদ্রূপ করিত, তবে অতি সত্বর স্বীকার করিত যে, যথার্থই সে উক্ত প্রশ্ন করার অধিকারী ছিল না।

অতএব, বন্ধুগণ! প্রত্যেকে প্রত্যেক কথা বুঝিতে পারে না। সুতরাং আপনারা গতানুগতিক ভাবে মানিয়া নিন যে, ভ্রান্ত মতবাদীদের প্রতিবাদ করা আপনাদের কাজ নহে। সুতরাং বিধর্মী লেখকদের গ্রন্থ এবং সেই সমস্ত মুসলমান লেখকদেরও যাহাদের সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই, কখনও পাঠ করা উচিত নহে। শুধু আপনাদের হিত কামনা করিয়াই আমি একথা বলিতেছি যাহাতে আপনাদের ধর্ম নিরাপদ থাকে, যাহা প্রত্যেক মুসলমানের নিকট প্রাণাপেক্ষা অধিক প্রিয়। অতঃপর আপনারা জানেন আর আপনাদের কাজ জানে।

॥ আধুনিক শিক্ষা লাভের পদ্ধতি ॥

অতএব, আধুনিক শিক্ষা অর্জন করার পদ্ধতি এই হওয়া উচিত যে, প্রথমতঃ, আপনি আপনার ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করুন। কোন আলেমের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করুন। দ্বিতীয়তঃ, আলেমদের সংস্পর্শে যাতায়াত করুন। তৃতীয়তঃ, বিজাতীয় লেখকদের পুস্তকপাঠ করা হইতে বিরত থাকুন এবং হক্কানী আলেমদের রচিত কিতাব পাঠ করুন। ইহার পরে আধুনিক শিক্ষা অর্জন করাতে কোন আপত্তি নাই। এই অনুমতিও তখনই দেওয়া যাইতে পারে যদি আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা মানিয়া লওয়া হয়। আমি আপনাদের খাতিরে উহার প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করিয়া প্রণালী বলিয়া দিলাম। নতুবা আলেমদের রুচি ইহার বিপরীত। আপনারা এমন আলেমও দেখিতে পাইবেন যাঁহারা ইহার প্রয়োজনীয়তাই স্বীকার করেন না। উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা আপনাদিগকে এসম্বন্ধে নিরুত্তর করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু আমার রুচি এই যে, আমি তর্ক-বিতর্ক পছন্দ করি না। এই কারণেই আমি আপনাদের খাতিরে এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া উহার শিক্ষা পদ্ধতি সংশোধন করিয়া দিলাম। ডাক্তার রোগীকে বেগুন খাইতে নিষেধ করিলে রোগী যদি তাহা অমান্য করে, তবে কোন কোন ডাক্তার ক্রোধান্বিত হইয়া রোগীর সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। আবার কোন কোন দয়ালু চিকিৎসক

এমন আছে যে, বেগুনের অপকারিতা গুণ সংশোধন করিয়া রোগীকে তাহা খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। বলেন, "আচ্ছা বেগুনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণ দধি এবং পালং শাক দিয়া পাক করিয়া খাইতে পার।

আমি বলিতেছি—আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। অধিকাংশ মুসলমানই আক্বায়েদ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করে না। কেননা, তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার কুফল হইতে রক্ষিত আছেন। যাঁহারা আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ইস্‌লামী আক্বায়েদ সম্বন্ধে নানাবিধ উদ্ভট সন্দেহে লিপ্ত হইয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু সাধারণ স্তরের লোকেরা তাঁহাদের সংসর্গে উঠা-বসা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কিছু কিছু প্রভাবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং উহা নিবারণ করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। অবিলম্বে ইহার সংশোধন না হইলে বিরাট সর্বনাশের আশংকা রহিয়াছে।

॥ ধর্মীয় এবং পার্থিব স্বার্থের প্রভেদ ॥

এখন আমি দ্বিতীয় দলের একটি সন্দেহের উত্তর দিতে চাই। সন্দেহটি বহু পূর্ব হইতে অনেকের মনে গুপ্ত ছিল। এখন কেহ কেহ তাহা মুখেও বলিয়া ফেলিতেছে। সন্দেহটি এই ঃ 'ক্বোরআনের ভাষা যখন আমাদের বোধগম্য হয় না, এমতাবস্থায় শুধু মুখে মুখে আওড়াইলে আমাদের কি লাভ হইবে ? কেহ কেহ ইহাও বলেন যে, শিশুরা যখন ক্বোরআন বুঝিতেই পারে না, তখন শুধু তোতা পাখীর ন্যায় তাহাদের দ্বারা ক্বোরআন আবৃত্তি করাইলে কি ফল হইবে ?' আসল কথা এই যে, ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াতে যে ফল পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফল সম্বন্ধে জানিতে পারিলে উহা লাভের জন্য চেষ্টা করিত। ব্যবসায়ীরা আজকাল 'কান্দলা' যাইয়া আম আনয়ন করে এবং একাজে তাহারা বিশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকে। ইহার কারণ হইল, তাহারা ইহার লাভ সম্বন্ধে অবগত আছে যে, চালানে দ্বিগুন লাভ হইবে। পার্থিব কাজে তো মানুষের অবস্থা এইরূপ যে, যদি কোন অভিজ্ঞ লোকের নিকট জানিতে পারে অমুক দ্রব্যের ব্যবসায়ে খুব লাভ। তৎক্ষণাৎ তাহার কথার উপর নির্ভর করিয়া উক্ত দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহাতে দুই একবার লোকসান হইলেও সাহস হারায় না ; বরং পুনরায় সেই ব্যবসাই করিতে থাকে। যেমন আমের ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে কোন কোন সময় লোকসানও হয়। কিন্তু লোকসানদাতা পুনরায় সেই আমের ব্যবসাই করে। লোকসান না হইয়া যদি সমান সমান থাকে অর্থাৎ, লাভও হইল না লোকসানও হইল না, এমতাবস্থায় সেই ব্যবসা তো সে ছাড়িতেই পারে না, বরং বলে, ব্যবসায়ে লোকসান না হওয়াও এক প্রকারের কৃতকার্যতা। তবে লাভ আজ হইল না ভবিষ্যতে হওয়ার আশা আছে ; আর লোকসান হইলেও ভবিষ্যতে লাভের আশাকে লাভ বলিয়া মনে করা হয়।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় জানি, ধর্মীয় ব্যাপারে এই নীতি কোথায় গেল? বন্ধুগণ! ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে? দুনিয়ার কাজ কারবারে তো লোকসান না হওয়াকেও লাভ বলিয়া বিবেচনা করা হয়; অথচ ধর্মীয় কাজে লাভ একটু পরে হওয়াকেও কৃতকার্যতা মনে করা হয় না। কৃষিকার্য, ব্যবসায়, চাকুরী সব কিছুতেই কোন সময় লাভ হয়, কোন সময় হয় না। আবার কোন কোন সময় লোকসানও হয় কিন্তু ইহাদিগকে কেমন করিয়া ছাড়া যায়? এখানে তো অভিজ্ঞ লোকেরা বলিয়াছেন এসমস্ত কাজে লাভ আছে। যদিও সকল সময় হয় না, কিন্তু প্রায়ই হয়। যদিও নগদ না হইয়া বিলম্বেই হয়। এই বিলম্বিত এবং অনিশ্চিত লাভের আশায় মানুষ দুনিয়ার কাজ কারবার ত্যাগ করিতে পারে না, কিন্তু দুঃখের বিষয়! আল্লাহ্ এবং রাসূলের প্রতিশ্রুতির মূল্য কি এসমস্ত অভিজ্ঞ লোকের কথা হইতেও কম হইয়া গেল? আল্লাহ্ ও রাসূল পরিষ্কার ভাষায় কোরআন তেলাওয়াতের সওয়াবের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাও আবার সকল অবস্থায়, চাই বুঝিয়াই পড়ুন আর না বুঝিয়াই পড়ুন।

॥ স্বার্থ ও প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া ॥

আমি আল্লাহ্‌র নামে কসম করিয়া বলিতেছি: "যাহারা এরূপ সন্দেহ করে যে, আমরা যখন বুঝিতেই পারি না, তখন কোরআন তেলাওয়াত করিয়া কি লাভ?" ইহারা শুধু নফ্‌সের আরাম কামনা করে। জ্ঞানের সহিত ইহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। অবশ্য জ্ঞানী হওয়ার দাবী খুবই করে। ইহারা যদি জ্ঞানের বশীভূত হইত, তবে এমন নির্বোধের মত কথা বলিত না। কেননা, জ্ঞানসম্মত নীতিতে এমন কখনও হয় না যে, একই প্রমাণের সাহায্যে কোন বস্তু এবং উহার বিপরীত বস্তু—উভয়ই প্রমাণিত হয়। যদি এই সন্দেহ যুক্তিসম্মত হইত যে, "অর্থ না বুঝিলে শব্দ আওড়াইয়া কি লাভ?" তবে বলুন, এই যৌক্তিক প্রমাণ দ্বারা কি প্রমাণিত হয়? 'অর্থ বুঝি না' বলিয়া কি শব্দের আবৃত্তিও ত্যাগ করিতে হইবে, না অর্থও বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে? বলা বাহুল্য, আপনার এই যুক্তিতে শব্দ পরিত্যাগ করিতে হইবে বুঝায় না। কেননা, আপনার যুক্তির মধ্যে অর্থের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে এবং অর্থ শব্দের অধীন। বস্তুতঃ প্রয়োজনীয় বস্তু যাহার উপর নির্ভরশীল তাহাও প্রয়োজনীয় বটে। অতএব, আপনার এই যুক্তিতে তো স্বয়ং শব্দ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাই প্রমাণিত হইতেছে যদি ইহার উপর সন্দেহকারী বলেন যে, "হাঁ আমি শব্দের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি কিন্তু শব্দ তখনই শিক্ষা করা উচিত যখন উহার সাথে সাথে অর্থও শিক্ষা করা সম্ভব হয়।" তবে আমি বলিব: "আপনার এই ব্যাখ্যা তখনই কার্যকরী হইতে পারিত যখন আমি দেখিতাম যে, আপনি আপনার শিশুদিগকে শৈশবকালে তো কোরআন শরীফ

পড়ান না, কেননা, তখন তাহারা বুঝিবে না ; বরং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পড়ান। কেননা, তখন তাহারা উহা বুঝিতে পারিবে। কিন্তু আপনাদের অবস্থা তো এইরূপ যে, শৈশবেও পড়ান না, বড় হইলেও পড়ান না। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, আপনার উপরোক্ত যুক্তির সাহায্যে সকল অবস্থায়ই শব্দের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। ইহাতে আমার সেই কথাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, একই যুক্তি দ্বারা বিপরীত বস্তুও প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। অথচ ইহা দ্বারা মূল বস্তুও প্রমাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝা গেল যে, আপনার এই যুক্তি জ্ঞান সম্মত নহে।

অতএব, আমি বলি, এই বাহানা উত্থাপনের উদ্দেশ্য একমাত্র নফ্‌সের ইচ্ছা পূরণ করা। নফ্‌সের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্যই এই যুক্তিটিকে একটি বাহানারূপে দাঁড় করিয়াছে। মূলতঃ তাহাদের অন্তরের কথা এই যে, কোরআনের শব্দেরও তাহাদের প্রয়োজন নাই, অর্থেরও তাহাদের প্রয়োজন নাই। যদিও মুখে মুখে অর্থের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কার্যকলাপ বলিতেছে যে, তাহারা উভয়ের কোনটিকেই প্রয়োজনীয় মনে করে না। অন্যথায় তাহারা কোন সময় তো অর্থসহই কোরআন শরীফ শিক্ষা করিত এবং নিজের ছেলেপেলেদিগকে শিখাইত। ব্যাপার যখন এইরূপ, কাজেই মুখে অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রকাশ করা মানুষকে ধোকা দেওয়া ছাড়া আর কি হইতে পারে? কিন্তু আমি বলি, খোদাকে কেমন করিয়া ধোকা দিবে? তিনি তোমাদের মনের কথাও অবগত আছেন যে, তোমরা সকল অবস্থায়ই কোরআনের শিক্ষাকে অনর্থক মনে করিতেছ। উহা শুধু শব্দ শিক্ষাই হউক কিংবা অর্থসহই হউক। কবি বলিতেছেন :

خلق را گیرم که بفریبی تمام + درغلط اندازی تا هر خاص و عام

کارها با خلق آری جمله راست + با خدا تزویر و حیله کے رواست

کارها او راست باید داشتن + رایت اخلاص و صدق بر افراشتن

"মনে করি সমস্ত মানুষকেই ধোকা দিতে পারিবে, বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলকেই ভুল পথে চালিতে করিতে পারিবে। মানুষের সঙ্গে তো সমস্ত কার্যই ঠিকমত করিতেছ। খোদার সঙ্গে প্রতারণা এবং ধোকাবাজী কেমন করিয়া সঙ্গত হইবে? তাহার সহিত সমস্ত কার্যই সরল এবং সঠিকভাবে করা উচিত, তাহার সামনে অকপটতা সত্তারও ঝাণ্ডা উঁচু করিয়া ধরা বাঞ্ছনীয়।" মোটকথা, খোদার সহিত ধোকাবাজী চলিতে পারে না। আরেফ শীরাযি বলেন :

ترسم که صرفه نبرد روز باز خواست + نان حلال شیخ ز آب حرام ما

"অর্থাৎ, আমার আশঙ্কা হয়—পাছে কিয়ামতের দিন পীরের হালাল রুটির উপর আমার হারাম পানীয় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ না করে।" কেননা, সে মানুষকে ধোকা দেওয়ার

উদ্দেশ্যে তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর বেশ ধারণ করে। আর আমি গুনাহর কাজে লিপ্ত আছি সত্য, কিন্তু নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ খোদার দরবারে ধোকাবাজীর স্থান নাই। এই কারণে আমার আশঙ্কা হয়—পাছে রিয়াকার ভণ্ড পীরের লোক দেখানো দরবেশী আমার মাতলামীর অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত না হয়। এইরূপে আমি বলি, যে সমস্ত ফাসেক মুসলমান নিজেকে গুনাহ্‌গার মনে করে, তাহারা ঐ সমস্ত তথাকথিত সভ্য মুসলমান হইতে উত্তম যাহারা ইস্‌লামী আকায়েদ সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং যুক্তির সাহায্যে শরীয়তের বিরোধিতা করে।

।। কোরআন শরীফ তেলাওয়াত এড়াইবার বাহানা ।।

এসমস্ত লোক যেহেতু বাহ্যিক চালচলনে মুসলমান। কাজেই মুখে একথা বলিতে পারে না যে, কোরআন পড়িতে আমাদের মন মোটেই চায় না। কেননা, তাহাতে কুফরীর ফতওয়া পড়িবার আশঙ্কা। এই কারণে নফসের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী এই বাহানা দাঁড় করাইয়াছে যে, "যখন অর্থ বুঝিতেছি না তখন শুধু শব্দ আওড়াইয়া লাভ কি? ইহার অর্থ শুধু এই যে, তবে আপনি আপনার সন্তানদিগকে অর্থসহই কোরআন শরীফ শিক্ষা দিন এবং প্রথম হইতেই তাহাদিগকে আরবী ভাষা শিখাইবার জন্য আরবী ব্যাকরণ প্রভৃতি পড়িতে দিন। কিন্তু ইহাতে তো আপনাদের রক্ত আরও শুকাইয়া যাইবে। কেননা, তাহাদের তো ইচ্ছা অর্থের বাহানা করিয়া শব্দের বোঝাও ঘাড় হইতে নামাইয়া দেওয়া। এই আবার কি ফ্যাসাদ, উল্টা আরবী ব্যাকরণের বোঝা ঘাড়ে চাপিল। কিন্তু যে ব্যক্তি অর্থ ব্যতীত শব্দকে নিষ্ফল মনে করে এবং আরবী ব্যাকরণ শিখিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, তাহাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই শিক্ষা করিবার জন্য বাধ্য করা হইবে।

বন্ধুগণ! বাহ্যতঃ "না বুঝিয়া শুধু শব্দ আওড়াইলে কি লাভ?" কথাটি অর্থপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা ইসলামকে অন্তঃসার শূন্য করিয়া দিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কোরআন শরীফের অর্থ শিখিবারও চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কবির ভাষায় উহার স্বরূপ এই:

اگر غفلت سے باز آیا جفا کی + تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی۔

"বিরাগ ছাড়িয়া থাকিলেও সে কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছে, এরূপ সংশোধন করিলেও যালিম কি সংশোধন করিয়াছে?"

তাহারা শেষ পর্যন্ত অর্থ শিক্ষা করিবার জন্য সম্মত হইলেও উহার জন্য এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। তরজমাওয়ালা কোরআন শরীফ দেখিয়া তরজমা পড়িয়া লইয়াছে। কিন্তু তাহাদের এই কার্য এরূপ মনে করিতে পারেন যেমন কেহ "পাক প্রণালীর" পুস্তক দেখিয়া "গুল্‌গুলা" প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিল। উক্ত পুস্তকে

সর্ব প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত প্রণালীই লিখিত আছে। কিন্তু উহা হইতে আটা গুলিবার উপায়, পানি মিশাইবার প্রণালী এবং অগ্নিতাপের পরিমাণ কেমন করিয়া জানা যাইবে? এতদ্ভিন্ন ইহার আরও একটি দৃষ্টান্ত শ্রবণ করুন, কোন এক ভদ্রলোক পত্র দ্বারা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: ض অক্ষরের উৎপত্তিস্থল কোন্ স্থানে এবং ض ও ظ এর মধ্যে পার্থক্য কিরূপে করা যায়? উত্তরে আমি তাহাকে লিখিয়া দিলাম, এ প্রশ্নের উত্তর পত্রের সাহায্যে বুঝিতে পারা যাইবে না। কেননা,

گر مصور صورت آن دلستان خواهد کشید + لیک حیرانم که نازش را چنان خواهد کشید

"চিত্রকর যদিও সেই প্রাণ-প্রতিমের ছবি অঙ্কন করিতে পারিবে, কিন্তু আমি ভাবিয়া অবাক হইতেছি—তাহার অঙ্গ-ভঙ্গীর ছবি কেমন করিয়া আঁকিবে!" কোন বিচক্ষণ তাজ্‌বীদজ্ঞের মুখে শুনিয়া বুঝিতে পারিবে।

বন্ধুগণ! আমি বলিতেছিলাম, কতক বিষয় এমনও আছে যাহা শুধু পুস্তক পড়িয়া শিক্ষা করা যায় না; বরং উহা শিখিবার জন্য ওস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয়। কেননা, কতক বিষয় অন্তরে অন্তরে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে অর্জন করিতে হয়। ইহা কেবল তাসাউফ এবং মা'রেফত শিক্ষার জন্যই নির্দিষ্ট নহে; বরং প্রত্যেক বিদ্যায়ই একটি বিষয় এমন আছে যাহা ছাত্র ও শিক্ষকের অন্তরে অন্তরে সম্পর্ক স্থাপন দ্বারাই অর্জন করিতে হয়।

خوبی همین کرشمهٔ ناز و خرام نیست + بسیار شیوه هاست بتان را که نام نیست

"এই ভ্রূভঙ্গী-যুক্ত ইঙ্গিত, প্রেমের ছলনাযুক্ত ভাবভঙ্গী এবং মনোহর চলন ভঙ্গীমাই সুন্দরীর সৌন্দর্য নহে। প্রেম-প্রতিমা সুন্দরীদের এমন অনেক চাল-চলন বা অভ্যাস আছে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।"

তবে কোরআনই এমন সস্তা কেন হইয়া গেল যে, উহার ভাবার্থ ওস্তাদ ব্যতীতই হৃদয়ঙ্গম হইয়া যাইবে? আজকাল "তা'বীরাতে হিন্দ" নামক কিতাবের অনুবাদ উর্দু ভাষায় বাহির হইয়াছে, কেহ উক্ত অনুবাদ দেখিয়া উহার সঠিক অর্থ বর্ণনা করুক দেখি? নিশ্চয়ই অনেক জায়গায় ভুল করিবে। অনুরূপভাবে স্বর্ণ প্রস্তুত বিষয়ক কিমিয়ার কিতাবসমূহও উর্দু ভাষায় লিখিত হইয়াছে, উহা দেখিয়া কেহ স্বর্ণ প্রস্তুত করুক দেখি? কখনও প্রস্তুত করিতে পারিবে না। সুতরাং তরজমা পাঠ করা কোরআনের অর্থ শিখিবার সঠিক পন্থা নহে। তরজমা পাঠ করিতে হইলে আগে আরবী ব্যাকরণ এবং কিছু পরিমাণ ফেকাহ্ শাস্ত্র পড়িয়া অতঃপর কোরআনের তরজমা পাঠ করুন। যদি ইহাও সম্ভব না হয়, তবে অন্ততঃ কোন আলেমের নিকট উর্দু তরজমা সবকে সবকে পড়িয়া লউন।

॥ অর্থের ক্ষেত্র ॥

আমি পূর্বে বলিয়াছি, আধুনিক শিক্ষার কারণে একদল লোকের আকিদা (ধর্ম বিশ্বাস) নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর একদল সাধারণ লোক। তাহাদের আকিদা

এরূপ নহে যে, অর্থ না বুঝিয়া কোরআন শরীফ পাঠ করায় কোন লাভ নাই। কিন্তু তাহারা আধুনিক শিক্ষিত লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া কোরআন শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছে না। অতএব, ইহারাও অন্য প্রকারে এই ভুলে লিপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং এখন আমি সেই ভুলটি সংশোধন করিতে মনস্থ করিয়াছি। এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে الٓر বলিয়াছেন, এইগুলি পৃথক পৃথক হরফ। ইহার অর্থ আমাদের অজ্ঞাত, অবশ্য কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলেম বলিয়াছেন যে, এ সমস্ত পৃথক পৃথক হরফের অর্থ হুযুর (দঃ) অবগত ছিলেন, কিন্তু উম্মতবৃন্দের মধ্যে কাহাকেও বলা হয় নাই। আমি আমার বক্তব্য বর্ণনায় এই হরফগুলি দ্বারাও সাহায্য গ্রহণ করিব। শ্রোতৃবৃন্দ অবশ্য বিস্মিত হইবেন যে, অর্থই যখন জানা নাই তখন ইহা দ্বারা বক্তব্য বিষয় কেমন করিয়া প্রমাণিত হইবে!

কিন্তু আমার বর্ণনার পরে আপনাদের এই বিস্ময় দূর হইয়া যাইবে। এখন আমি আয়াতগুলির তরজমা বর্ণনা করিতেছি। অতঃপর উক্ত হরফগুলির সাহায্যে আমার বক্তব্য প্রমাণ করিব। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

"ইহা কিতাব ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত। পরবর্তী আয়াতটির তরজমাও এই রূপই। কেবল كتاب এবং قران শব্দগুলি আগে পরে হওয়ার পার্থক্য। এস্থলে আয়াতের দুইটি ছিফত বা বিশেষণ বর্ণনা করা হইয়াছে। একটি 'কোরআন' অপরটি 'কিতাব'। 'কোরআন' শব্দের অর্থ পড়ার উপযোগী এবং 'কিতাব' শব্দের অর্থ লিখার উপযোগী। পড়ার ও লিখার উপযোগী বস্তু কি? তাহা বর্ণনার মুখাপেক্ষী নহে। তাহা শব্দ ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, অর্থ বা মনোগতভাবকে কে লিখিতে পারে বা পড়িতে পারে? এখন একটি বিষয় আমার মনে উদিত হইয়াছে, যাহা প্রথমে মনে পড়ে নাই। এযাবৎ তো একথাই মনে ছিল যে, শব্দই লেখার ও পড়ার উপযোগী বস্তু। মনোগতভাব বা অর্থকে কেহ লিখিতে পড়িতে পারে না।

এ সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনা মনে পড়িয়াছে। আরবী ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিদগণ বলিয়াছেন, ضرب ক্রিয়ার অভ্যন্তরে هو সর্বনামটি উহ্য আছে। ইহার অর্থ এই যে, هو সর্বনামটি এখানে বাহিরে উল্লেখ করা না হইলেও বুঝা যায়। কিন্তু জনৈক ছাত্র মনে করিল যে, ضرب শব্দের মধ্যে هو সর্বনামটি লুক্কায়িত আছে। অতএব, সে ضرب শব্দটিকে ঘষিতে আরম্ভ করিল। এমন কি কাগজ ছিঁড়িয়া গেল এবং ঘটনাক্রমে ضرب শব্দের নীচে ঠিক সেই স্থানে অপর পাতায় هو শব্দ লিখিত ছিল। সে উহাতে খুব আনন্দিত হইল এবং মনে মনে বলিল, ওস্তাদজী তো ঠিকই বলিয়াছেন। সত্যই তো এখানে هو শব্দটি লুক্কায়িত ছিল; কাগজ ছিঁড়িতেই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। অতঃপর সে দৌড়াইয়া ওস্তাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, দেখুন হুযূর! আমি ضرب শব্দটিকে ঘষিয়াছিলাম,

এই যে, উহার ভিতরে লুক্কায়িত ولد বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ওস্তাদ তাহার কথা শুনিয়া খুব হাসিলেন এবং কথাটির মতলব তাহাকে পুনরায় বুঝাইয়া দিলেন।

মোটকথা, এই ছাত্রটি বুঝিয়াছিল যে, অদৃশ্য মনোগত অর্থও লিপিবদ্ধ হইতে পারে, ইহা তাহার ভুল। মনোগত অর্থ লেখাও যায় না, পড়াও যায় না। উহার ক্ষেত্র শুধু অন্তর। মানুষ বেতারের খবর শুনিয়া বিস্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা উহা পূর্ব হইতেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। কেননা, শব্দ হইতে অর্থ বুঝিয়া লওয়া বেতারের খবরই তো বটে। কারণ, অর্থের কেন্দ্র অন্তর। সুতরাং যখনই কাহারও মুখ হইতে কোন শব্দ বহির্গত হয়, তৎক্ষণাৎ উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়।

।। শব্দের অর্থ ।।

সারকথা, এই আয়তগুলিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ; বরং স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, কোরআন শরীফের সহিত পড়ার সম্পর্ক রাখ। কেননা, 'কোরআন' শব্দের অর্থ ইহাই। বলাবহুল্য, শব্দকেই পড়া যায়, অর্থকে নহে। 'আয়াতের' দ্বিতীয় ছিফাত বা বিশেষণ উল্লেখ করা হইয়াছে 'কিতাব', ইহার অর্থ 'লিখার উপযোগী'। ইহাতে বুঝা যায় যে, কোরআনের শব্দগুলির সহিত পড়িবার সম্পর্ক ছাড়া লিখিবার এবং আয়ত্ত করার সম্পর্কও রাখা উচিত।

এতক্ষণ পর্যন্ত তো কেবল এই কথাটিই মনের মধ্যে ছিল। এখন আমার মনে যে আর একটি কথার উদয় হইয়াছে—তাহা এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে 'কিতাব' শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র শব্দও নহে অর্থও নহে। কেননা, শব্দগুলি তো মুখে উচ্চারিত হয় ; সুতরাং উহাদের ক্ষেত্র মুখ। অভিধানে لفظ শব্দের অর্থ 'নিক্ষেপ করা' ; মুখ হইতে শব্দগুলি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে لفظ বলা হয়। পক্ষান্তরে অর্থের ক্ষেত্র শুধু অন্তর। উহাকে তো কোনক্রমেই কিতাব বলা যাইতে পারে না। অতএব, কিতাব শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র শব্দ এবং অর্থ ছাড়া অন্য কিছু ; অর্থাৎ 'নক্শা' যাহাকে সাধারণ লোক 'কেরম কাটা' বলিয়া থাকে। কেননা, সাধারণ উম্মী লোকেরা লিখিতেও জানে না পড়িতেও জানে না। কাজেই তাহারা শব্দ ও অক্ষরগুলিকে আঁকা-বাঁকা দাগ বা 'কেরম কাটা' বলিয়া থাকে। কিন্তু 'কিতাব' শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র নিছক চিহ্ন বা আকৃতি নহে ; বরং ঐ সমস্ত আকৃতি, যাহা কোন অর্থ বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতিগতভাবে আকৃতিকে 'কিতাব' বলা যাইবে না। যেমন, শব্দগুলিও প্রকৃতিগতভাবে কোন অর্থ বুঝায় না ; বরং যে শব্দ যে অর্থের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে—তাহাই বুঝাইবে। যদি প্রকৃতিগতভাবে কোন শব্দ অর্থ বুঝাইত, তবে অন্য ভাষা-ভাষীও তাহা বুঝিতে পারিত। কিন্তু তাহা পারে না। এইরূপে নক্শাগুলিও কোন নির্দিষ্ট শব্দ বুঝাইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব, সৃষ্টির কারণেই কোন আকৃতি কোন নির্দিষ্ট শব্দ বুঝাইয়া

থাকে। এই কারণেই শিক্ষিত লোক তাহা বুঝিতে পারে। নিরক্ষর লোকেরা বুঝিতে পারে না। আপনারা এখন নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আকৃতিগুলিকেই কিতাব বলা হইবে। কিন্তু একদল লোক কোরআনের শব্দগুলিকেই অনর্থক বলিয়া থাকে। অথচ এই আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, কোরআনের আকৃতিগুলিও সংরক্ষণের যোগ্য এবং সম্মানের পাত্র। এখন তো বিপরীত বোঝাই ঘাড়ে চাপিল—"নামায মাফ করাইবার জন্য গেলাম; (তাহা তো হইলই না) উল্‌টা রোযাও আসিয়া গলায় জড়াইল"।

কিন্তু বন্ধুগণ! ইহা গলায় জড়ায় নাই। কেননা, ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন —কোন বাদশাহ্ কোন এক ব্যক্তিকে বহু স্বর্ণমুদ্রা ও হীরা জওয়াহেরাত দিয়া বলিল, ইহাকে খুব হেফাযতে রাখিও, তালা বন্ধ করিয়া রাখিও। যদি সে ব্যক্তি স্বর্ণমুদ্রা রত্ন রাজির মূল্য বুঝে, তবে সে এই হুকুমটি খুব যত্ন সহকারে পালন করিবে এবং বলিবে:

جزاک اللہ کہ چشمم باز کردی + مرا با جان جاں ہمراز کردی

"আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন! কেননা, আপনি আমার জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, আমার প্রাণ বস্তুর সহিত আমাকে পরিচিত করাইয়াছেন।"

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি টাকা-পয়সার মূল্য জানে না সে ব্যক্তি বলিবে: "আচ্ছা আপদ ঘাড়ে চাপিল! হেফাযত কর এবং তালা বন্ধ করিয়া রাখ।"

এইরূপে যাহারা কোরআনের অর্থের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তাহারা কোরআনের শব্দ এবং আকৃতিরও মর্যাদা দিবে। কেননা, শব্দ ও আকৃতি অর্থকেই সংরক্ষিত রাখার উপকরণ। আর যাহারা অর্থকেও মর্যাদা দেয় না তাহারা শব্দ ও আকৃতিকে আপদই মনে করিবে। অতএব, বুঝিতে হইবে—যে সমস্ত নব্যশিক্ষিত লোক কোরআনের শব্দগুলিকে তেলাওয়াত করা নিষ্ফল মনে করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কোরআনের অর্থকেও কোন মর্যাদা দেয় না। অন্যথায় তাহারা উহার হেফাযতের সর্ববিধ উপকরণেরই মূল্য প্রদান করিত।

॥ কোরআনের শব্দগুলির হেফাযত ॥

বন্ধুগণ! কোরআনের সংরক্ষণ ব্যাপারে উহার শব্দগুলির বিশেষ কার্যকরিতা রহিয়াছে। কেননা, কোরআনের শব্দগুলির এক অস্বাভাবিক গুণ এই যে, অতি সহজে মুখস্থ হইয়া যায়। খোদা না করুন! খোদা না করুন!! এই কাগজে লিখিত কোরআন শরীফ যদি একেবারে লোপ পাইয়াও যায়, তবে একটি হাফেযে-কোরআন বালক নিজের স্মৃতিপট হইতে উহা পুনরায় লিখাইয়া দিতে পারিবে; বয়স্কদের কথা না-ই বলিলাম।

মুযাফ্‌ফর নগরের একটি ঘটনা—জনৈক বক্তা তথাকার এক সভায় কোরআনের এই মো'জেযা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কাজেই তিনি ওয়াযের মধ্যস্থলে একটি

আয়াত কিছুদুর পাঠ করিয়া আট্‌কিয়া গেলেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ 'এই মজলিসে ছোট বড় যত হাফেযে-ক্বোরআন আছেন তাঁহারা দয়া করিয়া দাঁড়াইয়া পড়ুন। একটি আয়াত সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে। আমি তাহা পরিষ্কার করিয়া লইতে চাই। তৎক্ষণাৎ চতুর্দিক হইতে অনেক লোক দাঁড়াইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে অল্পবয়স্ক বালকও ছিল, যুবকও ছিল, বৃদ্ধও ছিল এবং অর্ধবয়সীও ছিল। ইহা দেখিয়া ওয়ায়েয ছাহেব বলিলেনঃ "আলহামদু লিল্লাহ্, বন্ধুগণ! কোন আয়াতে আমার সন্দেহ হয় নাই। আমি শুধু এতটুকু দেখাইতে চাহিয়াছিলাম যে, এই মজলিসে ইচ্ছা করিয়া কেহ হাফেযদিগকে একত্র করে নাই। ঘটনাক্রমে এমনিই আসিয়া পড়িয়াছেন। তবুও এই সভায় এত হাফেজের সমাবেশ। এখন অনুমান করুন সমগ্র শহরে কত হাফেয আছেন। তৎপর ধারণা করুন—সমগ্র জিলায় কত, পুরা ভারতে কত এবং গোটা দুনিয়ায় কত হাফেয থাকিতে পারেন।"

বন্ধুগণ! ইহাকে ক্বোরআনের মো'জেযা না বলিয়া আর কি বলা যায়? এই যুগে যখন ক্বোরআনের প্রতি আগ্রহ হওয়ার কোন উপকরণ নাই। হাফেযগণ কোন বড় চাকুরীও পান না; বরং দেশের নেতৃস্থানীয় লোকদের অধিকাংশই ইংরেজী পড়ার পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে বিধর্মিগণ ক্বোরআনকে লোপ করিয়া দেওয়ার জন্য নানাবিধ চেষ্টা চালাইতেছে। তথাপি হাফেযের সংখ্যা এত অধিক যে, শিশুরাও ক্বোরআনের হাফেয। আবার পুরুষ হাফেয তো আছেই কোন কোন স্থানে মেয়েলোক হাফেযও রহিয়াছে। 'পানিপথ' গ্রামে বহু মেয়েলোক হাফেয আছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার সাত ক্বেরাআতেরও হাফেয।

বন্ধুগণ! আমি নিতান্ত স্বাধীনতার সহিত পরিষ্কার ভাষায় বলিতেছি, যাহারা অর্থ না বুঝিয়া ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াত করাকে নিরর্থক মনে করে, তাহারা আল্লাহ্ তা'আলার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআনের হেফাযতের জন্য হাফেয সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, আর ইহারা দুনিয়া হইতে ক্বোরআনের অস্তিত্ব লোপ করিতে চায়। কেননা, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে শৈশবেই ক্বোরআন-হেফ্‌য ভাল হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তত হেফ্‌য হয় না শৈশবে যেমন হইয়া থাকে। আবার শিশুরা শৈশবে ক্বোরআনের অর্থ বুঝিবার উপযোগী হয় না। অতএব, ইহাদের পরামর্শানুযায়ী যদি শিশুদিগকে ক্বোরআন পড়িতে না দেওয়া হয়, তবে ফল এই দাঁড়াইবে যে, হেফ্‌যের দরজা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ

وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ *

"কাফেরেরা ফুৎকার দিয়া আল্লাহ্‌র আলো নিভাইয়া দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহার আলো পূর্ণ না করিয়া ছাড়িবেন না, যদিও কাফেরেরা তাহা পছন্দ না করুক।"

ইহারা খোদার নূর মিটাইয়া দিতে চায়। খোদার কসম! ইহারা নিজেরাই লোপ পাইবে। খোদার নূর তাহাদের লোপ করাতে লোপ পাইবে না। তাহারা নিজেদের ঈমান রক্ষা করুক। তাহারা আছে কোন্‌ খেয়ালে? আল্লাহ্‌র কসম, তাহাদের নাম চিহ্নও থাকিবে না, তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কবি বলেন ঃ

چراغے را کہ ایزد بر فروزد + ہر آنکو تف زند ریشش بسوزد

"যে বাতি আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রজ্বলিত করেন তাহা নিভাইবার জন্য যে ব্যক্তি উহাতে ফুৎকার দেয় তাহারই দাড়ি পোড়া যায়।"

॥ আল্লাহ্‌র আলো নিভিতে পারে না ॥

কবি আরও বলেন ঃ

اگر گیتی سراسر باد گیرد + چراغ مقبلاں ہرگز نمیرد

"সমগ্র বিশ্ব বায়ুতে পরিপূর্ণ হইলেও আল্লাহ্‌র দ্বারে আগন্তকদের বাতি কখনও নিভিবে না।"

এই আল্লাহ্‌ওয়ালা কবি এই কবিতাটি আল্লাহ্‌ওয়ালাগদের আলো সম্বন্ধে বলিয়াছেন। অতএব, দেখুন আল্লাহ্‌র প্রেমিক বান্দাগণের আলোই যখন কাহারও লোপ করাতে লোপ পায় না, তবে স্বয়ং আল্লাহ্‌পাকের নূর কেমন করিয়া লোপ পাইতে পারে? কোন কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের উপর যালেমেরা উৎপীড়ন করিয়াছে। তাঁহাদিগকে অপমান করিতে চাহিয়াছে। তাঁহাদের মাযারের উপর মলমূত্র নিক্ষেপ করাইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের নাম এবং তাঁহাদের আলো আজ পর্যন্ত উজ্জ্বল এবং দীপ্তিমান রহিয়াছে। অথচ সেই উৎপীড়ক যালেমের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। কেহ তাহার নামের খবরও রাখে না। তাহার কবরেরও কোন চিহ্ন নাই। আর আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের মাযারসমূহ এখন পর্যন্ত মানুষের লক্ষ্যস্থল হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা চাক্ষুষ দেখা গিয়াছে যে, আল্লাহ্‌ ওয়ালাগণ নিজদিগকে নিজেরাই লোপ করিয়া দিতেন। নিশ্চিহ্ন করিতে ও নিরুদ্দেশ করিতে চাহিতেছেন এবং দুনিয়াদারেরা বিভিন্ন উপায়ে নিজেদের প্রচার ও খ্যাতি কামনা করিতেছে। কিন্তু খোদা-প্রেমিকগণ প্রজ্বলিত ও বিখ্যাত হইতেছেন আর দুনিয়াদারদের খ্যাতি কিছুদিনের জন্য হইয়া পরে মাটির সঙ্গে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায়। আল্লাহ্‌ওয়ালা কোন কোন গ্রন্থকার নিজ রচিত কিতাবে নিজের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করেন নাই। তথাপি তাঁহাদের কিতাব জনপ্রিয়তা অর্জন

করিয়া যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চলিতেছে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদার লেখকগণ নিজেদের পুস্তকে বড় আড়ম্বরের সহিত নিজেদের নাম প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের পুস্তক কেহই জিজ্ঞাসা করে না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা মনে পড়িয়াছে। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম কি ? সে ব্যক্তি নিজের নাম ফলাইবার উদ্দেশ্যে বলিল : ابو عبد الله السميع العليم الذى لا يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه-

এ পর্যন্ত বলিতেই জিজ্ঞাসাকারী হাসিয়া বলিল : مرحبا بك يا نصف القرآن অর্থাৎ, শাবাস ! অর্ধেক কোরআনের উপনামধারী। মোটকথা, অহংকারী লোকেরা যে প্রকারেই হউক নিজেদের নাম ফলাইতে চায়।

এইরূপে মসনবী শরীফে এই জাতীয়ই এক ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, লোকটি গরীব ছিল। কিন্তু নিজেকে বড় লোক বলিয়া প্রকাশ করিত। নিজের ঘরে এক টুক্‌রা চামড়ায় চর্বি মাখাইয়া রাখিয়াছিল। প্রত্যহ চর্বি দ্বারা গোঁফ তৈলাক্ত করিয়া বাহিরে যাইত এবং লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইত : 'আজ আমি পোলাও খাইয়াছি, কোরমা খাইয়াছি।' একদিন এইরূপে কোন একজন লোকের নিকট বড়াই করিতেছিল, এমন সময় তাহার ছেলে ঘর হইতে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, আব্বা ! যে চামড়াখানি হইতে আপনি আপনার গোঁফকে চর্বিযুক্ত করিতেন একটি বিড়াল তাহা নিয়া পালাইয়াছে। ছেলে গোমর ফাঁক করিয়া দিতেই মানুষ বুঝিতে পারিল, এই লোকটি প্রতিদিন মিথ্যা বলিতেছে। চর্বি দ্বারা গোঁফ তৈলাক্ত করিয়া পোলাও কোরমা খাওয়ার দাবী করিতেছে। ফলকথা, কৃত্রিমতা কখনও স্থায়ী হয় না। একদিন গোমর ফাঁক হইয়া যায়। তখন লোক-চক্ষুতে সম্মানিত হওয়ার পরিবর্তে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ বিভিন্ন উপায়ে নিজদিগকে গোপন রাখিতে ও নিশ্চিহ্ন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে আরও অধিকতর প্রজ্জ্বলিত ও বিখ্যাত করিয়া তোলেন :

نه کچه شوخی چلی باد صبا کی + بگڑنے میں بهی زلف اسکی بنا کی

"প্রাতঃকালীন উদ্ধত বায়ু তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। তাহার চুলগুলি এলোমেলো করার মধ্যে আরও সুন্দরভাবে বিন্যস্ত হইয়া গেল।"

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ কাছেম ছাহেব(রঃ)-এর অবস্থা এইরূপ ছিল যে, এমন পোশাক পরিধান করিতেন যেন লোকে তাঁহাকে আলেম বলিয়া চিনিতে না পারে। আবা-কাবাও পরিতেন না, চোগাও পরিতেন না, মল্‌মল্‌ এবং তান্‌যীব নামক মিহীন কাপড়ের জামাও পরিতেন না ; বরং গাঢ় মোটা মারকিন কাপড় তাঁহার পোশাক ছিল। এই কাপড় পরিয়াই তিনি বড় বড় মজলিসে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু সমস্ত আবা-কাবা ও চোগাধারিগণ তাঁহার সম্মুখে অকর্মণ্য হইয়া থাকিতেন। অন্য

কাহাকেও কেহ জিজ্ঞাসাও করিত না। শাহ্‌জাহানপুরে একবার অমুস্‌লিমদের সহিত এক বিরাট বাহাছের মজলিস হইয়াছিল। অনেক চোগা ও যুব্বা পরিহিত আলেম তথায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত মাওলানা সেই সাধারণ কোর্তা এবং লুঙ্গী পরিয়াই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি বক্তৃতা করিলে শাহ্‌জাহানপুরবাসীদের উপর উহা এত প্রভাব হইয়াছিল যে, তথাকার হিন্দু মহাজন এবং বানিয়াগণও বলিয়াছিল, নীল বর্ণের লুঙ্গীওয়ালা মৌলভীই জিতিয়া গেল। নদীর স্রোতের ন্যায় বক্তৃতা করিয়াছে। কেহ তাহার কথার উত্তরই দিতে পারে নাই।

এতদ্ভিন্ন মাওলানার ইহাও অভ্যাস ছিল যে, কাহারও নিকট নিজের নাম প্রকাশ করিতেন না। কাহারও নিকট তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে তিনি সঙ্গীদিগকেও নিষেধ করিয়া দিতেন। কেহ যদি তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিত ঃ হুযূর 'আপনার নাম কি?' বলিতেন, খুরশীদ হুসাইন। কেননা, তাঁহার জন্ম তারিখ সংক্রান্ত নাম ইহাই ছিল। কিন্তু সে নাম লোকে জানিত না। সুতরাং কেহ বুঝিতে পারিত না যে, তিনিই মাওলানা কাছেম ছাহেব। কেহ বাড়ীর নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, এলাহাবাদ। নানুতার কথা বলিতেন না। সঙ্গিগণ বলিত, হযরত! আপনার বাড়ী এলাহাবাদে কেমন করিয়া হইল? অর্থাৎ ইহা তো মিথ্যা হইল। তিনি বলিতেন, নানুতাও আল্লাহ্‌রই আবাদকৃত। সুতরাং আভিধানিক অর্থে প্রত্যেক বস্তুই এলাহাবাদ। অর্থাৎ, আমার উক্তি মিথ্যা হয় নাই। وفى المعاريض مندوحة عن الكذب অর্থাৎ দ্ব্যর্থবোধক ভাষার মধ্যে প্রশস্ততা আছে, যদ্দ্বারা মিথ্যা বলা হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আত্ম-গোপনের এত চেষ্টা সত্ত্বেও কি তিনি গোপন থাকিতেন? আল্লাহ্‌ তাঁহাকে প্রজ্জ্বলিতই করিতেন।

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সম্মান এত শ্রেষ্ঠ যে, তাঁহাদের খ্যাতিলাভের বাহ্যিক উপায় অবলম্বন এবং আড়ম্বরের উপকরণের প্রয়োজন হইত না। ইহা ঐ সমস্ত লোকের কাজ যাহাদের সত্যিকারের সম্মান নাই। তাহারাই সম্মান লাভের উপায় অন্বেষণ করে এবং খ্যাতিলাভের উপকরণ অবলম্বন করে। কবি মুতানাব্বী বলেন ঃ

حسن الحضارة مجلوب بتطرية + وفى البداوة حسن غير مجلوب

افدى ظباً فلاة ما عرفن بها + مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب

فلا برزن من الحمام ماثلة + اوراكهن صقيلات العراقيب

"অর্থাৎ, শহুরে মেয়েদের সৌন্দর্য কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট হয়। আর গ্রাম্য সুন্দরী মেয়েলোকের সৌন্দর্য স্বাভাবিক। উহাতে কৃত্রিমতার কোনই দখল নাই; সুতরাং প্রকৃত সৌন্দর্য উহাই যাহাতে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র নাই; স্বভাবতঃই সুন্দর দেখায়। কাজেই কামেল লোকেরা সাদা-সিধা পোশাকে চলাফেরা করেন। ইহা কেবল আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সঙ্গেই নির্দিষ্ট নহে; বরং দুনিয়াবী বিদ্যায়ও যাঁহারা কামেল,

তাঁহাদের মধ্যে পরিপক্কতার কারণে স্বভাবতঃ সরলতা ও সাদাসিধা ভাব আসিয়া যায়। তাঁহারা বাহ্যিক সাজ-সজ্জা বা আড়ম্বরের পরোয়া করেন না। আপনারা কিমিয়া প্রস্তুতকারীদিগকে দেখিয়া থাকিবেন, কেমন অনাড়ম্বর অবস্থায় থাকেন। কেননা, উদ্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি পূর্ণ নিমগ্নতার কারণে নিজের অস্তিত্বের প্রতিও খেয়াল হ্রাস পায়। যেমন বরযাত্রীদের উদ্যোক্তা বা কার্যনির্বাহক সমগ্র বরযাত্রীদের মধ্যে নিকৃষ্ট বেশে থাকেন। অথচ অন্যান্য যাত্রীদের এন্তেযামকারী এক ঝোঁকের মধ্যে মত্ত থাকেন যদ্দরুন তাহার নিজের সাজ-সজ্জার প্রতি খেয়াল থাকে না। কাজেই আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের আভ্যন্তরীণ ঝোঁকের কারণে যদি তাঁহাদের মানসিক অবস্থা সাধারণের বিপরীত হয়—বিস্মিত হইবেন না; বরং না হওয়াটাই বিস্ময়ের কারণ মনে করিবেন।

আমি বলিতেছিলাম—আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের নূর কাহারও লোপ করিয়া দেওয়ায় লোপ পাইতে পারে না। তবে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার নুর কেমন করিয়া লোপ পাইতে পারে? অতএব, ইহা খোদারই হেফাযতী ব্যবস্থা—যুগে যুগে এত অধিক সংখ্যক 'হাফেযে-ক্বোরআন' বিদ্যমান থাকেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন।

॥ আল্লাহ্‌র মর্‌যীর প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা ॥

তদুপরি কেহ কেহ আবার এরূপও বলিয়া থাকে যে, খোদাই যখন ক্বোরআনের হেফাযত করিতেছেন, তখন সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করার বা ভাবিবার কি প্রয়োজন? বন্ধুগণ! এই কথাটি এমন অন্তর হইতে বাহির হইয়াছে যাহাতে খোদার সহিত সম্পর্ক ও মহব্বত কিছু মাত্রও নাই। সম্রাট পঞ্চম জর্জ আপনাকে কোন হাদিয়া বা উপহার প্রদান করিলে আপনি উহার অমর্যাদা করিতে পারেন কি? বিশেষ করিয়া তাঁহার সম্মুখে? কখনও পারেন না; বরং উহাকে মাথা ও চোখের উপর রাখিবেন এবং প্রাণের চেয়ে অধিক উহার হেফাযত করিবেন। আর যদি তিনি আপনাকে কোন খাদ্য দ্রব্য উপহার দেন এবং আপনি তাঁহার সম্মুখেই খাইতে আরম্ভ করেন, তবে উহার একটি টুকরাও কি আপনি মাটিতে পড়িতে দিবেন? কখনও দিবেন না; বরং এমন আগ্রহ ও সতর্কতার সহিত উহা আহার করিবেন যেন এরূপ নেয়ামত আপনার ভাগ্যে কোনদিন জুটিয়াছিল না। যদি উহার একটু রেণুও মাটিতে পতিত হয় তৎক্ষণাৎ আপনি উহা মাটি হইতে তুলিয়া মাথার উপর রাখিবেন।

ইহা হইতেই হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর তাৎপর্য বুঝিয়া লউন--"আহারের সময় যদি খাদ্য-দ্রব্যের কোন অংশ মাটিতে পড়িয়া যায়, তবে উহাকে পরিষ্কার করিয়া খাইয়া ফেল।" কেননা হুযূর (দঃ) অবগত আছেন যে, আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে দেখিতেছেন। কাজেই তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার প্রদত্ত নেয়ামতের অসম্মান

করা বড়ই নির্লজ্জতা হইবে। অতএব, বন্ধুগণ! খোদা তা'আলা এই কোরআন শরীফ আপনার হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলার এই মহা দানের সম্মান করা কি আপনাদের উচিত নহে? উহার হেফাযত কি আমাদেরও করা উচিত নহে? বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনকে যখন আপনাদের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, তখন তো ইহা আপনাদের সম্পদ। অতএব, সমস্ত বাদশাহ্দের বাদশাহ্র তরফ হইতে আপনি যে দান প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই মহামূল্যবান সম্পদের হেফাযত করাতে আল্লাহ্ তা'আলা সন্তুষ্ট হন এবং তিনি উহাকে সংরক্ষিতই রাখিতে ইচ্ছা করেন। অতএব, আপনাকেও খোদার মর্যীর উপরই চলা উচিত।

ইহার তত্ত্ব আল্লাহ্ওয়ালাগণের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। শাহেদৌলা নামক এক বুযুর্গ লোক ছিলেন। একদিন তাঁহার বস্তীর লোকেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল: হুযূর! নিকটস্থ নদী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বস্তীর দিকে আগাইয়া আসিতেছে। বস্তী জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। দো'আ করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা উহার স্রোতের গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া দেন। তিনি বলিলেন: আগামী কল্য ভোরে তোমরা সকলে কোদাল লইয়া এখানে উপস্থিত হইবে, আমি উহার ব্যবস্থা করিব। পরের দিন সমস্ত লোক উপস্থিত হইলে তিনি সকলকে নদীর পাড়ে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন: বস্তীর দিকে পানি যাওয়ার জন্য খাল কাটিয়া রাস্তা করিয়া দিতে আরম্ভ কর। লোকেরা বলিল: হুযূর! এইরূপে তো দুই দিনের স্থলে একদিনেই নদী বস্তীতে পৌঁছিয়া যাইবে। তিনি বলিলেন: নদীর গতি বস্তীর দিকেই হইতেছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার মর্যীও ইহাই দেখিতেছি। সুতরাং "যেদিকে মওলা সেদিকেই শাহেদৌলা।" তোমরা খাল খননের কাজ আরম্ভ করিয়া দাও। সে যুগের মানুষ বুযুর্গানে দ্বীনের বড়ই অনুগত ছিল। বস্তীর দিকেই খাল খনন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই পানির গতি পরিবর্তিত হইয়া নদীর স্রোতের ধার অপর দিকে প্রবাহিত হইল বস্তীর বিপদও কাটিয়া গেল। এই ছিল আল্লাহ্ওয়ালাগণের অবস্থা। দেখুন! তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার মর্যীর প্রতি কেমন লক্ষ্য রাখিতেন।

এখন দুনিয়াদারদের কথা শুনুন। তাহারা শাসনকর্তাদের মর্যীর প্রতি কিরূপ লক্ষ্য রাখিয়া থাকে। জনৈক বিশ্বস্ত লোক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন: কোন এক স্থানে জল-প্রণালীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার উহা শ্রমিক দ্বারা মেরামত করাইতেছিল। কিন্তু উহাতে যতই মাটি ফেলা হইতেছিল স্রোতের বেগে উহা ধুইয়া যাইতেছিল। ছিদ্র বন্ধ হইতে ছিল না। তখন উক্ত ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার লাফাইয়া গিয়া স্রোতের মুখে শুইয়া পড়িল এবং বলিল, এখন তোমরা মাটি ফেলিতে থাক—আমি স্রোতের বেগ কমাইয়া দিয়াছি। সে স্রোতের মুখে যাইয়া শয়ন করিতেই

বড় বড় কর্মচারিগণ তথায় যাইয়া শুইয়া পড়িল এবং শ্রমিকেরা মাটি ফেলিতে আরম্ভ করিল। অল্প সময়ের মধ্যেই পানি কমিয়া বাঁধের ছিদ্র বন্ধ হইয়া গেল। অতঃপর স্রোতের মুখে শায়িত লোকেরা ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিল। এখন দেখুন, ইহা প্রকৃতির নিয়ম—প্রজাবৃন্দ শাসনকর্তার মর্‌যীর প্রতি অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করে। তবে খোদা তা'আলা কি এতই সস্তা যে, যেদিকে তাঁহার মর্‌যী সে দিকে মোটেই মনোযোগ দেওয়া হইবে না? মাওলানা রূমী এই বিষয়টিকেই মসনবী শরীফে বলিতেছেন:

اے گراں جاں خوار دیدہ ستی مرا + زانکہ بس ارزاں خریدستی مرا

"হে নিষ্ঠুর! তুমি আমাকে হীন মনে করিতেছ। ইহার কারণ এই যে, খুব সস্তা মূল্যে তুমি আমাকে খরিদ করিয়াছ।"

॥ খোদা তা'আলার সহিত সম্পর্কহীনতা ॥

আমি আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতে পারি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত আমাদের সম্পর্ক খুব কম। মানুষ শুধু চাকুরী ও মোকদ্দমার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছে; বরং এরূপ বলিতে পারেন, কেবল রুটির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক রাখা হইতেছে। রুটি পাওয়া গেলে আর খোদার প্রয়োজন কি?

আর কোরআনেরই বা আবশ্যক কি? এরূপ সময়েই এ সমস্ত মাতলামি মাথা চাড়া দিয়া উঠে যে, "অর্থ না বুঝিয়া কোরআন তেলাওয়াতে লাভ কি?" আর খোদা স্বয়ং যখন কোরআনের হেফাযতকারী, তখন আর আমরা উহার হেফাযত করিবার প্রয়োজন কি? اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْم

আমাদের শহরে কোন এক ধনী জোতদারের পুত্র নামায পড়িতে আরম্ভ করিল এবং রমযান মাসে এ'তেকাফও করিতে শুরু করিল। আবার নামাযের পর দো'আও অনেকক্ষণ ব্যাপীয়া করিত। তখন তাহার চাচা বলিল: শস্তরা নামায পড়িয়া হাত উঠাইয়া খোদার কাছে কি প্রার্থনা করে? তাহার গৃহে কোন্ বস্তুর অভাব আছে? তাহার কাছে জমিন আছে, ঘর-বাড়ী আছে, গাভী আছে, বলদ ও মহিষ আছে, আর কি চায়?" তাহার মতলব এই যে, খোদার সঙ্গে তো কেবল রুটির সম্পর্ক, রুটির সমস্ত উপায় এবং উপকরণ যখন মওজুদ আছে, তখন আর খোদার সহিত কিসের সম্পর্ক? نَعُوْذُ بِاللّٰهِ

বন্ধুগণ! এই মূর্খ লোকটি তো মুখে এই কথাটি বলিয়াছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক লোকের কাজকারবারের ধারা হইতে এই অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে যে, খোদার সহিত তাহাদের সম্পর্ক খুবই কম। যেটুকু আছে তাহা কেবল নিজের মতলবের জন্য। যে কাজে নিজের মতলব নাই তাহাতে খোদার সহিত কোন সম্পর্কও নাই। আর খোদার সহিতই যখন এরূপ ব্যবহার, তখন মানুষের সহিত তাহারা এরূপ ব্যবহার করিলে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই।

এই তো অল্প কয়েক দিন আগেকার ঘটনা—এক ব্যক্তি একটি বিবাহ সম্বন্ধ মঞ্জুর করিয়া আবার উহা প্রত্যাখ্যান করে। এই ব্যক্তি ছিল আমার সহিত সম্পর্কযুক্ত ; সুতরাং বরপক্ষ হইতে আমার নিকট চিঠি আসিল, "আপনি কি আপনার মুরীদদিগকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ, সমাজের এই অবস্থা যে, কাহারও দ্বারা নিজের মতলব সিদ্ধ হইলে তাহাকে গাউস, কুতুব পর্যন্ত মানিয়া লইবে। আর মতলব হাছিল না হইলে দুনিয়ার যাবতীয় দোষ নিন্দা তাহার জন্য রচনা করিয়া লইবে। জানি না ভদ্রতা ও সভ্যতা মানব সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল ! আচ্ছা, সেই জ্ঞানী লোকটিকে কেহ জিজ্ঞাসা করুন তো, ছেলে তোমার, মেয়ে আর একজনের, মধ্যস্থলে গালি বর্ষণের নিমিত্ত আমাকে কেন রাখা হইল ? এতদ্ভিন্ন মেয়ে পক্ষই বা মন্দ বলিবার কি অধিকার তাহার আছে ? কেননা, কেহ বিবাহের প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়া যদি আবার প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে, তবে এমন কি গর্হিত কাজ করিয়া ফেলিয়াছে ? তোমার পাওনা টাকা মারিয়া খাইয়াছে ? তোমার জমিন ছিনাইয়া লইয়াছে ? মোটকথা, সে কি অপরাধ করিয়াছে ? নিজের সন্তানের মঙ্গল কামনা প্রত্যেকেই করে। হইতে পারে তোমার প্রস্তাব রক্ষা করা এখন আর তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে না। ইহাতে ক্ষুব্ধ হওয়ার বা কাহাকেও মন্দ বলার কি কারণ আছে ? কিন্তু মানব সমাজ হইতে আজকাল সভ্যতা ও ভদ্রতা বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। নিজের স্বার্থের খাতিরে তাহারা কাহারও ইয্‌যতের মর্যাদা বুঝে না, কিংবা কাহারও মনে কষ্ট দিতেও দ্বিধাবোধ করে না।

ইতিমধ্যে আর এক ব্যক্তির পত্র পাইয়াছি। হতভাগা উহাতে আল্লাহ্ পাকের শানে বড়ই ধৃষ্টতামূলক উক্তি করিয়াছে। আবার নির্বোধের মত প্রশ্নও করিয়াছে—আমি কাফের হইলাম না তো ? কমবখ্‌ত্‌, মরদুদ ! এখনও নিজের কাফের হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছে। ইসলাম কি এতই সস্তা যে তুমি উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিবে আর উহা তোমাকে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। খোদার সাথেই যখন মানুষের সম্পর্কের এই অবস্থা, তখন আমার মত অধমের সহিত কেহ এরূপ ব্যবহার করিলে কি অভিযোগ করা যাইতে পারে ? আল্লাহ্ তা'আলা কাহাকেও এক লাখ টাকা প্রদান করিলে সে আল্লাহ্‌র প্রতি খুবই সন্তুষ্ট, তখন আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তি হইতে কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা পাওয়ারও যোগ্য হন। কিন্তু রুটি সরবরাহে একটু ত্রুটি হইলে আল্লাহ্ তা'আলা (নাউযুবিল্লাহ্ !) কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্যও থাকেন না প্রশংসার যোগ্যও থাকেন না ; বরং সে তখন আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং ধৃষ্টতামূলক আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ইতিমধ্যে আমাদের এলাকার একটি ঘটনা—এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার উত্তরাধিকারী হয় তাহার এক স্ত্রী, এক কন্যা ও দুর সম্পর্কীয় এক আত্মাবা।

(কোরআন ওহাদীসের নির্দিষ্ট অংশের প্রাপকগণ নিজ নিজ অংশ গ্রহণের পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশ যাহারা পায় এবং নির্দিষ্ট অংশের প্রাপক কেহ না থাকিলে যাহারা সমূদয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে "আছাবা" বলে। যেমন, পুত্র ভাই ইত্যাদি)। উক্ত আছাবার সহিত তাহার ওয়ারিসগণের মনোমালিন্য ছিল। কিন্তু তাহারা ফারায়েয করাইয়া দেখিল, মৌলবী ছাহেব উক্ত আছাবাকেও সম্পত্তির অংশ প্রদান করিয়াছেন। বস্‌! ওয়ারিসগণ উক্ত ফতওয়াকে এবং উহার লেখক মৌলবী ছাহেবকে গালি দিয়া বলিতে লাগিল: ইহাও কি একটা কথা। এত দূরের আত্মীয়কে ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হইল! বলিলাম: ভাই! শরীঅতের মর্যাদা সেই আছাবা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর যে ব্যক্তি অপ্রত্যাশিতরূপে এতগুলি টাকার সম্পত্তির মালিক হইয়াছে। তুমি যদিও শরীঅতকে মন্দ বলিবে কিন্তু যে ব্যক্তি আশাতীতরূপে এতগুলি টাকা পাইয়াছে সে নিশ্চয়ই শরীঅতকে ভাল বলিবে। আরে দুরাচারের দল! শরীঅত যদি এইরূপে এমন কোন স্থান হইতে তোমাদিগকে ওয়ারিসী সম্পত্তি দান করে যেখান হইতে সম্পত্তি পাওয়ার কোন আশাও তোমাদের ছিল না, কল্পনাও ছিল না, তখন তোমরাই আবার শরীঅতের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিবে। ফলকথা, খোদার সাথে শুধু ধন-দৌলত এবং ডাল-রুটির সম্পর্ক, এতটুকু ব্যবস্থা হইয়া গেলে আল্লাহ্‌ই সব কিছু, অন্যথায় নাউযুবিল্লাহ্‌! তিনি কিছুই নহেন।

আর একখানা পত্র পাইলাম। উহাতে লিখিত আছে—কোন একজন স্ত্রীলোক স্বামী এবং এক ভাই উত্তরাধিকারী রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু স্বামী শিয়া সম্প্রদায়ের লোক। সুন্নীদের সহিত শিয়াদের বিবাহ জায়েয নাই। ভাই হিসাবে একমাত্র আমিই মৃতার ওয়ারিস।" আমি তাহাকে লিখিয়া দিলাম—"প্রশ্নের সহিত ইহাও তোমার লেখা উচিত ছিল, আমার ভগ্নি ২০ বৎসর ধরিয়া হারামী করিয়াছে এবং আমি ইহাতে সম্মত ছিলাম। আরে পাষণ্ড! তোমার লজ্জা হয় না? চার পয়সার সম্পত্তির জন্য নিজের ভগ্নীকে তাহার মৃত্যুর পরে ব্যাভিচারীণী সাব্যস্ত করিতে এবং নিজেকে দাইউস বলিয়া পরিচয় দিতে শুরু করিয়াছ? তোমার যদি জানাই ছিল যে, শিয়া মতাবলম্বীর সহিত সুন্নী স্ত্রীলোকের বিবাহ জায়েয নাই, তবে জানিয়া শুনিয়া একজন শিয়ার সহিত নিজের ভগ্নীর বিবাহ দিলেই বা কেন? যদি বিবাহের পূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে, তবে অবশ্য আমি বিবাহ না জায়েযই বলিতাম। কিন্তু এখন তোমার চারিটি পয়সা শুদ্ধ করিবার জন্য আমি একজন মুসলিম মহিলাকে ব্যাভিচারিণী সাব্যস্ত করিতে পারি না।

এইরূপে এক ব্যক্তি আমাদের শহরের মাদ্রাসায় ফারায়েয করাইতে আসিল, ফারায়েয লিখিয়া দিলে সে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অংশ কত? যখন জানিতে পারিল যে, তাহার প্রাপ্য কিছুই নাই। তখন সে ফারায়েয মাদ্রাসায় রাখিয়াই

চলিয়া গেল। বস্তুতঃ অধিকাংশ মানুষই নিজে কিছু অংশের মালিক হইবে মনে করিয়াই ফারায়েয করাইতে আসে। যদি বলিয়া দেওয়া হয় যে, এ সম্পত্তিতে তোমার কোন অংশ নাই, তবে সে আর ফারায়েযের নামও লয় না। শরীয়তের বিধান অবগত হওয়া কি তাহাদের উদ্দেশ্য ? শুধু নিজের স্বার্থের জন্যই ফারায়েয করাইয়া থাকে।

॥ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উপায় ॥

বন্ধুগণ! ইহার নাম সম্পর্ক নহে। খোদার সহিত সত্যিকারের সম্পর্ক থাকিলে অবস্থা এইরূপ হইত না। কোনও পুরুষ এবং সুন্দরী স্ত্রীলোকের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক হইলে প্রেমিক তাহার প্রেয়সীর জন্য নিজের জান-মাল কোরবান করিয়া দেয়। প্রেয়সীর কোন কথাই প্রেমিকের অসন্তোষের কারণ হয় না ; বরং সে বলে ঃ

نا خوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

درد از یار ست ودرمان هم + دل فدائے اوشد وجان نیز هم

"তোমার অসন্তোষ আমার মনে আনন্দ দান করে। আমার মনে দুঃখ প্রদানকারী বন্ধুর জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত। সে যেমন ব্যথা দেয় তেমনই উহার নিরাময়ের ব্যবস্থাও করে। জীবন-মন সবকিছুই তাহার জন্য কোরবান।" সে আরও বলে ঃ

زنده کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو + دل شده مبتلائے تو هرچه کنی رضائے تو

"জীবন দান কর, তোমার কৃপা। আর যদি প্রাণ সংহার কর, তবে তাহা তোমার জন্য উৎসর্গিত। অন্তর তোমাতেই নিমগ্ন, যাহাকিছু কর তোমার মরযী।"

বন্ধুগণ! মহব্বত উৎপন্ন হওয়ার কারণ—পূর্ণতাগুণ, সৌন্দর্য এবং দান। এই কয়েকটি বিষয়ই মহান আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ইহাতেও যদি তাহার সহিত মহব্বত না হয়, তবে আর কাহার সহিত হইবে ? খবর রাখেন কি, আল্লাহ্ তা'আলা কে ? যাবতীয় সৌন্দর্যেরই তিনিই আদি, তিনিই অন্ত। খোদা তা'আলা যখন এমন প্রিয়, তখন তাঁহার মরযীর প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের উচিত। আর খোদার মরযী হইল কোরআনকে সংরক্ষিত করা। সুতরাং সেদিকে মনোযোগ দেওয়া আপনাদের কর্তব্য এবং উহার শব্দগুলি সংরক্ষণের প্রতি পূর্ণরূপে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কেননা, কোরআনের ভাবার্থ এবং শব্দ উভয়ের গুরুত্বই সমান। কিন্তু শব্দের মধ্যে একটি বিষয় এই অতিরিক্ত আছে যে, শব্দের সংরক্ষণ ব্যতীত অর্থের সংরক্ষণ সম্ভব নহে। কেননা, শব্দের পরিচয় ব্যতীত অর্থ আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না।

॥ হুযূর (দঃ)-এর মুখস্থ শক্তি ও দৈহিক শক্তি ॥

দেখুন! সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর অন্তর মোবারকে কোরআনের ভাবার্থ অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তাহাও শব্দেরই মাধ্যমে হইয়াছিল এবং হুযুর (দঃ) শব্দগুলিকে

স্মরণ রাখার জন্য এত যত্নবান ছিলেন যে, ওহী নাযিল হইবার সময় তিনি হযরত জিব্রায়ীলের (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে উহা আওড়াইতে থাকিতেন। অথচ তাঁহার হেফ্‌য শক্তি খুবই প্রবল ছিল ; বরং তাঁহার সর্ববিধ শক্তিই খুব মজবুত ও দৃঢ় ছিল। তেষট্টি বৎসর বয়সেও তাঁহার পাকা চুলের সংখ্যা বিশের ঊর্ধ্বে ছিল না। যদিও তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক মস্তিষ্ক চালনা করিতেন। কেননা, যে সম্প্রদায়ে তিনি ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ছিল গণ্ডমূর্খ। শরীঅতের নাম পর্যন্ত জানিত না। হুযূর (দঃ) একাকী তাহাদের মধ্যে ইস্‌লাম ও তাওহীদের বাণী প্রচার আরম্ভ করেন। প্রথমে সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া কেহই তাঁহার মত গ্রহণ করে নাই। চিন্তা করুন, এমতাবস্থায় নিঃসঙ্গ একজন মানুষকে কত বড় চিন্তার সম্মুখীন হইতে হয় ; বিশেষতঃ সেই ব্যক্তি যদি দয়া ও অনুগ্রহশীল হন এবং প্রাণের সহিত নিজের সম্প্রদায়ের সংশোধনকামী হন। এমন মূর্খ সম্প্রদায়ের সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে তাঁহাকে কত বড় চিন্তার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল! যে জন্য তাঁহাকে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের স্থানে স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ - وَلَسْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ - وَلَا تُسْئَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيْمِ - لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ *

"তাহারা কেন ঈমান আনয়ন করে না, এই চিন্তায় কি আপনি নিজের জীবন বিনষ্ট করিয়া দিবেন ?" আবার কখনও বলেন : আপনাকে তাহাদের উপর সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করিয়া প্রেরণ করা হয় নাই।" "তাহাদের সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে না যে, ইহারা কেন ঈমান আনয়ন করিল না ?" আপনার দায়িত্ব শুধু ধর্ম প্রচার করা। اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ 'সংবাদ পৌঁছাইয়া দেওয়া ছাড়া আপনার আর কোন কর্তব্য নাই" এসমস্ত আয়াত হইতে বুঝা যায় যে, হুযূর (দঃ) তাঁহার সম্প্রদায়ের জন্য অহর্নিশ চিন্তা করিতেন। সর্বাপেক্ষা বেশী চিন্তা করিতেন আখেরাত সম্বন্ধে। আখেরাতের চিন্তার গুরুত্ব একমাত্র সেই ব্যক্তিই অনুমান করিতে পারেন যিনি সেই চিন্তার স্বাদ কিছুটা উপভোগ করিয়াছেন। এসম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : كان دائم الفكرة متواصل الاحزان 'তিনি সদাসর্বদা চিন্তামগ্ন থাকিতেন! অবিরত কোন না কোন চিন্তা তাঁহার অন্তরে লাগিয়াই থাকিত।" স্বয়ং হুযূর (দঃ) বলিয়াছেন :

وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْئَرُوْنَ *

"আল্লাহ্‌র শপথ! (আখেরাতের অবস্থা সম্বন্ধে) আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানিতে পারিলে তোমরা অতি অল্পই হাসিতে এবং অনেক বেশী কাঁদিতে। আর চীৎকার করিতে করিতে জঙ্গলের দিকে বাহির হইয়া পড়িতে।" এতবড় চিন্তার বোঝা মস্তিষ্কের উপর চাপান থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁহার পাকা চুলের সংখ্যা কুড়ির অধিক হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায়, তাঁহার সর্বপ্রকারের শক্তিই খুব প্রবল এবং দৃঢ় ছিল। বহু ঘটনা হইতে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ছাহাবায়ে কেরাম বলেন : যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থাকিত সেই সর্বাপেক্ষা অধিক বাহাদুর বা সাহসী বলিয়া গণ্য হইত। কেননা, হুযুর (দঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রুদের সম্মুখে সকলের আগে আগে থাকিতেন।

এতদ্ভিন্ন আবু-রোকানা আরবের বিখ্যাত বীর ছিল। সে আসিয়া হুযুরের সমীপে নিবেদন করিল : "আপনি যদি আমাকে কুস্তি প্রতিযোগিতায় হারাইয়া দিতে পারেন, তবেই আমি আপনার নুবুওয়তে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি।" (যদিও কুস্তীতে জয়ী হওয়ার সঙ্গে নুবুওয়তের কোন সম্পর্ক নাই, তথাপি আবু রোকানার মন শান্তির জন্য হুযুর তাহার সহিত কুস্তী লড়িতে সম্মত হইলেন।) ফলতঃ, কুস্তী হইল এবং তিনি আবু রোকানাকে ধরাশায়ী করিয়া দিলেন। সে বলিতে লাগিল : ঘটনাক্রমেই এইরূপ হইয়াছে। পুনরায় কুস্তী হউক। হুযুর (দঃ) পুনরায় তাহার সহিত কুস্তী লড়িয়া তাহাকে হারাইয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল।

এইরূপে হযরত ওমরের (রাঃ) ইস্‌লাম গ্রহণের ঘটনা হইতে হুযুর (দঃ)-এর দৈহিক শক্তি উত্তমরূপে প্রকাশ পায়। কেননা, হুযুর (দঃ) স্বীয় ছাহাবীগণসহ যে স্থানে লুক্কায়িত ছিলেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন তথায় পৌঁছিয়া কপাট খুলিতে চাহিলেন, তখন কপাটের ফাঁক দিয়া ছাহাবীগণ (রাঃ) তাঁহার আকৃতি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন এবং বলিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই যে ওমর তরবারি হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান এবং কপাট খুলিতে চাহিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমাদের ভয় হইতেছে। হুযুর (দঃ) বলিলেন : তোমরা কপাট খুলিয়া দাও। সে কি করিতে পারিবে? সদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকিলে খুশীর কথা। আর অসদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকিলে নিজের দুঃসাহসিকতার শাস্তি ভোগ করিবেই। অবশেষে কপাট খোলা হইলে হযরত ওমর যখন হুযুর (দঃ)-এর নিকটে পৌঁছিলেন। তখন হুযুর (দঃ) তাহার চাদরের কোন ধরিয়া খুব জোরে হেচ্‌কা টান মারিয়া বলিলেন : "ওমর! তোমার মঙ্গলের দিন এখনও কি আসে নাই? আর কতকাল তুমি আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরোধিতা করিতে থাকিবে" ইহাতেই আপনারা হুযুর (দঃ)-এর দৈহিক শক্তির পরিমাণ অনুমান করিতে পারেন। এত লোক যে ব্যক্তিকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছিল এবং কপাট খুলিয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতে ছিল,

তিনি তাহাকে একটুও পরোয়া করিলেন না এবং এমন ভাবে ধমকাইয়া দিলেন, যেমন কোন একজন সাধারণ লোককে ধমকান হয়।

সীরাতে ইব্‌নে-হিশাম কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ আছে, এক দিন হুযূর (দঃ) হযরত ওমরের সহিত একাকী মিলিত হইয়া নিতান্ত নির্ভীকভাবে তাঁহাকে ধমকাইয়া ছিলেন। বস্তুতঃ হুযূরের শক্তির কথা আর কি বলিবেন ঃ সেই যুগের সকল মানুষই অতিশয় শক্তিশালী ছিল। ছাহাবায়ে কেরামের স্মরণশক্তিও আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর হেফ্‌য্‌ শক্তি তো ছিল সকলের চেয়েই অধিক।

॥ শব্দ সংরক্ষণের গুরুত্ব ॥

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ক্বোরআনের শব্দগুলি স্মরণ রাখার জন্য তিনি এত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন যে, হযরত জিব্‌রায়ীলের সাথে সাথে তিনি ক্বোরআন পাঠ করিতে থাকিতেন। কেননা,

با ما یه ترا نمی پسند م -|- عشق ست و هز ا ر بد گما نی

"ছায়ার সহিত তোমাকে পছন্দ করি না। এশ্‌কে পতিত হইলে সহস্র রকমের সন্দেহে পতিত হইতে হয়।"

তিনি সেই প্রিয় শব্দগুলিকে ভুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা করিতেন, পাছে তাঁহার স্মরণ-পট হইতে শব্দগুলি বাহির হইয়া না যায়, এই ভয়ে তিনি ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে পড়িয়া যাইতেন। ইহা হইতে অনুমান করুন, ক্বোরআনের শব্দগুলির প্রতি তাঁহার কত অনুরাগ ছিল! এমন কি, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহাকে এ বিষয় নিষেধ করিয়া দিতে হইয়াছিল যে, আপনি ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে পড়ার কষ্ট স্বীকার করিবেন না, لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ অর্থাৎ, আপনার স্মরণপটে ক্বোরআনকে অঙ্কিত করিয়া দেওয়ার দায়িত্ব আমি স্বয়ং গ্রহণ করিতেছি। এই নিশ্চয়তামূলক সান্ত্বনা প্রদানের পর হইতে হুযূর (দঃ)আর ফেরেশ্‌তাদের সাথে সাথে পড়িতেন না। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন ক্বোরআনের শব্দগুলির এমন গুরুত্ব ছিল, তখন আমাদেরও উচিত উহার সম্মান করা। কেননা, শব্দ ব্যতীত অর্থের হেফাযত করা যাইতে পারে না ; সুতরাং শব্দগুলিকে কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেই উহার অর্থের হেফাযত করাযাইতে পারে। প্রাচীনযুগের ধর্মপরায়ণ ওলামায়ে কেরাম ক্বোরআনের হরফগুলি এবং লিখন-পদ্ধতিরও এতদুর হেফাযত করিয়াছেন যে, ক্বোরআনের লিখন ও মুদ্রণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কিতাবসমূহ রচনা করিয়াছেন এবং উহাকে একটি স্বতন্ত্র বিষয়রূপে নির্ধারণ করিয়া, ক্বোরআনের লিখন ও মুদ্রণ পদ্ধতিতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন না-জায়েয করিয়া দিয়াছেন।

বন্ধুগণ! বর্তমান যুগে পুরাতন স্মৃতি সংরক্ষণের প্রতি এত গুরুত্ব প্রদান করা হইয়া থাকে যে, উহার আকৃতি বিকৃত হইয়া যাওয়ার পরেও উহার ফটো গ্রহণ করা হয়। অতএব, খোদা না করুন, কোরআনের পুরাতন লিখন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়া থাকিলেও তো পুরাতন স্মৃতি হিসাবে উহার হেফাযতের প্রয়োজন ছিল, অথচ উহা সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ও নিখুঁত রহিয়াছে; বরং এই লিখন-পদ্ধতি বা রস্‌মে-খতের মধ্যে বহু সূক্ষ্মতত্ত্বও নিহিত আছে। যেমন, একস্থানে يَقْدِرُ শব্দে الف লেখা হয় নাই, কেননা এস্থলে অন্য কেরআতে يُقَدِّرُ পড়া হইয়াছে; সুতরাং লিখন-পদ্ধতির সাহায্যে অন্য কেরআতের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরাম এই শব্দে الف না লিখিয়া يُقَدِّرُ লিখিয়াছেন। এইরূপে সূরায়ে-ফাতেহার মধ্যে مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ -এর مَالِكِ শব্দেও الف লিখেন নাই। কেননা অন্য কেরআতে مَلِكِ পড়া হইয়াছে। সুতরাং الف না লিখিয়া উক্ত কেরআতের বাস্তবতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতএব, একারণেই কোরআনের লিখনে ও মুদ্রণে রসমে-খত (رسم خط) অর্থাৎ, লিখন-পদ্ধতির প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। যাহাতে একই লিখন-পদ্ধতিতে সর্ববিধ কেরআতের বাস্তবতা বুঝা যায়। কাজেই এই লিখন-পদ্ধতি পরিবর্তন করা হারাম বা নিষিদ্ধ।

বন্ধুগণ! কোরআনের সকল বিষয়েরই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ইহা মুসলমানদের একটি গৌরবের বিষয়। কেননা, তাহাদের ন্যায় দুনিয়ার কোন জাতিই আসমানী কিতাবের এত হেফাযত করে নাই। সুতরাং আলেমগণ আজ পর্যন্ত কোরআনের প্রত্যেক বিষয়ের হেফাযতের যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, আপনাদেরও তাহা করা উচিত। এইরূপ কখনও বলিবেন না যে, খোদা স্বয়ং কোরআনের নেগাহ্‌বান রহিয়াছেন, তবে আমাদের হেফাযতের কি প্রয়োজন? কেননা উহার হেফাযতের জন্য নিজের বান্দাগণকে নির্দেশ দেওয়াও উহার সংরক্ষণের অন্যতম ব্যবস্থা। তিনি আমাদের দ্বারা খেদমত গ্রহণ করিতেছেন, ইহা আমাদের প্রতি তাঁহার বিরাট পুরস্কার এবং বিশেষ অনুগ্রহ। আপনারা যদি এই হেফাযতের কাজ না করেন, তবে তিনি অন্য জাতি দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করিবেন। আপনারা একবার ছাড়িয়াই দেখুন না। 'আপনাদের টানে গাড়ী চলিতেছে না।'

॥ খেলাফতের কর্তব্য ॥

আল্লাহ্ তা'আলার তো আমাদিগকে সৃষ্টি করারও প্রয়োজন ছিল না। ইহাও তাঁহার নিছক মেহেরবানী যে, এবাদতের জন্য তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

সৃষ্টি করার পূর্বে ফেরেশ্‌তাদিগকে বলিয়াছেন ঃ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা সৃষ্টি করিতে মনস্থ করিয়াছি" ইহা তাঁহার কত বড় মেহেরবানী !

ما نبودیم و تقاضا ما نبود + لطف تو نا گفتۀ ما می شنود

"আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, তাহাতে তোমার প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু তোমার অনুগ্রহ আমাদের অব্যক্ত কথা শ্রবণ করিতেছিল।"

আমরা সৃষ্ট হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে "খলীফাতুল্লাহ্" আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তবে কি আমরা যাহা করিতেছি ইহাই খলীফার কর্তব্য ? অর্থাৎ আমরা যে, বলিতেছি ঃ খোদা স্বয়ং কোরআনের হেফাযত করিতেছেন, আমাদের আর কি দরকার ? খলীফার মুখে এমন উক্তি শোভা পায় কি ? আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করুন, এমন এক অবস্থায় তিনি আমাদিগকে খলীফা বানাইয়াছেন, যখন ফেরেশ্‌তাকুল এই পদের দায়িত্ব পালনের জন্য আকাঙ্ক্ষীরূপে বিদ্যমান ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যখন বলিয়াছিলেন ঃ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً তখনই ফেরেশ্‌তাগণ বলিয়াছিলেন ঃ আমরা থাকিতে আর মানব জাতি সৃষ্টি করার কি প্রয়োজন ? ফেরেশ্‌তাদের এই প্রশ্ন এবং ইহার বিস্তারিত উত্তর কোরআন শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। আমি এখন উহার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাই না। শুধু এতটুকু বলিতে চাই যে, "আমাদিগকে সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'আলার কোনই প্রয়োজন ছিল না ; বরং যে কাজের জন্য তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন সে কায সম্পন্ন করার জন্য তাঁহার অপর সৃষ্টি অর্থাৎ ফেরেশ্‌তা জাতি নিজেদের আনুগত্য পেশ করিতেছিল। কিন্তু আমাদের প্রতি ইহা তাঁহার অপার অনুগ্রহ যে অপর মাখ্‌লুক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদিগকেই খেলাফতের পদ দান করিয়াছেন। সেই দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে ভাবিয়া দেখুন, কোরআনের খেদমতের জন্যই বা আমাদিগকে সৃষ্টি করা তাঁহার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে ? আমরা যদি ধর্মের খেদমত না করি, তবে তিনি উহার খেদমতের জন্য অপর এক জাতি সৃষ্টি করিয়া লইবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের এই জাতীয় অবাধ্যতামূলক কল্পনার পরিষ্কার উত্তরও কোরআন শরীফে দিয়াছেন ঃ

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ *

অর্থাৎ, "তোমরা যদি ধর্মকর্মে বিমুখ থাক, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের পরিবর্তে অপর এক জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করিয়া দিবেন, অতঃপর তাহারা তোমাদের ন্যায় (নিষ্কর্মা, অলস এবং ধর্ম-কর্মে বিমুখ) হইবে না।"

।। বিপদ সঙ্কেত ।।

বন্ধুগণ! আপনাদের টানে গাড়ী চলিতেছে না। আপনারা আজ ছাড়িয়াই দেখুন না। গাড়ী পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে; তবে হাঁ। ছাড়িবা মাত্র আপনারা ভূপাতিত হইবেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই ধর্মের খেদমত এবং কোরআনের হেফাযতের জন্য এমন এক জাতি সৃষ্টি করিয়া দিবেন যাহারা আপনাদের ন্যায় হইবে না। বন্ধুগণ! আমি আপনাদিগকে সাবধান এবং সতর্ক করিয়া দিতে চাহিতেছি, সত্বর সতর্ক হউন, পাছে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুত সেই শাস্তি না আসিয়া পড়ে। কেননা, আমি উহার নানাবিধ লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি। বর্তমানে একটি ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমার চোখে ভাসিতেছে যে, মুসলমান লেখকদের লেখা হইতে কুফরীর গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে ইউরোপিয়ান লেখকদের লেখার মধ্যে ইস্‌লামের প্রশংসা প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ, কতিপয় মুসলমান যেন দিন দিন কুফরীর দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং কিছুসংখ্যক কাফের ইস্‌লামের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। অতএব, ইহা দেখিয়া আমার ভীষণ আশঙ্কা হইতেছে যে, যখন এই দুইটি বিপরীতগামী সম্প্রদায় সীমান্তে পৌঁছিবে, তখন এমন হওয়া বিচিত্র নহে যে, ঐ সব কাফের কুফরী হইতে বাহির হইয়া মুসলমান হইয়া যাইবে এবং ঐ শ্রেণীর মুসলমান ইসলাম হইতে বাহির হইয়া কাফের হইয়া যাইবে।

বন্ধুগণ! অন্যান্য জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামের সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি ঝুকাইয়া আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন, তোমরা মনে করিও না যে; ইসলাম কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের মুখাপেক্ষী; বরং তোমরাই ইস্‌লামের মুখাপেক্ষী।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ - অর্থাৎ, "যদি তোমরা ধর্মের সেবায় বিমুখ থাক, তবে তোমাদের স্থলে এমন এক জাতিকে দাঁড় করাইয়া দিব যাহারা এখন কাফের হইয়াও ইস্‌লামের প্রশংসা করিতেছে। আর তোমরা হইবে তাহাদের স্থলবর্তী।" কেননা তোমরা মুসলমান হইয়াও ইস্‌লামের অবমাননা করিতেছ। যদি তোমরা বিমুখ না থাকিয়া যথারীতি ইস্‌লামের খেদমত করিতে থাক, তবে এমতাবস্থায় তোমরাও মুসলমান থাকিবে এবং সম্ভবতঃ অন্যান্য জাতিও মুসলমান হইয়া যাইবে।

।। হেফাযতের স্বরূপ ।।

ইস্‌লামের খেদমত কিংবা কোরআনের হেফাযত যাহাকিছু আপনারা করিতেছেন তাহা শুধু নাম মাত্র। ইহাতে কেবল আপনাদের নাম হইতেছে। নচেৎ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলাই এখন পর্যন্ত কোরআনের হেফাযত করিতেছেন। আপনারা নিজেদের স্মরণশক্তির উপর কি গর্ব করিতেছেন? 'কাফিয়া' কিংবা অন্য কোন একটি

গল্প কিংবা পদ্যের কিতাব হেফ্‌য্‌ করুন ত ? তখনই আপনি নিজের স্মরণশক্তির স্বরূপ বুঝিতে পারিবেন। ইহা তো খোদা তা'আলারই মেহেরবানী যে, কোরআনের মত এমন একটি বিরাট গ্রন্থ মুখস্থ করা সহজ করিয়া দিয়াছেন যাহার ফলে নাবালেগ ছেলেরাও উহা মুখস্থ করিয়া ফেলিতেছে। অথচ কোরআনে সমসদৃশ আয়াতের সংখ্যা অনেক রহিয়াছে। একথার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ইহাই বলিতে হয় যে, শুধু আমাদের নাম প্রচার করাই আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশ্য। তিনি আমাদের নাম হাফেযে-কোরআনের তালিকাভুক্ত করিয়া আমাদেরে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন। নতুবা কোরআনের প্রকৃত সংরক্ষণকারী তিনি ভিন্ন আর কেহই নহে। জনৈক কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন :

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقاں + مصلحت را تہمتے بر آ ھوے چین بستہ اند

"মৃগ-নাভীর সুগন্ধ ছড়ান তোমারই কেশরাশির কাজ, কিন্তু প্রেমিকগণ বিশেষ যুক্তিতে চীন দেশীর মৃগের অপবাদ দিয়া থাকে।"

আল্লাহ্‌র শপথ! আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের উপর যে অনুগ্রহ করিয়াছেন উহাকে এইরূপ বলা উচিত,

کہاں میں اور کہاں یہ نکہت گل + نسیم صبح تیری مہربانی

"কোথা আমি আর কোথা এই ফুলের চাহনী।
ভোরের সুরভি বায়ু, শুধু তোমারই মেহেরবানী।"

আরেফীন অর্থাৎ আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের দৃষ্টি ইহা হইতে আরও উর্ধ্বে। তাঁহারা যখন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন, তখন তাঁহারা দিব্য চক্ষে দেখিতে পান— তাঁহারা নিজেরা উহা পড়িতেছেন না; বরং গ্রামোফোনের মত বুলি আওড়াইয়া যাইতেছেন যাহাতে অপর কাহারও কথা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বস্তুতঃ গ্রামোফোনের মধ্যে যাহা আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহাই বাজে। কিন্তু বাহ্যতঃ বুঝা যায়, যেন গ্রামোফোনই বলিতেছে। অথবা তাঁহারা তখন তূর পর্বতের বৃক্ষের মত হন বাহ্যতঃ সেই বৃক্ষই বলিতেছিল : يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ "হে মূসা! আমিই বিশ্ব-প্রভু আল্লাহ্‌।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গাছের কি সাধ্য এরূপ কথা বলিতে পারে? বরং তথায় অপর কাহারও আওয়ায ধ্বনিত হইতেছিল। গাছ শুধু উহার আবৃত্তিকারী ও বর্ণনাকারী ছিল :

چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں + کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں

"আসমান কোথা হইতে নিপীড়নের ক্ষমতা লাভ করিবে? অবশ্যই কোন মা'শুক এই পর্দার অন্তরালে লুক্কায়িত আছেন।" কোন একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোক এই বিষয়টিকে এরূপ বলিতেছেন :

در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند + آنچه استاد ازل گفت همان می گویم

"আয়নার পশ্চাতে আমাকে তোতাপাখীর ন্যায় রাখা হইয়াছে। আযলের ওস্তাদ যাহা বলেন আমি উহারই প্রতিধ্বনি করিয়া যাইতেছি।"

॥ বিদ্যা ও গুণবত্তার গৌরব ॥

আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ যখন এই সত্যকে দিব্যজ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারেন, তখন আর জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, ক্বোরআন তেলাওয়াতকালে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ হয়? ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় এরূপ অবস্থার প্রাবল্য বিশেষ একটি কারণেই হইয়া থাকে। তাহা এই যে, ক্বোরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় প্রতাপ প্রতিপত্তি ও মাহাত্ম্য পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেন। কোথাও আযাবের শাসানী দিতেছেন, কোথাও বা অভিযোগ করিতেছেন। কোন স্থানে সুসংবাদ দান করিতেছেন। কোথাও বা সান্ত্বনা দিতেছেন। কোথাও সরাসরি কথা বলিতেছেন, কোথাও বা গম্ভীর স্বরে সম্বোধন করিতেছেন। অন্যথায় শুধু ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াতের কি বিশেষত্ব আছে? মানুষের প্রত্যেকটি কার্যেই মানুষ নামে মাত্র কর্তা, নচেৎ প্রত্যেক কাজের প্রকৃত কর্তা আল্লাহ্ তা'আলাই। মানুষ নিজের জ্ঞান ও গুণবত্তার জন্য কিসের গর্ব করিতেছে যে, সে অমুক 'কামাল' হাছিল করিয়াছে, অমুক জটিল মাস্আলার সমাধান করিয়াছে? আল্লাহ্‌র শপথ! ইহার দৃষ্টান্ত ঠিক এরূপ—যেমন কেহ অপরের ক্ষেতের উপর দাবী করিয়া বলে যে, এই কৃষি আমার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করে যে, জমিনও অপরের, বীজও অপরের এবং হালের বলদও অপরের জমিনের প্রকৃত মালিকই উহাতে পানি সিঞ্চন করিয়াছে, সার দিয়াছে ও ক্ষেতের সর্ব প্রকারের তদ্‌বীর করিয়াছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকেই এই দাবীদারকে আহ্‌মক বলিবে। কেননা, সকল বস্তুই যখন অপরের, তখন কৃষি তাহার কেমন করিয়া হইতে পারে? বন্ধুগণ! কিন্তু আমরা সকলেই এই বোকামিতে নিমগ্ন রহিয়াছি। কেননা, যেই মস্তিষ্ক এবং হাত-পা দ্বারা আমরা কাজ করিতেছি, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এ সমস্ত সরঞ্জামই আল্লাহ্ তা'আলার দান। জ্ঞান, বিবেক, ইচ্ছাশক্তি, কর্মশক্তি, সমস্তই তাঁহার প্রদত্ত। এখন বলুন ত, এ সমস্ত শক্তি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে সমস্ত কার্য ও গুণবত্তা লাভ করা যাইবে তাহা আমাদের কেমন করিয়া হইবে:

نیاوردم از خانه چیزے نخست + تو دادی همه چیز من چیز تست

"আমি প্রথমতঃ বাড়ী হইতে কোন বস্তুই নিয়া আসি নাই। তুমি সমস্ত কিছুই দান করিয়াছ। অতএব, আমিও তোমারই বস্তু।"

ইহার পরেও যদি আমরা দাবী করি যে, আমরা ক্বোরআনের হেফাযত করিতেছি, তবে আশ্চর্যের বিষয়! যখন আমাদের পাঠ করা এবং মুখস্থ করা

আমাদের নহে, তখন আমরা হেফাযত করিবার কে ? বরং সেই সর্বস্রষ্টাই ইহার হেফাযতকারী যিনি আমাদের দ্বারা এই কাজ সমাধা করান এবং হেফাযতের যাবতীয় উপকরণ দান করেন। হেফাযত যে মাত্র আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতেই হইতেছে ইহা দিবালোকের মত স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে আমাদের পড়া এবং তেলাওয়াত করাও তাঁহার তরফ হইতেই হইয়া থাকে। যদি তিনি তাওফীক না দেন, তবে মুখ দিয়া একটি শব্দ উচ্চারণ করার সাধ্যও কোন ব্যক্তির নাই।

কানপুরের এক ঘটনা : এক ব্যক্তি হাই তুলিবার জন্য মুখ খুলিলে আর উহা বন্ধ করিতে পারিল না, খোলাই রহিয়া গেল। বড়ই মুশ্‌কিল উপস্থিত, খাইতেও পারিতেছে না, কথাও বলিতে পারিতেছে না। অতঃপর অতি কষ্টে কয়েক দিন পর মুখ বন্ধ হইল। কেহ বলিতে পারেন হয়ত ঔষধের গুণে মুখ বন্ধ হইয়াছে। অবশ্য মানুষের তদ্‌বীরেই হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি, ইহাতেও তদ্‌বীরের শুধু নাম মাত্রই আছে। খোদা তা'আলার মঞ্জুর না হইলে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুখ খোলাই থাকিয়া যাইত, বন্ধ হইতে পারিত না। পূর্ণ এখ্‌তিয়ার খোদার হাতে না থাকিলে, কোন কোন ক্ষেত্রে যে, সমস্ত ডাক্তার চিকিৎসকই অক্ষম হইয়া যায়, রোগী আরোগ্য লাভ করে না ; বরং যতই ঔষধ প্রয়োগ করা হয় ততই রোগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহার কারণ কি ? রোগীর অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় :

از قضا سرکنگبین صفرا فزود + روغن بادام خشکی می نمود

"অদৃষ্টের ফলে মধু (পিত্ত অপহারক হইয়াও) পিত্ত বৃদ্ধি করিতে থাকে এবং বাদাম তেল মস্তিষ্কের (শুষ্কতা দূরকারী হওয়া সত্ত্বেও) শুষ্কতা সৃষ্টি করিতে থাকে।" অর্থাৎ, প্রত্যেক তদ্‌বীরেরই উল্টা ফল হইতে থাকে। যেই ঔষধকেই অমোঘ মনে করা হয়, উহাই বিষের ক্রিয়া উৎপন্ন করে। যদি রোগ-মুক্তি চিকিৎসকের আয়ত্তে হইত তবে তাহাদের পুত্র-পরিজন পীড়াগ্রস্ত হইলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অবশ্য অবশ্য আরোগ্য লাভ করিত। কেননা, নিজের পুত্র-পরিজনের বেলায় তাঁহারা কখনও চিকিৎসার ত্রুটি করিতে পারেন না। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ব্যাপার ইহার বিপরীত। অতএব, বাধ্য হইয়া মানিতে হইবে।

درد از یارست ودرمان نیز هم + دل فدائے او شد و جان نیز هم
هرچه می گویند آن بهتر ز حسن + یار ما این دارد و آن نیز هم

"বন্ধু ব্যথাও দিয়া থাকেন আবার উহার ঔষধের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। মন আমার তাহার প্রতি উৎসর্গিত হইয়াছে ; আমার প্রাণও তদ্রূপ। তিনি যাহাকিছু বলেন তাহা রূপ-সৌন্দর্য অপেক্ষা উত্তম। আমার বন্ধু ইহারও অধিকারী উহারও অধিকারী।"

এখন আপনারা অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কোরআন শরীফ পাঠ করাও আমাদের স্বাধীন কার্য নহে, উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা তো দূরেরই কথা। অতএব,

ইহা আল্লাহ্ তা'আলার নিছক মেহেরবানী যে, কেবল আমাদের নাম প্রচার করাই তাঁহার ইচ্ছা, অন্যথায় যাবতীয় কর্মব্যবস্থা তিনি নিজেই করিয়া থাকেন। এখনও যদি আল্লাহ্‌র এমন অনুগ্রহের প্রতি আপনাদের আগ্রহ না হয়, তবে বড়ই ভাগ্য বিড়ম্বনার লক্ষণ। উপরোক্ত কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমেই আসিয়া পাড়িয়াছে। শুধু এতটুকু কথা বুঝাইবার জন্য যে, আপনাদের উপর কোরআনের হেফাযতের ভার অর্পণ করাতে আপনাদের গর্বিত হওয়ার কিছু নাই। খোদা তা'আলা আপনাদের মুখাপেক্ষী নহেন; বরং আপনারাই তাঁহার মুখাপেক্ষী। এখন আমি পুনরায় আমার মূল বক্তব্যের দিকে যাইতেছি।

॥ আখেরাতের মুদ্রা ॥

এ কথা বলা কখনও ঠিক নহে যে,অর্থ না বুঝিয়া কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলে কি লাভ ? কেননা, ইহার একটি লাভ তো এই যে, শব্দ ব্যতিরেকে অর্থের সংরক্ষণ সম্ভব নহে। অথচ অর্থ সংরক্ষণের আবশ্যকতা আপনারা স্বীকার করিতেছেন। আমার এই উত্তরটি তো বিজ্ঞান এবং বিবেক সম্মত। আজকাল বিবেক এবং যুক্তির পূজাই অধিক করা হইতেছে। এই কারণে আমার এই উত্তরটি নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যুক্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে প্রদান করিলাম। আর একটি উত্তর আছে কিতাবী। তাহা দ্বীনদার শ্রেণীর জন্য, তাঁহারা কিতাবী প্রমাণের সম্মুখে যুক্তির কোন মূল্যই দেন না। উক্ত প্রমাণটি এই যে, হুযুর(দঃ) বলিয়াছেনঃ 'কোরআনের প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে দশ নেকী পাওয়া যায়।' যে ব্যক্তি একবার الـم। শব্দটি উচ্চারণ করে, তাহার আমলনামায় তৎক্ষণাৎ ৫০ (পঞ্চাশটি) নেকী লিখিত হয়। সম্ভবতঃ বিবেকের পূজারীদের নিকট এই উত্তরটি হাল্‌কা বোধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু বন্ধুগণ ! প্রকৃতপক্ষে ইহা অতি মূল্যবান লাভ। ইহার মূল্য মৃত্যুর পরে বুঝা যাইবে, যখন আর সকল বস্তুই অকেজো বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন—যেমন, কাহারও নিকট মক্কায় প্রচলিত "হিলালী ও মজীদী" বহু মুদ্রা সঞ্চিত আছে (উহা দেখিয়া ভারতীয় কোন ব্যক্তি তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলঃ এই মুদ্রা সঞ্চয় করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ? সে ব্যক্তি উত্তরে বলিলঃ হাঁ, এখন অবশ্য কোন লাভ নাই। কিন্তু কোন এক নির্দিষ্ট দিনে ইহার মূল্য বুঝা যাইবে। অতঃপর যদি এই দুই ব্যক্তি হজ্জ করিতে যায়, তবে মক্কায় পৌঁছিয়া ব্যাপার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে। তখন মক্কায় প্রচলিত মুদ্রা সঞ্চয়কারী ব্যক্তি সঙ্গী লোকদিগকে বিদ্রূপ করিবে যাহাদের কাছে শুধু ভারতীয় তাম্রমুদ্রা ছাড়া মক্কায় প্রচলিত মুদ্রা কিছুই নাই। এখন তাহারা ঐ লোকটির নিকট লজ্জিত হইয়া পড়িবে।

বন্ধুগণ! অনুরূপভাবে আপনাদের সম্মুখে আর একটি জগৎ আসিতেছে। আজকাল আপনারা যে মুদ্রা সঞ্চয় করিতেছেন সে জগতের বাজারে ইহাদের কোনই মূল্য থাকিবে না। তথায় আপনাদের এই রৌপ্য মুদ্রারও মূল্য নাই, স্বর্ণ মুদ্রারও মূল্য নাই, এন্ট্রান্স ডিগ্রিরও মূল্য নাই, বি, এ, ডিপ্লোমারও মূল্য নাই, এল, এল, বি, বা আই, সি, এসেরও কোন মূল্য নাই। এই দুনিয়াতে যাহাকিছু নেকী অর্জন করিবেন, একমাত্র তাহাই হইবে সেই বাজারের মুদ্রা এজগতে যাহার কোনই মূল্য আপনারা দিতেছেন না।

অতএব, কোরআনের শব্দগুলি তেলাওয়াতের দ্বিতীয় লাভ এই যে, ইহা আখেরাতের বাজারের প্রয়োজনীয় মুদ্রা। কোরআনের এক একটি সূরা তেলাওয়াতের ফলে আখেরাতের জন্য অসংখ্য ভাণ্ডার সঞ্চিত হইয়া থাকে। আপনি যখন তথায় যাইয়া দেখিতে পাইবেন যে মাত্র সূরায়ে-ফাতেহা এবং কুল্‌হুয়াল্লাহু সূরা পাঠ করার ফলে এত অসংখ্য সওয়াব সঞ্চিত হইয়াছে, তখন অকস্মাৎ বলিয়া ফেলিবেন :

خود کہ یا بد ایں چنیں بازار را + کہ بیک گل می خری گلزار را

"এমন বাজার কাহার ভাগ্যে জোটে, যেখানে একটি ফুলের বিনিময়ে গোটা একটি ফুলের বাগান খরিদ করা যায়।"

কিন্তু এখন আপনারা উহার মূল্য এই কারণে বুঝিতেছেন না যে, এই বাজারে সেই আখেরাতের মুদ্রা অচল। কিন্তু আপনি মুসলমান, আখেরাত এবং কিয়ামতের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তবে এই লাভের মূল্য কেন বুঝিতেছেন না? আল্লাহুর কসম! সেখানে যাইয়া আপনারা পরিতাপ করিবেন—হায়! আমরা দিবারাত্র ভরিয়া কেন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলাম না? তাহা হইলে আজ আমরা প্রচুর মালদার হইয়া যাইতাম। আর আজকালের এই অর্থহীন ওযর-আপত্তি যাহা এখন কোরআন শিক্ষার ব্যাপারে করিতেছেন তজ্জন্য তখন পরিতাপ করিবেন।

॥ জ্ঞান প্রসূত ও স্বাভাবিক মহব্বত ॥

ধর্মপরায়ণ দ্বীনদার শ্রেণীর বিরুদ্ধেও আমার অভিযোগ আছে। তাঁহারাও কোরআন তেলাওয়াতের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন না। কেহ কেন এরূপ ওযর পেশ করিয়া থাকেন যে, আমরা অবসর পাই না। তালেবে এল্‌ম এবং মুদার্‌রেসগণ সাধারণতঃ এই ওযর পেশ করেন। কিন্তু ইহা নিছক অর্থহীন। কেননা, আমি দেখিতেছি, তাঁহারা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বহু সময় নষ্ট করিয়া থাকেন। তখন তাঁহারা কোথা হইতে অবসর পান? কিন্তু আফ্‌সুস, কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের জন্য সামান্য পরিমাণ সময় দিতে পারেন না :

"পতঙ্গ অগ্নিদগ্ধ হইয়া মরিতেছে দেখিয়া অস্থির হইতেছ। কিন্তু আমার মহব্বতে তোমারও যে দগ্ধিভূত হওয়া উচিত সে বিষয়ে কোন পরওয়া নাই।"

বন্ধুবান্ধবদের খুশী করার জন্য তো এত চেষ্টা ; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলাকে খুশী করা সম্বন্ধে কোন চেষ্টা নাই। বলুন, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আখেরাতে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি অমুক দিন অমুক বন্ধুর সহিত এক ঘণ্টাকাল আলাপ করিয়া সময় নষ্ট করিয়াছ। আমার সঙ্গে আধঘণ্টা সময়ও আলাপ করিবার অবসর পাও নাই ? তখন কি জবাব দিবেন ? সত্য উত্তর দিতে হইলে তো আপনাকে ইহাই বলিতে হইবে যে, نعوذ با لله আল্লাহ্‌র সহিত আমার মহব্বত নাই। হাঁ, যদি ইহাই আপনার বক্তব্য হয়, তবে আপনাকে আমার বলিবার কিছুই নাই,কিন্তু আপনি ইহা বলিতে পারেন না। কেননা খোদার সহিত আপনার মহব্বত আছে। কারণ, আপনি মু'মেন। আর মু'মেনের অবস্থা এই যে : وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ "যাহারা ঈমানদার আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাহাদের মহব্বত অধিক।"সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নিশ্চয়ই আপনার মহব্বত আছে এবং এত মহব্বত আছে যত মহব্বত আর কাহারও সহিত নাই।

কেহ কেহ এ কথার মধ্যে ইতস্ততঃ করিতে পারেন যে, বাহ্যিক তো আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আমাদের পুত্র-পরিজনের সাথেই আমাদের মহব্বত বেশী। কিন্তু আপনাদের এই ধারণা ঠিক নহে। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যে মহব্বত আছে তাহা স্বাভাবিক এবং সৃষ্টিগত, জ্ঞান প্রসূত মহব্বত নহে। ইতরপ্রাণীদেরও নিজ নিজ শাবক বা বাচ্চার প্রতি স্বাভাবিক মহব্বত আছে। অতএব, স্বাভাবিক মহব্বত স্থাপনে আপনারা আদিষ্টও নহেন ; বরং জ্ঞান বিবেচনার সাহায্যে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে মহব্বত স্থাপনের জন্য আপনাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে এবং প্রিয়জনের পূর্ণতা গুণের জ্ঞান ও বিবেচনা হইতেই তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কাজেই জ্ঞান প্রসূত মহব্বত আল্লাহ্ ও রাসূলের সহিত অধিক হইয়া থাকে। তাঁহাদের সমকক্ষ মহব্বত আর কাহারও সহিত হইতে পারে না। কেননা, আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক পূর্ণতা গুণের অধিকারী আর কেহ নহে। আবার আল্লাহ্ তা'আলার পরে রাসূলের চেয়ে অধিক বরং তাহার সমকক্ষও কেহ নহে। সুতরাং হুযূরের সহিতও নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত হইবে কিন্তু উহা জ্ঞান প্রসূত। চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, মুসলমানদের স্বাভাবিক মহব্বতও আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথেই অধিক। আর কাহারও স্বাভাবিক মহব্বতও এত বেশী নাই। কিন্তু কোন সাময়িক উদ্দীপকের প্রভাবেই উহা প্রকাশ পায়। একটি গল্প বলিতেছি তাহা হইতেই একথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

আমাদের অঞ্চলে মরহুম মাওলানা মুযাফ্‌ফর হোসাইন নামে এক বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি তাক্‌ওয়া পরহেযগারীতে আমাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতেন। এক সময় তিনি গাড়হীপোখতা নামক স্থানে পদার্পণ

করিলে তথাকার মাতাব্বর সাহেব তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ

وَوَلَدِهِ أَجْمَعِيْنَ *

"তোমাদের মধ্যে কেহ আল্লাহ্‌র রাসূলকে তাহার জান, মাল, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি অপেক্ষা অধিক ভাল না বাসা পর্যন্ত মু'মেন বলিয়া গণ্য হইবে না।"

কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, আমার পিতার প্রতিই আমার মহব্বত অধিক। হযরত মাওলানা তখন তাহাকে সময়োচিত একটি উত্তর প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি লোকটির এই সন্দেহকে কার্যকরীভাবে দূর করিয়া দিতে মনস্থ করিলেন, যাহাতে তাহার মন অধিকতর নিঃসংশয় হইতে পারে। অবশেষে তিনি লোকটির সন্দেহের জবাব কার্যকরী ভাবে এইরূপে দিয়াছিলেন যে, কিছুক্ষণ পরেই কথায় কথায় হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িল, বস্তুতঃ হুযূর (দঃ)-এর সম্বন্ধীয় আলোচনায় মুসলমান মাত্রই এক অনুপম আনন্দ ও স্বাদ পায়। উপস্থিত সকলেই তাহা নিতান্ত আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতে লাগিল এবং সেই মাতাব্বর সাহেবও খুব আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলেন। মাওলানা ছাহেব যখন দেখিলেন যে, মাতব্বর সাহেব হুযূর (দঃ)-এর সম্বন্ধীয় আলোচনা খুব মগ্ন হইয়া শুনিতেছেন, তখন তিনি মধ্যস্থলে হুযূর(দঃ)-এর আলোচনা বন্ধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আচ্ছা খান সাহেব, হুযূরের (দঃ) আলোচনা আপাততঃ বন্ধ করা হউক, এখন আমি আপনার পিতার গুণানুবাদ ও ফযীলত সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করিতেছি, তিনিও একজন খুব ভাল লোক ছিলেন। ইহা শুনিয়া মাতাব্বর সাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তওবা! তওবা!! হযরত রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনার মাঝখানে আমার পিতার আলোচনা কোথা হইতে টানিয়া আনিলেন? না, না, আপনি হুযূরেরই আলোচনা করুন, হুযূরের মর্যাদা ও ফযীলতের সম্মুখে আমার পিতার কি অস্তিত্ব আছে যে, মাঝখানে আপনি অযথা তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়া বসিলেন? ইহাতে আমার মনে দারুন ব্যথা লাগিয়াছে। মাওলানা ছাহেব হাসিয়া বলিলেন : কেন খান সাহেব; আপনি তো বলিতেছিলেন যে, আপনার পিতার প্রতিই আপনার মহব্বত অধিক বলিয়া মনে হয়; তবে হুযূরের আলোচনার মাঝখানে আপনার পিতার আলোচনা আসিতেই আপনার মনে ব্যথা হইল কেন? খান সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, মাওলানা ছাহেব তাঁহার প্রশ্নের কার্যকরী জবাব দিলেন। তৎক্ষণাৎ বলিলেন : "মাওলানা! جَزَاكَ اللهُ "আল্লাহ্ আপনাকে ইহার বিনিময় দান করুন।" এখন আমার সন্দেহ দূরীভূত হইয়াছে। আমি বিষয়টি পরিষ্কার বুঝিতে

পারিয়াছি। "আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ্" হুযূর (দঃ)-এর সহিত আমার এমন প্রগাঢ় মহব্বত রহিয়াছে যে, পিতার মহব্বতের সহিত উহার কোনই তুলনা হয় না।

جزاک الله که چشمم باز کردی + مرا با جان جان همراز کردی

"আল্লাহ্ আপনাকে বিনিময় দান করুন, আপনি আমার চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, আমাকে আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমের সহিত পরিচিত করিয়াছেন।"

অতএব, বন্ধুগণ! তুলনা করিলে বুঝা যায়, মুসলমান আল্লাহ্ ও রাসূলের সমান কাহাকেও ভালবাসে না। কোন উদ্দীপক বিষয় উপস্থিত হইলে তুলনা উপলব্ধি করা যায়। মনে করুন, আপনারই সম্মুখে এক ব্যক্তি আপনার পিতাকে গালি দিল, আর এক ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের শানে বে-আদবী করিল, বলুন তো এমতাবস্থায় কোন্ ব্যক্তির প্রতি আপনার ক্রোধ অধিক হইবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও রাসূলের শানে যে ব্যক্তি বে-আদবী করিয়াছে তাহার প্রতিই অধিক রাগান্বিত হইবেন এবং আপনি তখন আত্মহারা হইয়া তাহার জিহ্বা ছিঁড়িয়া ফেলার জন্য প্রস্তুত হইবেন। যখন মুসলমান মাত্রেরই এই অবস্থা যে, সে নিজের এবং মাতা-পিতার অপমান বরদাশ্‌ত করিতে পারে কিন্তু আল্লাহ্ ও রাসূলের শানে সামান্য বে-আদবীও সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকুন যে, আপনাদের স্বাভাবিক মহব্বতও আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথেই বেশী, কিন্তু তাহা আপনি কোন উদ্দীপক বিষয়ের উৎপত্তিতে বুঝিতে পারেন। আর যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আপনার মহব্বত আল্লাহ্ এবং রাসূলের সাথেই বেশী, তখন একথার কি অর্থ হইতে পারে যে, অর্থ না বুঝিয়া শুধু কোরআনের শব্দ পাঠ করিলে কি লাভ?

।। আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথোপকথন ।।

* বন্ধুগণ! কোন প্রেমিক যদি একটি অর্থহীন ভাষা রচনা করিয়া উহার সাহায্যে প্রেমিকের সহিত কথাবার্তা বলে এবং আশেক ব্যক্তি যদি সত্যিকারের আশেক হয়, তবে এই অর্থহীন ভাষাই তাহার দৃষ্টিতে মার্জিত ও বিশুদ্ধ ভাষা অপেক্ষা অধিক প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেননা, উহা প্রিয় জনের ভাষা। পক্ষান্তরে কোরআনের ভাষা তো অর্থহীনও নহে; বরং নিতান্ত মার্জিত, উচ্চাঙ্গীন, বিচিত্র, বিস্ময়কর এবং অতি মধুর ভাষা। যাহারা কোরআনের অর্থ বুঝে তাহারা তো উহার বিশুদ্ধতা, উচ্চাঙ্গীনতা ও মাধুর্য বুঝিতে পারে, কিন্তু যাহারা অর্থ বুঝে না তাহারাও কোরআন তেলাওয়াতে বা কেরআত শ্রবণে খুব সাদ পায়, যাচাই করিয়া দেখুন। আর যাহারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে অভ্যস্ত তাহারা তো ইহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন। কোন সময় কোনও সুন্দর এল্‌হানের কারী পাইলে তাঁহার একটু কেরআত শুনিয়া দেখুন—অর্থ বুঝা ব্যতীতই স্বাদ পান কি না? আল্লাহ্‌র কসম!

সময় সময় অর্থ বুঝিতে অক্ষম ব্যক্তিও এত মোহিত হইয়া পড়েন যে, প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়। সুতরাং কোরআনের অবস্থা এইরূপ মনে করুন ঃ

بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد + برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را

"প্রিয়জনের জগতময় সৌন্দর্যের বসন্তময়-প্রাণকে আমোদিত করিয়া রাখে—বাহ্য-দর্শীদিগকে মনোহর রূপ দ্বারা আর ভাবান্বেষীদিগকে মনোরম গন্ধ দ্বারা।" আবার রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর বাণী হইতে ইহাও জানিতে পারিয়াছেন যে, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা যেন আল্লাহ্ তা'আলার সহিত কথা বলা। সুতরাং বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আপনি আশেক হইয়া মা'শুকের সহিত কথা বলিতে চাহেন না, অথচ মা'শুকের সহিত একটু আলাপ করার সুযোগ সন্ধানে নানাবিধ বাহানা ও কৌশল খুঁজিয়া বেড়ানই মহব্বতের লক্ষণ।

হযরত মূসাকে আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى "হে মূসা! তোমার ডান হাতে ইহা কি?" ইহার উত্তরে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল যে, "লাঠি;" কিন্তু তাঁহার অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি মহব্বত ছিল বলিয়া তিনি এই সুযোগটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করিলেন এবং বিস্তারিত ভাবে উত্তর করিলেন ঃ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي "ইহা আমার লাঠি, ইহার উপর আমি ভর দিয়া চলি, ইহা দ্বারা আমার বক্‌রীর পালের জন্য গাছের পাতা ঝাড়িয়া লই।" কত দীর্ঘ উত্তর! প্রথমে 'هِيَ' সর্বনামটি এবং শেষেরদিকে প্রথম পুরুষের সর্বনাম 'ى' বৃদ্ধি করিয়াছেন, তদুপরি আবার লাঠির উপকারিতাও পূর্ণ দুইটি বাক্যে বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর আবার বলিয়াছেন ঃ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى "এবং ইহাতে আমার আরও অনেক কাজ হয়।" এই কথাটুকু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য এই যে, সম্মুখের দিকে যেন আরও কথা বলার সুযোগ থাকে। কেননা, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"আচ্ছা মূসা! তোমার সেই কাজগুলি কি কি? তাহাও বর্ণনা কর।" তখন তিনি আরও কথা বলার সুযোগ পাইবেন, কিংবা তিনি নিজেই আরয করিবেন, ইয়া আল্লাহ্! তখন আমি আমার কাজগুলির বিস্তৃত বিবরণ দেই নাই এখন তাহা ব্যক্ত করিতে বাসনা। মোটকথা, ভবিষ্যতে কথা আরও বাড়াইবার সুযোগ রাখিয়া দিলেন। এই কথাটি এখন আমার মনে পড়িয়াছে, ইতিপূর্বে মনে পড়ে নাই।

ফলকথা, প্রেমিকগণ প্রিয়তমের সহিত আলাপ করিতে আশ্চর্য ধরণের আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। আর এই মহামূল্য সম্পদ মুসলমানগণ ঘরে বসিয়া প্রত্যেক সময়ে লাভ করিতে পারে। যখন ইচ্ছা তাহারা আল্লাহ্ তাআলার সহিত কথাবার্তা বলিতে পারে। অর্থাৎ, কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিলেই এই অনুপম সম্পদ লাভ করা যায়, ইহা সত্ত্বেও বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, অর্থ না বুঝিয়া কোরআন শরীফ পড়াকে নিষ্ফল মনে করা হয়। এই লাভ কি কম? বন্ধুগণ! ইহা অতি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যাহাদের

অন্তরে আল্লাহ্‌র জন্য মহব্বত আছে কেবল তাঁহারাই সম্পদের মূল্য বুঝিতে পারেন। অতএব, শুধু মহব্বতের প্রয়োজন। আশেকদের অবস্থা তো এইরূপ যে, মা'শুকের নাম শুনিয়াও তাঁহারা আনন্দ অনুভব করেন। কোন কবি বলেনঃ

اَلَا فَاسْقِنِيْ خَمْرًا وَقُلْ لِيْ هِيَ الْخَمْرُ + وَلَا تَسْقِنِيْ سِرًّا مَتَى اَمْكَنَ الْجَهْرُ -

"অর্থাৎ, আমাকে শরাব পান করাও এবং মুখে বলিতে থাক, ইহা শরাব, ইহা শরাব, আর যখন প্রকাশ্যে সম্ভব হয় তখন আমাকে গোপনে শরাব পান করাইও না।" শরাবের পেয়ালা মুখের সহিত যুক্ত হওয়ার পরে আবার শরাবের নাম লওয়ার প্রয়োজন কি? ইহার রহস্য এই যে, প্রিয় বস্তুটির নাম শুনিতেও আনন্দ লাগে। কাজেই খোদার নাম শুনিয়া মুসলমানের আনন্দ না হওয়া বড়ই আশ্চর্যের বিষয়! যদি খোদার নামে মুসলমান আনন্দই পায়, তবে কোরআনের চেয়ে অধিক খোদার নাম কোন্ কিতাবে আছে? প্রায় প্রত্যেকটি আয়াতেই বার বার খোদার নাম আসিয়া থাকে, আবার স্থানে স্থানে খোদার তা'রীফ ও প্রশংসা এমন সুন্দর ভাবে করা হইয়াছে যে, ইহা অপেক্ষা অধিক সুন্দর আর কেহ করিতে পারে না। যদিও খোদার যিক্‌রের আরও পন্থা আছে, কিন্তু নামায এবং তেলাওয়াতে কোরআন অপেক্ষা অধিক ভাল কোন পন্থাই নাই। এই কথাটি হাদীস দ্বারা আরও বিস্তারিত ভাবে প্রমাণিত রহিয়াছে।

।। আলফাযে-কোরআনের প্রতি মহব্বত ।।

রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরআনের শব্দগুলিকে এত ভালবাসিতেন যে, তিনি নিজে তো তেলাওয়াত করিতেনই, তথাপি একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ)কে বলিলেনঃ "আমাকে কোরআন শুনাও।" তিনি বলিলেনঃ (اَوَ كَمَا قَالَ) اَعَلَيْكَ اَقْرَأُ وَعَلَيْكَ اُنْزِلَ ؟

"অর্থাৎ, আমি হুযূরকে কোরআন শুনাইব? অথচ কোরআন হুযূরের উপরই অবতীর্ণ হইয়াছে।" তিনি বলিলেনঃ "হাঁ, অপরের মুখে শুনিতে চাই।" ভাবিয়া দেখুন, হুযূর (দঃ) একজন ছাহাবীর নিকট এই আকাঙ্ক্ষা কেন জানাইলেন? অথচ সমগ্র কোরআনই তাঁহার হেফ্‌য ছিল এবং উহার অর্থ সহ তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। শুধু এই জন্য যে, কোরআনের শব্দগুলিকে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন এবং অপরের মুখে শুনিবার সময় একাগ্রতা আসে বলিয়া তাহাতে অতিরিক্ত স্বাদ পাওয়া যায়। সুতরাং এখন আপনারা বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কোরআনের শুধু শব্দগুলিরও উদ্দেশ্য আছে।

বন্ধুগণ! কোরআনের শব্দগুলির উপকারিতা বা লাভ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন তেলাওয়াতকারীদের প্রতি

খুব মনোযোগ প্রদান করেন এবং তাহাদের তেলাওয়াত খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি কোন প্রেমিককে কোন সংবাদদাতা আসিয়া বলিয়া দেয় যে, তোমার প্রিয়তম তোমার গান শুনিতেছে, বলুন, তখন সে কেমন আনন্দের সহিত গাহিবে এবং কেমন সুন্দর ভাবে বিনাইয়া বিনাইয়া গাহিবে! আপনাদের জন্য হুযূর (দঃ) অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ এবং অধিক সত্যবাদী সংবাদদাতা আর কে হইবে? হুযূর (দঃ)ই আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছেন যে, কোরআন পাঠকারীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা খুব মনোযোগ দেন এবং খুব মনোযোগের সহিত তাহার পাঠ শ্রবণ করেন, ইহাতেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, কোরআনের শব্দগুলিও উদ্দেশ্যযুক্ত। কেননা, পাঠ করা এবং শ্রবণ করা শব্দের সহিতই সংশ্লিষ্ট—অর্থের সহিত নহে। এই হাদীসটি হইতে ইহাও বুঝা গেল যে, কোরআন তেলাওয়াতের সময় আমাদের একথা মনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কেরআত শ্রবণ করিতেছেন। মনে এই কথাটি জাগরূক থাকিলে তাহার ফলে খুব সাবধানতা ও গুরুত্বের সহিত শুদ্ধাশুদ্ধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তেলাওয়াত করা হইবে। অবহেলার সহিত পাঠ করা হইবে না।

।। কোরআনের শব্দের প্রতি মনোযোগের প্রয়োজনীয়তা ।।

দ্বিতীয়তঃ, আচ্ছা ক্ষণিকের জন্য মানিয়াই নিলাম—অর্থই আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু একথা কখনও স্বীকার করিবেন না যে, অর্থই সকল সময়ে কাম্য এবং উদ্দেশ্য; আর কোন সময় এমনও অবশ্যই হওয়া উচিত যাহাতে শুধু শব্দই কাম্য হইবে এবং অর্থের প্রতি আদৌ লক্ষ্য থাকিবে না। যেমন, জ্যোতিষ-শাস্ত্রে নামতা মুখস্থ করা হয়, তখন কিন্তু মূল উদ্দেশ্যের প্রতি আদৌ লক্ষ্য থাকে না, শুধু শব্দগুলিই আওড়ান হয়। আর দেখুন, খাদ্য গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য হইল শক্তি সঞ্চয় করা। কিন্তু আহারের সময় কেবল মাত্র স্বাদের প্রতিই লক্ষ্য করা হয়। আকৃতির প্রতিও দৃষ্টি করা হয়—রুটি পুড়িয়া কাল বর্ণের হইল কি না, তরকারীতে লবণ মরিচ অতিরিক্ত হইল কি না। তখন কেহই একথা বলে না যে, উদ্দেশ্য তো শক্তি লাভ করা, আকৃতি এবং স্বাদের প্রতি লক্ষ্য করা নিরর্থক। দুঃখের বিষয়, পার্থিব বিষয়-সমূহে তো আকৃতি এবং স্বাদের প্রতি লক্ষ্য থাকে, অথচ কোরআন সম্বন্ধে এই বিষয়গুলি নিষ্ফল মনে করা হয়। বড়ই আশ্চর্যের কথা! বস্তুতঃ কোরআন শরীফ তেলাওয়াতকালে অর্থের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই তেলাওয়াতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। কেননা, এই মাত্র যে বলা হইল—কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের সময় নিজেকে শুধু পাঠক মনে করিবে; আল্লাহ্ পাক বক্তা মনে করিবে এবং নিজেকে তূর পর্বতের বৃক্ষের ন্যায় অনুকরণ ও প্রতিধ্বনিকারী মনে করিবে। এই ধ্যান শুধু শব্দের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া সম্ভব হইতে পারে।

অর্থের মধ্যে মনোনিবেশ করিলে এই ধ্যান করা যাইতে পারে না। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করিয়া দেখুন। এইরূপে তেলাওয়াতের সময় এই ধ্যানও করিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের তেলাওয়াত শ্রবণ করিতেছেন। ইহাও শব্দের প্রতি মনোযোগ প্রদানের দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, তাহা ব্যতীত সম্ভব নহে। সুতরাং অর্থ না বুঝিয়া শব্দ তেলাওয়াত করা বিফল কেমন করিয়া হইল ?

বন্ধুগণ! সমুদ্রের পানির উপরিভাগ ভ্রমণ করিলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, উহার তলদেশে ভ্রমণ করিলে সে আনন্দ পাওয়া যায় না। যদিও তলদেশে ভ্রমণ করিলে মণিমুক্তা পাওয়া যায় যাহা উপরিভাগে পাওয়া যায় না। তাই বলিয়া কেহ কি একথা বলিতে পারে যে, সমুদ্র-ভ্রমণে কোন লাভ নাই। কখনও না। ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহারা বলেন, সমুদ্র-ভ্রমণ বিশেষ আনন্দদায়ক। উহাতে মন প্রফুল্ল ও মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা হয়। আরও বলেন, ইহাতে মনে আনন্দ উৎপন্ন হয় এবং চোখের দৃষ্টি সতেজ হয় ও জ্যোতি বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসকগণ এই কারণেই যক্ষ্মারোগীকে সমুদ্রে ভ্রমণের নির্দেশ দিয়া থাকেন যেন রোগীর মন প্রফুল্ল হয় এবং মনের প্রফুল্লতা হইতে স্বভাব (তবীয়ত) শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই শক্তি পরিশেষে রোগকে দমন করিয়া দেয়। অতএব, ইহা কেমন কথা—সমুদ্রের উপরিভাগে ভ্রমণকে নিষ্ফল মনে করা হয় না, অথচ কোরআনের উপরিভাগে বিচরণ করা বৃথা মনে করা হয়! কত বড় যুল্‌ম!

॥ শব্দ ও অর্থের আনন্দ ॥

এতদ্ভিন্ন সমস্ত এবাদতেরই আসল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্ তা,আলার নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহ্ আ'আলার তরফ হইতে প্রথম কোরআনের শব্দগুলিই আসিয়াছে এবং অর্থ আসিয়াছে উহার অধীন হইয়া। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলার সহিত শব্দের নৈকট্যই অধিক। কোরআনের এই শব্দগুলি অর্থহীন হইলেও খোদার প্রেমিকদের জন্য ইহাই যথেষ্ট ছিল। কেননা, প্রিয়তমের তরফ হইতে প্রেমিককে কোন বস্তু প্রদান করা হইলে তথায় দুই প্রকারের আনন্দ পাওয়া যায়। (১) প্রিয়তমের হাত হইতে পাওয়ার আনন্দ, (২) আর সেই বস্তুটি ভোগ করার আনন্দ। বলা বাহুল্য, প্রেমিকের মন আনন্দে নাচিয়া উঠার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, ইহা প্রিয়তমের হাত হইতে লাভ করিয়াছে। এই কারণেই সময় সময় দেখা যায়, প্রিয়তমের নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তু খরচ করে না; বরং তাহার স্মৃতিচিহ্ন মনে করিয়া প্রসাদ স্বরূপ সযত্নে রাখিয়া দেয়। একবার হুযুর (দঃ) জনৈক ছাহাবীকে তাঁহার হিস্যার চেয়ে একটি "কীরাত" অধিক দান করিলেন। ছাহাবী উক্ত কীরাতটি খরচ না করিয়া হুযুরের পবিত্র হস্তের মনে করিয়া 'তবর্‌রুক' স্বরূপ সর্বদা নিজের নিকটে রাখিতেন। সুতরাং খোদা-প্রেমিকদের পক্ষে তো কোরআনের অর্থের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া শুধু উহার শব্দগুলিই আনন্দে নৃত্য করার

জন্য যথেষ্ট। কেননা, খোদার তরফ হইতে আমরা সরাসরি শব্দগুলিই প্রথম লাভ করিয়াছি। অবশ্য অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে তেলাওয়াতে দ্বিবিধ আনন্দ একত্রিত হয়। কাজেই অর্থের আনন্দ উপভোগের জন্য শব্দের আনন্দও পরিহার করিতে হইবে, ইহা কেমন কথা? বরং উভয় প্রকার আনন্দই লক্ষ্যণীয়। উভয়বিধ আনন্দের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন কারণে অগ্রাধিকার লাভের উপযোগী। আল্লাহ তা'আলার দরবার হইতে প্রথমে প্রাপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ তেলাওয়াতের আনন্দ অধিক লক্ষ্যণীয়। যদিও উদ্দেশ্যের দিক দিয়া অর্থই মুখ্য এবং শব্দ গৌণ। সুতরাং উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বোধের আনন্দই অধিক লক্ষ্যণীয়। ফলকথা, কারণ বিশেষে আল্লাহ তা'আলার দরবারে শব্দের নৈকট্য অধিক এবং অপর কারণে অর্থের নৈকট্য অধিক। কোনটিই কোনটির অভাব পূরণ করিতে পারে না। বিষয়টি খুলিয়া বলিলাম, পাছে কোরআনের হাফেযগণ এই ভাবিয়া খুশী না হন যে, তাঁহারা শব্দের হাফেয এবং শব্দগুলি আল্লাহ্র দরবারে অধিক নিকটবর্তী; সুতরাং তাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ। একতরফা ফয়ছালা করিয়া খুশী না হন। আমি একতরফা ফয়ছালা করিয়া ডিক্রী দিব না; বরং উভয় পক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ফয়ছালা করিতেছি যে, কারণ বিশেষে শব্দ পক্ষ উত্তম এবং অপর কারণে অর্থপক্ষ উত্তম। বস্তুতঃ কোরআনের উভয় দিকই গুরুত্ব প্রদানের যোগ্য—বাহিরের রূপও এবং অন্তর্নিহিত অর্থও। কেননা, প্রত্যেক বস্তুরই বাহির এবং ভিতর উভয়ই আকর্ষণীয়। বাহিরের রূপকে কেহ কখনও অকর্মণ্য বলিতে পারে না।

।। শব্দের গুরুত্ব ।।

'কাল্পি' নামক স্থানের মিশ্রী' এতদ্দেশীয় চিনির মিষ্টিরই সমকক্ষ, কিন্তু বাহ্যিক আকার এবং পরিচ্ছন্নতার কারণে লোকে কাল্পি হইতে মিশ্রী আনাইয়া থাকে। কেননা, বাহ্যাকৃতি সুন্দর দেখাইলে খাইতে খাদ্যবস্তুতে চমৎকার স্বাদ পাওয়া যায়।

এইরূপে পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যেও দুইটি দিক আছে। বাহিরের সৌন্দর্য এবং ভিতরগত উদ্দেশ্য। ভিতরগত উদ্দেশ্য হইতেছে সতর ঢাকা এবং শীত গ্রীষ্ম হইতে রক্ষা পাওয়া। এই উদ্দেশ্য সর্ববিধ কাপড় দ্বারাই সমভাবে সফল হইয়া থাকে। আর বাহিরের সৌন্দর্য হইতেছে উহার মসৃণতা, কমনীয়তা এবং ডিজাইন প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, বাহিরের এসমস্ত বিষয় নিষ্ফল বা নিরর্থক নহে; বরং ইহার জন্যও বিশেষ চেষ্টা করা হয়।

আরও দেখুন, স্ত্রীলোকের ভিতর-বাহির দুইটি দিক আছে। আভ্যন্তরীণ দিকটি হইল সহবাস এবং গৃহকর্ম নির্বাহ করা। এই উদ্দেশ্যের জন্য প্রত্যেক সুস্থজ্ঞান ও বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকই যথেষ্ট। আর বাহিরের দিক হইল দেহের রং উজ্জ্বল হওয়া, মুখাবয়ব ও দেহের গঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হওয়া এবং উচ্চ বংশ সম্ভূত হওয়া। বাহিরের

এ সমস্ত বিষয় যদি উদ্দেশ্যবিহীন হয়, তবে এক্ষেত্রে বাহিরের রূপের জন্য প্রাণ দিতেছেন কেন ? ইহার জন্য সমুদ্র মন্থন করা হইতেছে কেন ?

এইরূপে ঔষধের মধ্যেও একই গুণবিশিষ্ট বহু দ্রব্য রহিয়াছে। কিন্তু বিশেষ আকৃতির কারণে উহাদের মধ্যে কোন কোনটিকে গ্রহণ করা হয়। কেননা, ঔষধাবলীর মধ্যে কোন কোনটি বাহ্যিক আকৃতির বিশেষত্বের কারণে ক্রিয়া করিয়া থাকে। যেমন, চুম্বক পদার্থ হৃদকম্প রোগে উপকারী। অতএব, এই শ্রেণীর ঔষধগুলি জাতিগত আকৃতির কারণে ক্রিয়া করে। এইরূপ ক্ষেত্রে আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করা হয়।

অনুরূপ ভাবে একই অর্থবোধক বহু শব্দ আছে, কিন্তু আকৃতির কারণে উহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হইয়া থাকে। কাজেই উপাধি এবং আদবের ক্ষেত্রে কোন কোন শব্দ নিজের বিশেষ আকৃতির কারণে উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে একই অর্থবোধক অপর শব্দ প্রয়োগ করাকে বিশেষ বোকামি মনে করা হয়। যেমন পিতার প্রতি কেহ 'বরখোরদার' ও 'নূরেচশ্‌ম' প্রভৃতি জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করিলে পাগল আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইবে, অথচ ইহাদের অর্থ খারাপ কিছুই নহে। কেননা, 'বরখোরদার' শব্দের অর্থ চিরজীবি হও। অর্থাৎ, জীবিত থাকিয়া দুনিয়ার ফল ভোগ করিতে থাকুন ; কিংবা ভাগ্যবান হউন। আর "'নূরেচশ্‌ম' শব্দের অর্থ চক্ষুর জ্যোতি"। পিতা তো প্রকৃতপক্ষে চোখ এবং কানের উছিলা। চোখের এই জ্যোতি সন্তানেরা পিতা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছে, কাজেই শব্দ দুইটি পিতার প্রতি প্রয়োগ করিলে অর্থ তো খারাপ হয় না ; কিন্তু শব্দের বাহ্যিক আকার দেখিলে লিখককে বোকা এবং পাগল সাব্যস্ত করা হয়। এখন বুঝা গেল, অর্থই সর্বদা উদ্দেশ্য এবং শব্দ কখনও উদ্দেশ্য নহে, এরূপ বলা ভুল।

আরও শুনুন, মানুষের এক আছে বাহ্যিক আকৃতি, আর আছে আভ্যন্তরীণ অবস্থা ; ইহা হইল মানুষের রূহ্। এই মানবাত্মার দ্বারাই মানুষ এবং কুকুর, গাধা প্রভৃতি পশুর প্রভেদ রহিয়াছে। যদি এই দাবী মানিয়া লওয়া হয় যে, বাহ্যিক আকৃতি নিরর্থক, তবে এরূপ দাবীদারের উচিত নিজের সন্তানদিগকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা। কেননা, এই দেহ তো শুধু বাহ্যিক আকার, ইহার কি প্রয়োজন ? বরং উদ্দেশ্য তো হইল অভ্যন্তর, অর্থাৎ আত্মা। তাহা গলা টিপিয়া মারার পরেও বিদ্যমান থাকে। মৃত্যুর ফলে আত্মা কখনও ধ্বংস হয় না। ইহা কি কোন জ্ঞানী লোক স্বীকার করিবেন ? কখনও না।

অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, অর্থের ন্যায় শব্দগুলিও উদ্দেশ্যযুক্ত, তবে শুধু কোরআনের বেলাই কেন এই নূতন আইন জারী করা হইতেছে যে, অর্থ ভিন্ন শব্দ বেকার ? আল্‌হামদুলিল্লাহ্, আমি বিভিন্ন উপায়ে এই মাস্‌আলাটি প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, অর্থ না বুঝিয়াও কোরআনের শব্দগুলি উদ্দেশ্যযুক্ত। উহা পাঠ করা

ও তেলাওয়াত করা কখনই অনর্থক নহে। সুতরাং "অর্থ না বুঝিয়া কোরআন পাঠ করিলে কি লাভ ?" কথাটি সম্পূর্ণ বাতিল এবং ভিত্তিহীন বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

॥ "মতনবিহীন" কোরআনের উর্দু তরজমা ॥

এই উদ্ভট খেয়ালের লোকেরা কোরআনের 'মতনবিহীন' শুধু উর্দু তরজমার আকারে এক কোরআন প্রকাশ করিয়াছে। খুব মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন, ইত্যাকার কোরআনের তরজমা খরিদ করা হারাম এবং নাজায়েয। কেননা, ইহারা কোরআনের শব্দগুলিকে বেকার মনে করে বলিয়াই এই ধরণের তরজমা আবিষ্কার করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উহার প্রধান অপকারিতা এই যে, এই আকারে মতনবিহীন তরজমা প্রকাশিত হইতে থাকিলে, কালক্রমে মূল কোরআন বিলুপ্ত হইয়া মুসলমানদের নিকটও কেবল ইহার তরজমাই থাকিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। যেমন, আজকাল পৃথিবীতে ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিকট তওরাত ও ইঞ্জিলের কেবল তরজমা অবশিষ্ট আছে, মূল কিতাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তরজমার মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল খুশী অনুযায়ী পরিবর্তন পরিবর্ধন করিবার সুযোগ পাইবে। পক্ষান্তরে তরজমার সহিত মূল কোরআনের 'মতন' থাকিলে কাহারও বিকৃতিকরণ চলিবে না। কেননা, তদবস্থায় প্রত্যেকেই মতনের সহিত তরজমা মিলাইয়া দেখিলে উহার শুদ্ধতা ও অশুদ্ধতা যাচাই করিয়া দেখিতে পারিবে।

॥ উর্দুতে নামায ॥

এই উদ্ভট খেয়ালের কিছু লোক তখন নামাযের মধ্যে কোরআনের উর্দু তরজমা পড়িতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের দলিল ইহাই ছিল যে, কোরআন না বুঝিয়া পড়ায় কি লাভ ? ইহার কয়েকটি যৌক্তিক ও কিতাবী উত্তর আমি ইতিপূর্বে প্রদান করিয়াছি। আর একটি উত্তর স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেব দিয়াছেন যাহা এলাহাবাদের মাওলানা মোহাম্মদ হোসাইন সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন। সেই জবাবটি এ সমস্ত উদ্ভট খেয়ালের লোকদের জন্য অধিক ফলপ্রদ হইবে। কেননা, সেই জবাবটি তাঁহাদেরই একজন লোক কর্তৃক প্রদত্ত এবং তাহাদের রুচিসম্মত হইবে। উক্ত জবাবের সারমর্ম এই যে, কোরআন মজীদের গুণসমষ্টির মধ্যে কতক গুণ শব্দের এবং কতক গুণ অর্থের। অর্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে কোরআনের ভাবার্থ জানা যাইবে। আর শব্দের গুণ এই যে, তাহাতে এই মহান বাণীর মহিমাময় বক্তার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও প্রতাপ মনে উপস্থিত হইবে। এই গুণ শুধু কোরআনের শব্দগুলিরই আছে। অপর কোন ভাষায় উহার তরজমা যত মার্জিত ও উচ্চাঙ্গের ভাষায়ই হউক না কেন—উহার মধ্যে এই বিশেষ গুণ কখনই হইতে পারে না। আর এবাদতের উদ্দেশ্য হইল—মা'বুদের

শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব অন্তরে উৎপন্ন করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে মনের সেই মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা। কোরআনের কেচ্ছা-কাহিনী ও ঘটনাবলী মনে উপস্থিত করা নহে।" অতএব, যাহারা নামাযে কোরআনের উর্দু তরজমা পাঠ করিবে তাহাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের উৎপত্তি তেমনটি হইবে না, কোরআনের শব্দ পাঠকারীদের হৃদয়ে যেমনটি হইবে। কেননা, উর্দু তরজমা পাঠকারীরা নামাযে এমন একটি ভাষা পাঠ করিবে যাহা মানুষের সৃষ্ট। উহা অবশ্যই মূল কালামে এলাহীর সমকক্ষ, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বসম্পন্ন হইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন তাহাদের অন্তরে নামাযের মধ্যে একাগ্রতাও জন্মিবে না। কেননা, একাগ্রতা সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব মনে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তরজমার দ্বারা সেই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের উপস্থিতি কখনই হইবে না যাহা কোরআনের শব্দ পাঠে হইয়া থাকে। মোটকথা, মহব্বত এবং প্রেমের হিসাবেও যৌক্তিক এবং কিতাবী প্রমাণেও সামাজিকতা এবং শাসন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও কোরআনের শব্দগুলির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া প্রমাণিত হইল। সুতরাং মুসলমানদের পক্ষে কোরআনের শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলকভাবে কোরআন তেলাওয়াতের বন্দোবস্ত করা উচিত।

।। বিশুদ্ধভাবে কোরআন পাঠের গুরুত্ব ।।

যখন কোরআনের শব্দগুলি উদ্দেশ্যযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল, তখন উহাদিগকে শুদ্ধ করিয়া পড়ার ব্যবস্থা করাও একান্ত আবশ্যক। কেননা, কোরআনের শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া না পড়া পর্যন্ত উহাকে আরবী ভাষা বলা যাইবে না। শব্দগুলির উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া লওয়ার পর যদি আরবী সুর এবং স্বর-ভঙ্গিও শিখিয়া লওয়া হয় তবে তো "আলোর উপর আরও আলো।" যেমন আজকাল ইংরেজী ভাষায় অধিক পারদর্শী তাঁহাকেই গণ্য করা হয় যাঁহার উচ্চারণ ও স্বর-ভঙ্গী ইংরেজদের অনুরূপ হয়, সেই কারণে ইংরেজী উচ্চারণ ও স্বর-ভঙ্গী শিক্ষা করার জন্য এত প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় যে, কেহ কেহ নিজেদের ছেলেপেলেকে মেমদের দ্বারাই প্রতিপালনের ব্যবস্থা করে। যাহাতে ইংরেজী উচ্চারণ ও স্বর-ভঙ্গি শিশুদের শৈশবকাল হইতেই স্বভাব সিদ্ধ হইয়া উঠে। অথচ স্বর-ভঙ্গী বা উচ্চারণ-ভঙ্গীর উপর ডিগ্রী লাভ করা নির্ভরশীল নহে এবং সার্টিফিকেট ইহা ছাড়াও পাওয়া যাইতে পারে। শুধু কথা বলার সুন্দর ভঙ্গী এবং অধিক প্রশংসা গুণানুবাদ লাভের জন্য এ বিষয়ে চেষ্টা করা হয়। তবে ধর্মীয় ব্যাপারে ইহাকে অনর্থক কেন মনে করা হয়?

কোন কোন লেখাপড়া জানা লোকের কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়া যাই। তাঁহারা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতে সুর ও স্বর-ভঙ্গীর বিরোধিতা করেন এবং উহাকে অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীন বলিয়া থাকেন। অথচ ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, প্রত্যেক

ভাষারই একটি নিজস্ব সুর বা স্বর-ভঙ্গী রহিয়াছে। ফারসী ভাষার উচ্চারণ-ভঙ্গী একরূপ, ইংরেজী ভাষার উচ্চারণ-ভঙ্গী অন্যরূপ এবং উর্দু ভাষার আর একরূপ। প্রত্যেক ভাষায় সেই নিজস্ব সুর বা উচ্চারণ-ভঙ্গীর কদর আছে। অতএব, আরবী ভাষায় সুর ও স্বর-ভঙ্গীর কদর না হওয়া আশ্চর্যের বিষয়! বরঞ্চ এক্ষেত্রে উহাকে অনর্থক বলা হয়। আরবী ভাষার প্রতি মহব্বতের অভাব বলিয়াই এই ধরণের উক্তি করা হয়। মহব্বত থাকিলে কোরআনেও আরবী সুর এবং স্বর-ভঙ্গীর শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করা হইত এবং উহা শিক্ষা করার জন্য চেষ্টাও করা হইত। হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কোরআন শরীফ যে সুরে পাঠ করিতেন আমাদেরও সেই সুরেই পড়া উচিত। কেহ আবার এরূপ প্রশ্ন করেন যে, কোন্ প্রমাণ দ্বারা 'তাজবীদে'র প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়? এ প্রশ্নের উত্তর ফেকাহ্ এবং হাদীসের কিতাবেই রহিয়াছে। উহাতে উল্লেখ আছে যে, প্রত্যেকটি হরফকে স্ব স্ব মাখ্‌রাজ বা উৎপত্তি স্থল হইতে উচ্চারণ করা ওয়াজেব। শব্দগুলির 'ছেফাত' অর্থাৎ অবস্থা এবং উচ্চারণ-ভঙ্গী শিক্ষা করা মুস্তাহাব।

এই মাখ্‌রাজ, ছেফাত ও লাহ্‌জাহ তাজ্‌বীদেরই আলোচ্য বিষয়। অতএব, কোরআন শুদ্ধ করিয়া পড়ার জন্য তাজ্‌বীদ অপরিহার্য। কিন্তু আমি এক নূতন উপায়ে এই প্রশ্নের জবাব দিতেছি। "আমাদের উর্দু ভাষায় جھاڑو শব্দের মধ্যে 'ھ' অক্ষরটি ج জীম অক্ষরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চারিত হইয়া 'ঝাড়ু' বলা হয়। কেহ যদি অক্ষরটিতে যবর দিয়া প্রকাশ করিয়া 'জাহাড়ু' পড়ে, তবে তাহাকে বেওকুফ বানাইয়া দিবে, বলিবে, এ ব্যক্তি হিন্দুস্তানী নহে; বরং বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়। এরূপ 'ینگھا' 'زنگ' 'سنگ' 'گنگا' প্রভৃতি শব্দের ں অক্ষরকে অস্পষ্ট পড়া হয়। যদি কেহ ں অক্ষরকে স্পষ্ট করিয়া 'ین گھا' 'گ ن گا' 'س ن گ' এবং 'ز ن گ' পড়ে, সকলেই তাহাকে বলিবে, "আহ্মক ভুল পড়ে।"

এইরূপে আরবী ভাষায় কোন কোন শব্দের বিশেষ উচ্চারণভঙ্গী আছে। যেমন ں ک ں। শব্দে نون অস্পষ্ট পড়িতে হয়। এখানে نون কে স্পষ্ট করিয়া পড়িলে ভুল হইবে। কিন্তু মানুষ এদিকে মনোনিবেশ করে না; বরং ইহাকে মামুলী বিষয় মনে করে। আমি দৃঢ় কণ্ঠে বলিতেছি—শরীয়ত অনুযায়ী কেরাআতের এলম একান্ত জরুরী। সুতরাং ইহাকে বিশ্বাসের দিক হইতে ওয়াজেবই মনে করিতে হইবে। অতঃপর যাহার ইচ্ছা হয় আমলও করিবে। আমল না করিলে শুধু গুনাহ্‌গারই হইবে। বিশ্বাস এবং আকীদা তো নিরাপদ থাকিবে; কিন্তু ইহার অর্থ এমন নহে যে, তাজ্‌বীদের সহিত পড়িতে না পরিলে কোরআন শরীফের শিক্ষাই ত্যাগ করিবে? না, বরং কারী না পাওয়া গেলে প্রথমতঃ তাজ্‌বীদ ছাড়াই পড়িয়া লও। অতঃপর কারী পাওয়া গেলে হরফগুলির উচ্চারণও শুদ্ধ করিয়া লইও।

॥ পার্থিব এবং অপার্থিব অকৃতকার্যতার ফল ॥

এতদ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলে : বুড়া তোতা এখন আর কি পড়িবে ? আমি বলি,আজই যদি গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়া দেয় যে, যে ব্যক্তি আইন গ্রন্থ মুখস্থ করিবে তাহাকে ১০০'০০ কিংবা ১০০০'০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। তবে এসমস্ত তোতা পোতা (নাতি) হইয়া যাইবে এবং আইন মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় খোদার দরবারের পুরস্কারের কোনই কদর নাই, অথচ খোদার দরবারে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলেও ইহলোক অপেক্ষা অধিক পুরস্কার পাওয়া যায়। ইহলোকে তো অকৃতকার্যতার কোনই পুরস্কার নাই। কেহ যদি সরকারী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, তবে তাহার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হইয়া যায়। কিন্তু খোদার দরবারের রীতি তাহা নহে ; বরং তথাকার রীতি এই—যে ব্যক্তি চেষ্টায় লাগিয়া যায়, তাহার কৃতকার্যতা সুনিশ্চিত। বাহ্যিক দৃষ্টিতে চেষ্টা কোন ফলবান হউক বা না হউক।

মনে করুন, আপনি কোরআন শুদ্ধ করিয়া পড়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া কোন বিচক্ষণ কারী ছাহেবের নিকট হরফ মশ্‌ক্ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদি হরফগুলি ঠিকমত আদায় করা শিখিতে পারিলেন, তবে তো আপনার কৃতকার্যতা সুস্পষ্ট। আর যদি শুদ্ধ করিয়া পড়া শিখিতে না-ই পারিলেন এবং কারী ছাহেব বলিয়া দিলেন, তোমার দ্বারা শুদ্ধ উচ্চারণ হওয়ার আশা নাই,তোমার জিহ্বা ঠিক হইবে না। এমতাবস্থায় বাহ্যতঃ আপনি অকৃতকার্য হইলেন বটে ; কিন্তু খোদার দরবারে আপনি কৃতকার্য বলিয়া গণ্য হইবেন এবং ছহীহ্ তেলাওয়াতকারীদিগকে যে সওয়াব প্রদান করা হইবে, আপনিও সেই সওয়াবই প্রাপ্ত হইবেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে :

اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِىْ يَتَتَعْتَعُ بِهٖ
وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ فَلَهٗ اَجْرَانِ (اَوْكَمَا قَالَ)

"অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কোরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী সে তো ফেরেশ্‌তাদের সাথে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি বাধিয়া বাধিয়া তেলাওয়াত করে এবং কোরআন তেলাওয়াত তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, তাহার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রহিয়াছে। কেননা, সে তেলাওয়াতও করিতেছে এবং চেষ্টাও করিতেছে।" সে তেলাওয়াতের সওয়াবও পৃথক প্রাপ্ত হইবে এবং চেষ্টা ও পরিশ্রমের সওয়াব পৃথক পাইবে। সোব্‌-হানাল্লাহ্! কেমন বিনিময় প্রদানকারী আল্লাহ্! কিন্তু কেহ গ্রহণকারী আছে কি ? মাওলানা রূমী এরূপ বিফলকাম লোকদের কথাই বলিতেছেন :

بس زبون وسوسه باشی دلا + گر طرب را باز دانی از بلا
گر مرادت را مزاق شکر هست + بے مرادی نے مراد دلبر ست

"যে পর্যন্ত তুমি কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার পার্থক্য নিরুপণের মধ্যে লিপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি নাফ্‌সের প্রতারণায় পরাভূত থাকিবে; বরং এই পথের আসল উদ্দেশ্য চেষ্টা ও অন্বেষণ। অতঃপর যদি বাহ্যিক কৃতকার্যতাও লাভ হইয়া যায়, তবে নাফ্‌সের উদ্দেশ্যও সফল হইল। আর যদি যথাকর্তব্য চেষ্টা এবং কামনার পরেও বাহ্যিক সফলতা লাভ হইল না, তবে আল্লাহ্‌ পাকের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে, তিনি চেষ্টা এবং কামনাই চান।"

॥ আত্ম সমর্পণ ও অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা ॥

বিস্ময়ের বিষয়, আপনারা নিজেদের উদ্দেশ্যকে আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশ্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া থাকেন। ফলকথা, আপনাদের উচিত—পরিণাম ফল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করিয়া অন্বেষণে লাগিয়া থাকা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা যে ফলই দান করেন তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা। তাহা আপনার কামনার অনুকূলেই হউক কিংবা প্রতিকূলেই হউক। এখানে তো প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা দেখুন আমরা তাঁহার অন্বেষণে মশ্‌গুল রহিয়াছি এবং এই উদ্দেশ্য কৃতকার্য হইলেও সফল হয় অকৃতকার্য হইলেও সফল হয়।

কানপুরের মাওলানা গোলাম রাসূল ছাহেব যাঁহার উপাধি ছিল "রাসূল নুমা।" কেননা, তাঁহার কারামত এই ছিল যে, তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে জাগ্রত অবস্থায় হুযুরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যেয়ারত করাইয়া দিতেন। তাঁহারই একটি ঘটনা। তিনি যখন বাইয়াৎ হওয়ার জন্য পীরের দরবারে গমন করেন, তখন পীর ছাহেব তাঁহাকে প্রথমতঃ 'এস্তেখারা' করিতে এবং পরে আসিতে বলিলেন। তিনি তথা হইতে উঠিয়া অল্পক্ষণ নিকটবর্তী মসজিদে বসিয়া শীঘ্রই আবার পীর ছাহেবের সম্মুখে হাযির হইলেন। পীর ছাহেব বলিলেন: "এস্তেখারা করিয়াছ?" তিনি বলিলেন: "জী, হাঁ করিয়াছি।" বলিলেন: তুমি তো খুব তাড়াতাড়ি আসিয়া পড়িয়াছ 'এস্তেখারা' কেমন করিয়া করিলে?" মাওলানা বলিলেন: আমি নাফ্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কেন বাইয়াৎ হইতে ইচ্ছা করিতেছ?" সে উত্তর করিল: "আল্লাহ্‌ তা'আলাকে পাওয়া যাইবে।" আমি বলিলাম: বাইআৎ হওয়ার পর তোমার জান মালের উপর তোমার কোন অধিকার থাকিবে না; বরং পীর যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে।" নাফ্‌স্‌ উত্তর করিল: "কোন পরওয়া নাই, তাহাই করিব। খোদাকে তো পাইব?" আমি বলিলাম: "যদি খোদাকে না পাও, তবে কেমন হইবে?" নাফস্‌ জবাব দিল: "নাইবা পাওয়া গেল, আল্লাহ্‌ তা'আলা তো জানিতে পারিবেন যে, আমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়াছিলাম। ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট:

"আমার চন্দ্রানন প্রাণ-প্রতিম যদি জানিতে পারেন যে, আমিও তাঁহার এক জন খরিদ্দার ইহাই আমার জন্য যথেষ্ট" খরিদ করিতে নাই বা পারিলাম।" শেখ ছাহেব বলিলেন : তোমার 'এস্তেখারা' সকলের এস্তেখারার উর্ধ্বে, আস বাইআৎ হও। তুমি ইন্‌শা আল্লাহ্ অকৃতকার্য হইবে না।

বন্ধুগণ! অন্বেষণকারী বা প্রার্থী তাহাকেই বলা যায় যিনি শুধু প্রার্থীর তালিকাভুক্ত হইতে পারাকেই যথেষ্ট মনে করেন। ইহারই নাম সত্যিকারের অন্বেষণ, যাঁহার অন্বেষণ এই শ্রেণীর, তিনি আল্লাহ্র মরযীতে কৃতকার্যই হইয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল মানুষের মধ্যে সেই অন্বেষণ নাই।

উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি : একজন উন্নত পর্যায়ের আলেম যেকের এবং রিয়াযতের উদ্দেশ্যে আমার শরণাপন্ন হন। এক দিন তাঁহার চিঠি পাইলাম। লিখিয়াছেন, আমি বহু পরিশ্রম করিয়াছি, এখন পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্য সফল হইল না। অতএব, আপনি আমাকে বলিয়া দিন, এই উদ্দেশ্য সফল করার যোগ্যতা আমার মধ্যে আছে কি না। যোগ্যতা থাকিলে আমি আরও পরিশ্রম করিতে থাকি, অন্যথায় আমি দুনিয়ার সুখ-শান্তি কেন পরিত্যাগ করিব? অন্য একটা কিছু করি।" আমি তাঁহাকে উত্তর দিলাম : "আপনার চিঠি বড়ই বে-আদবীপূর্ণ। ইহাতে বুঝা যায়, আপনার অন্তরে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব এবং অন্বেষণ মোটেই নাই। আপনি এমন কথা লিখিয়াছেন, যাহা কোন বেশ্যা প্রেমিকও বেশ্যাকে বলিতে পারে না যে, "তোমার সঙ্গে মিলনের আশা থাকিলে আমি তোমার মনস্তুষ্টি ও প্রেমকামনায় পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে থাকি, অন্যথায় আমাকে জানাও, আমি তোমার প্রেম পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাজে লাগিয়া যাই।" যদি আপনারই ন্যায় কোন একজন প্রেমের দাবীদার কোন বেশ্যাকে এরূপ কথা বলে, তবে ভাবিয়া দেখুন তো সে কি উত্তর দিবে? নিশ্চয়ই সে উত্তর দিবে : নির্বোধ কোথাকার, আমার প্রেম-খেলা জুড়িতে আমি কোন্ দিন তোমাকে খোশামোদ করিয়াছিলাম যে, আজ আমি তোমাকে উহার শেষ ফল সম্বন্ধে জানাইব এবং তোমাকে মিলন দানের ওয়াদা করিব? যদি তুমি প্রেমের জ্বালা সহ্য করিতেই না পার, তবে প্রেমিক হওয়ার দাবীই কেন করিয়াছিলে? যাও নিজের কাজ কর।" মাওলানা, আপনার হৃদয়ে এখন পর্যন্ত সত্যিকারের অন্বেষণই উৎপন্ন হয় নাই। আপনি উদ্দিষ্ট এবং কাম্যবস্তু কিরূপে লাভ করিবেন? সত্যিকারের কামনা এবং অন্বেষণ অন্তরের সহিত এমন ভাবে মিশ্রিত হইয়া যায় যে, কেহ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিলেও বিচ্ছিন্ন হয় না। আশেক ব্যক্তি নিজেও সেই কামনাকে অন্তর হইতে দুর করিতে ইচ্ছা করিলে সক্ষম হয় না।

কবি বলেন :

عذل العواذل حول قلبي التائه + وهوى الاحبة منه في سودائه

‘নিন্দাকারীদের নিন্দা আমার উদভ্রান্ত হৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে, কিন্তু প্রিয়জনের প্রতি আমার প্রেম অন্তরের গভীর কন্দরে অবস্থিত রহিয়াছে।”

আপনি যদি পার্থিব সুখ-শান্তি লাভের জন্য খোদা-প্রাপ্তির কামনা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন, তবে নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, আপনার অন্তরে খোদার অন্বেষণ মোটেই নাই ; বরং আছে শুধু নাম মাত্র অন্বেষণ। ‘এশ্‌ক্‌’ এমন একটি বস্তু যে, যদি আশেক নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে—এশ্‌কের জ্বালায় তাহার প্রাণ বিনষ্ট হইবে এবং মিলন লাভের পূর্বেই সে মরিয়া যাইবে, তথাপি সে এশ্‌ক ত্যাগ করিতে পারে না ; বরং এরূপ বলিবে ঃ

گر نه شاید بدوست راه بردن + شرط عشق ست در طلب مردن

“বন্ধুর সহিত মিলিত হওয়ার যদিও সম্ভাবনা নাই, তথাপি মনে রাখিতে হইবে, বন্ধুর অন্বেষণে মৃত্যু বরণ করা এশ্‌কের শর্ত বা চুক্তি।”

প্রেমিক কখনও মৃত্যুকে ভয় করে না ; বরং তাহার এতটুকু আকাঙ্ক্ষা থাকে যে, প্রিয়তমের প্রেমে তাহার প্রাণ বিসর্জন দেওয়া প্রিয়তম যেন দেখিতে পায়। যাহার ফলে সে তখন প্রিয়তমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে ঃ

بجرم عشق توام می کشند و غوغا ئیست + تو نیز بر سر بام آکه خوش تما شا ئیست

“তোমার এশ্‌কের অপরাধে জনতা আমাকে ধরিয়া টানা হেঁচ্‌ড়া করিতেছে, বেশ হট্টগোল বাধিয়াছে। তুমিও একটু ছাদের উপর আসিয়া দাঁড়াও এবং তামাশা দেখ, কি সুন্দর তামাশা।”

আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিতেছি, প্রিয়তমের চক্ষুর সম্মুখে তাহারই মহব্বতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া আশেকের পক্ষে বিরাট সফলতার বিষয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদিগকে এবং আমাদের মহব্বৎকে দেখিতেছেন এবং অবহিত আছেন, ইহা সুনিশ্চিত। তবে মানুষ ইহাকে নিজেদের সফলতা মনে করে না, ইহার কারণ কি ?

আমার উত্তর পাইয়াই উক্ত মাওলানা ছাহেব আবার লিখিলেন, এখন তো আমাকে পরিষ্কার ভাষাই বলিতে হইতেছে ; অনুমতি পাইলে পরিষ্কার ভাষায় লিখিতে পারি।” উত্তরে বলিলাম, আমি অনুমতি দিতে পারি না। কেননা, আমার মনে হয়, আপনি একজন দুরভিসন্ধির লোক। জানি না, মনোভাব পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করিতে গিয়া কি মর্মান্তিক কথা না লিখিয়া বসেন। আপনার সেই অস্পষ্ট উক্তিতেই আমার হৃদয়ে এমন আঘাত দিয়াছে, যাহার যন্ত্রণা আমিই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছি। জানি না, পরিষ্কার ভাবে বিস্তারিত লিখিলে কি অবস্থা দাঁড়াইবে, আমাকে ক্ষমা করুন, অপর কোন পীরের আশ্রয় গ্রহণ করুন যিনি প্রথম দিনেই আপনাকে এরূপ সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারেন যে, “তুমি অবশ্যই কৃতকার্য হইবে”। আমার

এখানে যাহারা খোদার অন্বেষণে এরূপ শর্ত লাগায় তাহাদিগকে কানে ধরিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃত খোদা-প্রেমিক লোকের অবস্থা এরূপ হওয়া উচিত :

نا خوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

"তোমার দুর্ব্যবহারও আমার অন্তরে আনন্দ ও সুধা বর্ষণ করে। আমার প্রাণ হৃদয়ে ব্যথা প্রদানকারী বন্ধুর জন্য উৎসর্গিত।"

খোদার সহিত খোদা-প্রেমিকের এতটুকু সম্পর্কও কি থাকা উচিত নহে—যতটুকু সম্পর্ক মাতা ও সন্তানের মধ্যে রহিয়াছে? কোন কোন সময় মাতা সন্তানকে মারিয়াও থাকেন, ধাক্কাও দিয়া থাকেন, কিন্তু মা যতই সন্তানকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিতে চান, সন্তান ততই মাকে আরও জোরে জড়াইয়া ধরে এবং মাকে ছাড়ে না। আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতে পারি, যাহারা সত্যিকারের খোদা-প্রেমিক তাহাদিগকে যদি সেদিক হইতে ধাক্কা মারিয়া ফিরাইয়াও দেয় এবং সে নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারে যে, তাহার সফলতা লাভ হইবে না এবং দোযখই তাহার বাসস্থান হইবে, তথাপি সে খোদার অন্বেষণ ত্যাগ করিবে না। প্রভুকে খুশী করার চেষ্টায় লাগিয়া থাকাই গোলামের কর্তব্য। আমি কসম করিয়া বলিতেছি, খোদা-প্রেমিক এবং খোদা-প্রার্থীর কৃতকার্যতাও অন্যান্য পদার্থের অধশেক এবং প্রার্থীর কৃতকার্যতা হইতে সহস্র গুণে উত্তম, যাহাকে তাহারা নিজেদের ধারণানুযায়ী সফলতা মনে করিতেছে, খোদা-প্রেমিকদের বর্তমান অবস্থাকে যদি অকৃতকার্যতা বলিয়া ধারিয়াও লওয়া হয়, কিন্তু তথাকার প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সত্যিকারের খোদা-প্রেমিক এবং খোদা-প্রার্থী কখনও অকৃতকার্য থাকিতে পারে না। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না।

॥ আরাম-প্রিয়তার পরিণাম ॥

কারণ, দুনিয়ার প্রকৃত সফলতা সুখ-শান্তিকেই বলা হয়। সফলতার যাবতীয় আসবাব উপকরণ উহার জন্যই অবলম্বন ও সংগ্রহ করা হয়। বস্তুতঃ ইহা খোদা-প্রেমিকদের নিকটই সর্বাপেক্ষা অধিক। কেননা, অন্তরের ভাবাগোনাই যাবতীয় অস্থির-তার মূল কারণ। অর্থাৎ "আমি কামনা করিয়াছিলাম একটি, হইয়া গেল আর একটি।" কিন্তু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ ঐরূপ ভাবাগোনাকে অন্তর হইতে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের এই পার্থিব কামনা ধারাবাহিকতাকে এক ভাব-বিভোর সাধু পুরুষের লেংটির ঘটনার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। উক্ত সাধু পুরুষ উলঙ্গ থাকিতেন। তাঁহার ভক্তবৃন্দ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল : "হুযূর অন্ততঃ একখানি লেংটি পরিধান করুন। শেষ পর্যন্ত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে লেংটি পরিলেন। কিন্তু আহারের সময় উহাতে দুধ এবং তরকারীর রস পড়িতে লাগিল। কেননা, কোন কোন ভাব-বিভোর লোকের আহারের নিয়ম-কানুনের বালাই থাকে না। তাঁহারা এমন ভাবে আহার করেন

যে, বুকের ও হাতের উপর বহু খাদ্যদ্রব্য ঝরিয়া পড়িতে থাকে। এইরূপে লেংটির উপর যখন দুধ ও তরকারীর রস পড়িতে লাগিল, তখন ইঁদুর আসিয়া লেংটি কাটিয়া সাধুকে বিরক্ত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভক্তেরা ইঁদুর বিতাড়নের জন্য বিড়াল পালন করিল। এখন বিড়াল নিজের স্বভাব অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যের পাতিল ভাঙ্গিতে লাগিল। সুতরাং রাত্রে পাকশালায় থাকিয়া খাদ্যদ্রব্য পাহারা দিবার জন্য একজন মানুষ নিযুক্ত করা হইল। প্রহরী লোকটি এখানে ভাল ভাল পুষ্টিকর খাদ্য খাইয়া বিবাহের প্রয়োজন বোধ করিলে তাহাকে বিবাহ করাইয়া দেওয়া হইল। ফলে তাহার সন্তান-সন্ততিও জন্মিল। একদা সাধু তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বহু লোক তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে দেখিয়া ভক্তবৃন্দের নিকট উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা সম্পূর্ণ ব্যাপারটি তাঁহার নিকট বিস্তারিত ভাবে ব্যক্ত করিল। সাধু বুঝিলেন, এই সমস্ত ঝামেলা একমাত্র সেই লেংটির কারণেই বটে। তৎক্ষণাৎ সে লেংটি খুলিয়া ফেলিয়া দিল এবং বলিল, যাও, আমি মূলই কাটিয়া দিলাম। সামান্য একটুখানি লেংটির জন্য এত সাজ সরঞ্জাম? এইরূপে পার্থিব ভাবনা-চিন্তা সেই সাধুর লেংটির মতই বটে। ইহার শাখা হইতে প্রশাখা বাহির হইয়া চলে এবং চিন্তা ও ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। এই কারণে আল্লাহ্ওয়ালাগণ ভাবনা-চিন্তাকেই নিজেদের অন্তর হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

॥ আল্লাহ্ওয়ালাগণের শান্তির রহস্য ॥

তবে আল্লাহ্ওয়ালাগণ দোআ এবং প্রার্থনা করেন কেন? এরূপ সন্দেহ করা যায় না। কেননা, দোআ আল্লাহ্ওয়ালাগণও করেন এবং দুনিয়াদারগণও করিয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ কারণে আল্লাহ্ওয়ালাগণের দোআ দুনিয়াদারগণের দোআ হইতে পৃথক। সেই বিশেষ কারণটি এমন একটি বস্তু যাহার দ্বারা তাঁহারা বুযুর্গ হইয়াছেন, আর উহার অভাবে তোমরা বুযুর্গ হইতে পার নাই। যদিও বাহ্য দৃষ্টিতে দেখা যায়, তোমরা তাহাদের চেয়ে অধিক মস্তক রগড়াইতেছ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বিনয় ও অনুনয়ের সহিত প্রার্থনা করিতেছ, তথাপি তাহাদের দোআর সহিত তোমাদের দোআর কোন সামঞ্জস্য নাই। এই মর্মেই কবি বলিতেছেন:

شاهد آں نیست که موے ومیان دارد + بندۂ طلعت آں باش که آنے دارد

"সুবিন্যস্ত কেশরাশি এবং সূক্ষ্ম কোমর থাকিলেই সে সুন্দরী নহে। এমন মহাপুরুষের সাক্ষাৎ ও সংসর্গ লাভ করিতে হইবে যিনি একটি বিশেষ মুহূর্তের অধিকারী।" কবি আরও বলেন:

نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند + نه هرکه آئینه دارد سکندری داند

هزار نکتۂ باریک تر ز مو این جاست + نه هرکه سر بتراشد قلندری داند

"চেহারা দুরুস্তকারী প্রত্যেকেই প্রাণাকর্ষণ জানে না। প্রত্যেক আয়নাধারীই সেকান্দরের ন্যায় হেকমত জানে না। এই খোদা-প্রেমের ক্ষেত্রে কেশ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সহস্র সহস্র সূক্ষ্মতত্ত্ব রহিয়াছে। মাথা মুড়াইলেই দরবেশী হাছিল হয় না।"

সেই বিশেষ মুহূর্তটি এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালারা যখন দোআ করেন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে সবই চাহিয়া থাকেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট থাকেন। দোআ কবূল না হইলেও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি ঠিক তেমনই সন্তুষ্ট থাকেন, দোআ করার পূর্বে যেমনটি ছিলেন। তাঁহারা শুধু আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালনার্থে নিজেদের গোলামী প্রকাশের উদ্দেশ্যে দোআ করিয়া থাকেন, শুধু তাঁহাদের কাম্য বস্তু পাওয়ার জন্য দোআ করেন না; বরং সকল অবস্থাতেই তাঁহারা খোদার সন্তুষ্টির প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব, ভাবিয়া দেখুন, যাঁহাদের অবস্থা এইরূপ তাঁহাদের সমান শান্তি কে লাভ করিতে পারে? আল্লাহ্‌র কসম করিয়া বলিতে পারি, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ যে শান্তি ভোগ করিতেছেন রাজা-বাদশাহ্‌রা উহার গন্ধও পায় না। আবার তাঁহারা যখন নির্জনে ও একাগ্রচিত্তে আল্লাহ্ তা'আলার ধ্যানে নিমগ্ন হন, তখনকার শান্তির কথা আর কি বলিবেন, একমাত্র আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের অন্তরই সেই অনুপম শান্তির পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারেন। তাঁহাদের বিভিন্ন অবস্থার উক্তিসমূহ হইতে উক্ত শান্তির সন্ধান কিঞ্চিন্মাত্র পাওয়া যায়। যেমন, আরেফ শীরাযী বলেন:

گدا ئے میکدہام لیک وقت مستی بین + کہ ناز بر فلک و حکم بر ستارہ کنم

"আমি শরাবখানার ভিখারী, কিন্তু আমার মত্ততার সময়টুকুর প্রতি লক্ষ্য করুন, তখন আসমানের কোন পরওয়া রাখি না এবং নক্ষত্রসমূহের প্রতি হুকুম চালাই।" তিনি আরও বলেন:

بفراغ دل زمانے نظرے بماہ روئے + بہ ازاں کہ چتر شاہی ہمہ روز ہاؤ ہوئے

"রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়া সারাদিন রাজদরবারের হট্টগোলের মধ্যে বসিয়া থাকা অপেক্ষা প্রশান্ত মনে মুহূর্তকাল চন্দ্রানন-প্রিয়তমের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বহু গুণে উত্তম।" এই তো ছিল তাহাদের মানসিক শান্তির অবস্থা:

।। শাসক শ্রেণী এবং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সম্মানের পার্থক্য ।।

তাঁহাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাইবেন, আল্লাহ্‌ওয়ালাদের সম্মান দুনিয়াদার শাসক শ্রেণীর অন্তরেও বিদ্যমান, অথচ দুনিয়াদারগণ তাহাদের দরবারে খোশামোদ করিতে থাকেন। এই দেখুন না, কিছুকাল পূর্বে ভারতের লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর মাওলানা ফযলুর রহমান ছাহেবের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসিয়া উপস্থিত, ইহা সম্মান নহে তো আর কি? হাতীর পীঠে আরোহণ করাকেই সম্মান

বলে ? আরও দেখুন, মানুষ মুক্ত প্রাণে মহব্বতের সহিত আল্লাহ্‌ওয়ালাগণকে সম্মান করিয়া থাকে। আর দুনিয়াদার শাসক শ্রেণীর সম্মান করে—সংকুচিত মনে ও ক্ষতির ভয়ে। ওলিআল্লাহ্‌গণ জঙ্গলে যাইয়া আস্তানা করিলেও সেখানেই মানুষের সমাবেশ হইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে দুনিয়াদার শাসক গোষ্টির কেহ নিজের পদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তাহার কোনই মর্যাদা থাকে না। এমন কি, পদে বহাল থাকিয়া কোন সময় পদের পোশাক পরিবর্তনপূর্বক সাধারণ বেশে বাহির হইলে কেহ তাহাকে সালামও করে না। কাজেই বুঝিতে পারেন লোকে যে তাহাদিগকে মাথা নত করিয়া সালাম করে, এই সালাম প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোট-প্যান্টের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। বিশ্বাস না হয় তাহারা কোট-প্যান্ট ছাড়িয়া সাধারণ পোশাকে বাহির হইয়া দেখুক না, কয়জন লোক তাহাদিগকে সালাম করে। আর এদিকে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের অবস্থা এই যে, যে পোশাকে এবং যেই ধরণেই তাঁহারা থাকুন না কেন—মানুষ তাঁহাদিগকে সম্মান করে। কেননা, সত্যিকারের সম্মান ও শ্রদ্ধা পোশাকের কারণে নহে ; বরং সেই আভ্যন্তরীণ সম্পদের কারণে—যাহার নূর তাঁহাদের ললাটে দীপ্তিমান থাকে এবং প্রত্যেকে তাহা দেখিতে পায় :

نور حق ظاهر بود اندر ولی + نیک بین باشی اگر اهل دلی

"আল্লাহ্‌র নূর ওলিয়াল্লাগণের মধ্যে জাজ্জল্যমান রহিয়াছে। যদি তুমি স্বচ্ছ অন্তঃকরণের অধিকারী হও, তবে ভালরূপে দেখিয়া লও।" কোন উর্দু কবি বলিয়াছেন-

مرد حقانی کی پیشانی کا نور + کب چھپا رهتا هے پیش ذی شعور

"আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের ললাটের নূর জ্ঞানবান লোকের নিকট কখনও গুপ্ত থাকে না।"

সুতরাং কৃতকার্যতা যাহাকে বলা হয়—অর্থাৎ সম্মান ও শান্তি, তাহা খোদা-প্রেমিকদের চেয়ে অধিক কেহই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু এই পার্থিব সম্মান ও শান্তি তাঁহারা কখনও কামনা করে না তথাপি তাঁহাদিগকে প্রদান করা হয়। তাঁহারা নিজদিগকে বিলুপ্ত করিতে থাকেন আর আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে সজীব করিতে থাকেন। অতএব অবস্থা এই দাঁড়ায় :

کشتگان خنجر تسلیم را + هر زمان از غیب جان دیگر ست

"আত্ম সমর্পণের তরবারিতে যাঁহারা নিহত হন, প্রতি মুহূর্তে গায়েব হইতে তাঁহারা নূতন নূতন জীবন লাভ করিয়া থাকেন।"

বন্ধুগণ ! রাজা বাদশাহ্‌দের নাম চিহ্ন পর্যন্ত আজ দুনিয়া হইতে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের নাম আজও জীবিত আছে। মানুষের মনে তাঁহাদের স্মৃতি স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখুন, খাজা আজমীরী রহমতুল্লাহে আলাইহের নাম সকলের নিকট কেমন সুপরিচিত ; সকলের হৃদয়ে তাঁহার সম্মান ও মহত্ত্ব কেমন

সজীব। হযরত শায়খ আবদুল কুদ্দুস গঙ্গোহী রাহেমাহুল্লাহর শত শত গ্রন্থিযুক্ত পুরাতন জুব্বা আজও মানুষের পক্ষে পবিত্র এবং তাবাররুকরূপে বিবেচিত হইতেছে, অথচ বাদশাহ্‌দের রত্ন খচিত মহামূল্য মুকুটও আজ নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে একটু কথা জানাইয়া দেওয়া উচিত মনে করি। হযরত শায়খ্‌ আবদুল কুদ্দুস গাঙ্গোহী ছাহেবের জুব্বায় শত শত গ্রন্থি থাকার কারণ এই যে, তিনি গ্রন্থি লাগাইয়া এই জুব্বাটিকে বহু বৎসর যাবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যেই স্থানেই ছিঁড়িত কখনও এক বর্ণের কখনও অন্য বর্ণের অর্থাৎ যখন যাহা সামনে পাইতেন তাহা দ্বারাই তালি লাগাইতেন। কিন্তু আজকাল দরবেশদের জুব্বায় উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিভিন্ন রংয়ের তালি লাগান হয়। ইহার উদ্দেশ্য কেবল সৌন্দর্য বর্ধন এবং নাম অর্জন ছাড়া আর কিছুই নহে।

একটি উদাহরণ দেখুন—কানপুরের এক দরবেশ সাহেব একটি জুব্বা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যাহার সিলাই শেষ করিতে প্রায় দুই বৎসর লাগিয়াছিল। তদুপরি সেই দুরাচার বিভিন্ন বর্ণের মূল্যবান কাপড় দ্বারা রং বেরংয়ের তালি লাগাইয়াছিল। তাহাও আবার শহরের বিভিন্ন দরযীদের নিকট হইতে চাহিয়া আনা হইয়াছিল যাহার অধিকাংশই ছিল তাহাদের চুরির কাপড়। সুতরাং ইহা রিয়াকারীর জুব্বা, ভিক্ষাবৃত্তির জুব্বা এবং চুরির জুব্বা। হাফেয রাহেমাহুল্লাহ্‌র নিম্ন লিখিত বয়েতটি ঠিক ইহার উপরই প্রয়োগ করা যাইতে পারে :

نقد صوفی نه همه صافی و بیغش باشد + اے بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

"সকল ছুফির টাকা-পয়সা নির্মল এবং নিখুঁত হয় না। তাহাদের অনেকের জুব্বাই দোযখের অনিবার্য কারণ বটে।"

মধ্যস্থলে প্রসঙ্গক্রমে এই কথাটি আসিয়া পড়িয়াছে। আমি বলিতেছিলাম, দুনিয়ার মান মর্যাদাও আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের সমান কাহারও ভাগ্যে জুটে না। দুনিয়াতে তাঁহাদের সম্মান জীবিত অবস্থায় তো আছেই মৃত্যুর পরেও স্থায়ী থাকে।

॥ আওলিয়াদের প্রতি সম্মানের নিয়ম ॥

এই স্থায়ী থাকার উদাহরণ একজন ইংরেজের মুখে শ্রবণ করুন। জনৈক ইংরেজ পরিব্রাজক ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়াছেন : "আমি ভারতবর্ষে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখিলাম। আজমীর নামক স্থানে একজন মৃত ব্যক্তি কবরে থাকিয়া সমগ্র ভারতের উপর রাজত্ব করিতেছেন। চতুর্দিক হইতে দলে দলে লোক আসিতেছে এবং সম্মান ও আদবের সহিত হাত বাঁধিয়া অবনত মস্তকে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে। যাহারা তথায় উপস্থিত হয় নাই তাহাদের অন্তরেও উক্ত সমাহিত ব্যক্তির সম্মান এবং শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান। কিন্তু ইহা হইতে কবরের সম্মুখে অবনত মস্তকে

দাঁড়ান এবং কবরের উপর নানাবিধ বেদআৎ অনুষ্ঠান জায়েয হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে না। এসমস্ত কাজ হারাম, আমি বার বার বলিয়াছি এখনও বলিতেছি কবরকে চুম্বন করা, কবরের সম্মুখে মাথা নত করা একেবারে হারাম। কিন্তু দেখিবার বিষয় এই যে, দুনিয়ার লোকের অন্তরে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বিরাজ করিতেছে তাহা হইতেই এই চুম্বন এবং অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হওয়ার উৎপত্তি। যদিও তাহা এক বিগর্হিত প্রণালীতে প্রকাশ পাইতেছে। রাজা বাদ্‌শাহ্‌দের কবর-স্থানে বহু বৎসরেও এক আধবার কেহ যায় না।

এইরূপে এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধের কারণেই ওলিআল্লাহ্‌গণের মাযারকে খুব জাঁক-জমক পূর্ণ পাকা এমারতরূপে নির্মাণ করা হয়। এক্ষেত্রেও সেই শ্রেষ্ঠত্ব বোধই ইহার উৎস। কিন্তু তাহাও গর্হিত ধরণে প্রকাশ পাইয়াছে। কেননা, এই ধরণে ওলিআল্লাহ্‌-গণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বা তা'যীম করা শরীয়ত অনুযায়ী হারাম। মাযার পাকা করার মধ্যে আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সীমাবদ্ধ নহে। পাকা কবরে তাঁহাদের মর্যাদা একটুও বৃদ্ধি পায় না। তাঁহারা পাকা কবরে যেরূপ সম্মানিত ও বুযুর্গ কাঁচা কবরেও তাঁহারা ঠিক তদ্রূপই থাকেন; বরং সুন্নত অনুযায়ী হওয়ার কারণে কাঁচা কবরেই অধিক নূর বর্ষিত হয়। হযরত শায়খ বখ্‌তিয়ার কাকী রাহে-মাহুল্লাহ্‌র কাঁচা কবরের সম্মুখে দাঁড়াইলে যে আকস্মিক ভীতির সঞ্চার হয় রাজা বাদশাহ্‌দের পাকা এমারততুল্য কবরের নিকট দাঁড়াইলে উহার কিছুই অনুভূত হয় না। কাহারও দিব্য চক্ষু থাকিলে তিনি দেখিতে পাইবেন—কাঁচা কবরে যে নূর বিরাজমান তাহা পাকা কবরের মধ্যে কোথায়? আর সেই দিব্য চক্ষু না থাকিলে তিনি এই দলিল দ্বারাই বুঝিয়া লইতে পারেন যে, প্রথমতঃ নূরের সম্পর্ক সুন্নতের সাথে। আর এ সমস্ত পাকা মাযার আমীর ওমারা এবং রাজা বাদশাহদের নির্মিত। কোন আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের নির্মিত নহে। বলা বাহুল্য, আমীর ওমারাহ ও দুনিয়াদার রাজা বাদশাহ্‌দের নির্মিত মাযারে নূর কোথা হইতে আসিবে? পক্ষান্তরে ওলিআল্লাহ্‌-গণ তো নিজেদের দেহের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। তাঁহাদের মাথায় কবর পাকা ও জাঁকজমক পূর্ণ করার কল্পনা কোথা হইতে আসিবে? অতএব, ইহা সুনিশ্চিত, এই প্রথা কোন বুযুর্গ লোকের আবিষ্কৃত নহে; বরং দুনিয়াদার রাজা বাদশাহগণই এই প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকেই এই জাতীয় বৃথা কাজ-কর্মের কল্পনা গজায়। যে সমস্ত রাজা বাদশাহ্‌ ও আমীর ওমারা পাকা দুনিয়াদার, ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না, তাহাদের মস্তিষ্কে অন্য ধরনের ফাসেকী ও শরীয়ত বিগর্হিত প্রথা প্রবর্তনের কল্পনা আসে। আর যে সমস্ত রাজা বাদশাহ্‌ ধর্মের সহিত যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্ক এবং ধার্মিক লোকদের সঙ্গে মহব্বৎ রাখেন, শরীয়ত বিধান সম্বন্ধে অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহাদের মাযার পাকা করা এবং ধর্মীয় আবরণে নানাবিধ বেদআতী প্রথা প্রবর্তনের কল্পনা গজায়।

কোন একজন বড় লোক হযরত মাওলানা গঙ্গুহী রাহেমাহুল্লাহুর জন্য একটি অতি মূল্যবান, সুদর্শন ও জাঁক-জমক পূর্ণ চর্মের চোগা আনয়ন করিয়া বলিলঃ "হুযূর ইহা পরিধান করুন।" হযরত মাওলানা উহা এক নবাব সাহেবকে দিয়া বলিলেনঃ "নবাব সাহেব! আপনি ইহা পরিধান করুন। আপনার অন্যান্য পোশাকের সহিত ইহা খুব ভাল মানাইবে। কেননা, আপনার অন্যান্য পোশাকও সম্ভবতঃ ইহার মতই মূল্যবান। আমার মোটা সোটা সূতী কাপড়ের উপর এই মূল্যবান পোশাক লাগাইলে কেমন দেখাইবে! এতদ্ভিন্ন কাটপোকা হইতে ইহার হেফাযত কে করিবে? আমার এত অবসর নাই। বৃথা ইহাকে রাখিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিব।" ফলকথা, আল্লাহ্-ওয়ালাগণ যখন নিজেদের দেহের জন্যই এসমস্ত ঝামেলা পছন্দ করেন না, কাজেই কবরের জন্য এসমস্ত অনাবশ্যক আবিল্য নিশ্চয়ই পছন্দ করিবেন না।

।। এখ্লাছের মর্যাদা ও মূল্য ।।

কিন্তু দুনিয়াদারগণ যে সমস্ত মহা পুরুষদিগকে নিজেদের মাপকাঠিতে ওজন করিয়া থাকে এবং মনে করে, সাধারণ হাদিয়া দিলে পীর ছাহেব সন্তুষ্ট হইবেন না, কোন মূল্যবান ও জাঁকাল হাদীয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি সত্য বলিতেছি, আল্লাহ্ওয়ালাগণের দরবারে তোমাদের মূল্যবান দ্রব্যসমূহের কোনই মূল্য নাই। তাঁহাদের দরবারে শুধু খালেছ ও খাঁটি নিয়তের মূল্য দেওয়া হয়। খাঁটি মহব্বতের সহিত এক পয়সা মূল্যের কোন জিনিস লইয়া গেলেও তাঁহারা মাথার উপর রাখিবেন। খাঁটী নিয়ত ভিন্ন হাজার টাকা মূল্যের জিনিস লইয়া গেলেও তাঁহাদের দৃষ্টিতে উহার কোনই মূল্য নাই।

উদাহরণ স্বরূপ এক বুযুর্গ লোকের কাহিনী শ্রবণ করুন। তিনি অপর একজন বুযুর্গ লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে মনস্থ করিলেন, হাতে পয়সা ছিল না বলিয়া খালি হাতেই যাত্রা করিলেন। কোন হাদিয়া সঙ্গে নিলেন না। কিন্তু আজকাল একটা রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, হাদিয়া সঙ্গে লইতে না পারিলে বুযুর্গ লোকের সাক্ষাতই করা হয় না! ইহা মহব্বতের স্বল্পতারই পরিচায়ক। যাহা হউক, খুব মহব্বতের কারণে পথি মধ্যে তাঁহার মন বলিলঃ "বুযুর্গের জন্য কিছু না কিছু একটা হাদিয়া সঙ্গে লওয়া উচিত।" আবার মনে মনে বলিলেনঃ আর কিছু না হউক, অন্ততঃ জঙ্গল হইতে কিছু লাকড়ি সংগ্রহ করিয়া লওয়া উচিত। শায়খের হাম্মামখানার পানি গরম করার কাজে আসিবে।" এই মনে করিয়া অবশেষে তিনি এক বোঝা লাকড়িই সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইলেন। শায়খের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেনঃ ইহা হুযূরের জন্য হাদিয়া। হুযূরের হাম্মামখানার পানি গরম করার জন্য পথের এক জঙ্গল হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছি। কেননা, মন বলিল, কিছু হাদিয়া সঙ্গে লওয়া উচিত।

শায়খ্ চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন: "এই হাদিয়া নিতান্ত খাঁটি নিয়তের। এই লাক্‌ড়িগুলি সযত্নে রাখিয়া দাও। আমার এন্তেকালের পরে ইহা দ্বারা পানি গরম করিয়া আমাকে যেন গোসল দেওয়া হয়। হয়ত ইহার বরকতে আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করিতে পারেন।

দেখুন, বাহিরে দেখা যায়, হাদিয়া খুবই সাধারণ বস্তু। কিন্তু খাঁটি নিয়তের কারণে উক্ত শায়খ ইহার কেমন কদর করিলেন। একেবারে তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কালীন গোসলের জন্য যত্নের সহিত রাখিয়া দিলেন। আশা, উহার বরকতে তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা লাভ করিবেন। ইহা হইতে আপনারা আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের রুচি অনুমান করিতে পারেন। অতএব, তাঁহাদিগকে নিজেদের মত ধারণা করিবেন না যে, তাঁহারাও এ সমস্ত আজেবাজে বস্তুতে সন্তুষ্ট হইবেন যাহাতে আপনারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

।। কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য ।।

এসমস্ত পাকা মাযার আল্লাহ্‌ওয়ালাগণের রুচির সম্পূর্ণ বিপরীত। তদুপরি ইহা কবরের রীতি-পদ্ধতিরও বিপরীত। কেননা, কবর যিয়ারতের যেই উদ্দেশ্য— পাকা পোখ্‌তা কবর যিয়ারতে তাহা সফল হয় না, হইতে পারে না। মৃত্যুর কথা মনে উদিত হওয়া এবং দুনিয়ার ধ্বংস ও প্রলয়ের ছবি চোখের সম্মুখে উপস্থিত হওয়াই কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য, তাহা কাঁচা এবং ভাঙ্গা কবরসমূহের যিয়ারতেই সফল হইতে পারে। ভাঙ্গা ও পুরাতন কবর দেখিলে মনে উহার ছায়াপাত হইয়া মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। এসমস্ত রাজকীয় জাঁক-জমকের কবর দেখিয়া মৃত্যুর কথা মনে পড়ে না। দুনিয়ার ধ্বংস এবং প্রলয়ের ছবিও দৃষ্টির সম্মুখে আসে না।

কেহ যদি বলেন যে, "পাকা জাঁক-জমকপূর্ণ কবর যিয়ারত করিলে তথায় সমাহিত বুযুর্গ লোকদের প্রতি মহব্বত এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধ ত মনে জাগরিত হয়।" তবে আমি বলিব, ইহা তাযিয়াওলাদের মহব্বত। মুহররম মাসে 'তাযিয়া' নির্মাণ করিয়া 'মারসিয়াহ্' (অর্থাৎ শোকগাথা) না গাহিলে কারবালা ময়দানের শহীদবৃন্দের জন্য তাহাদের কান্না আসে না। সত্যিকারের মহব্বত এবং শ্রেষ্ঠত্ব বোধের জন্য এসমস্ত সাজ সরঞ্জামের প্রয়োজন হয় না। কেহ বলিতে পারেন কি যে, ছাহাবায়ে কেরামের অন্তরে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্য মহব্বৎ ছিল না? হুযুরের জন্য তাঁহাদের তো এত মহব্বৎ ছিল যে, হুযূরের ওযুর পানি তাঁহারা কখনও মাটিতে পড়িতে দেন নাই। তাঁহারা সেই পানি হাতে লইয়া নিজেদের মুখে ও চোখে মাখিয়া দিতেন। কিন্তু এত মহব্বৎ সত্ত্বেও ছাহাবায়ে কেরাম হুযূর (দঃ)-এর কবর পাকা করেন নাই; বরং কাঁচাই রাখিয়া দিয়াছিলেন।

কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কবর পাকা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কাজেই হুযুরের প্রতি মহব্বতের কারণেই তাঁহার নিষেধাজ্ঞা পালনার্থ হুযুরের কবর তাঁহারা পাকা করেন নাই। বলা বাহুল্য, ওলিআল্লাহ্গণ জীবিত কালে প্রত্যেক বিষয়ে হুযুর (দঃ)-এর আনুগত্যে ও অনুসরণে জান প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং যাহাতে হুযুর (দঃ) খুশী ছিলেন আউলিয়ায়ে কেরামের খুশীও তাহাতেই।

যদি কেহ বলেন, কবর পাকা করিলে আল্লাহ্ওয়ালাগণের স্মৃতিচিহ্ন স্থায়ী রাখা হয়, তবে ইহার উত্তরে আমি বলিব, তাঁহাদের স্মৃতি স্থায়ী রাখার মালিক আল্লাহ্। তোমাদের স্থায়ী রাখাতে তাহা স্থায়ী থাকিতে পারে না। দেখুন, বহু পাকা কবরে সমাহিত লোক এমনও আছে যাহাদের নামের সহিতও কেহ পরিচিত নহে। কবর পাকা করিলেই কি স্মৃতি স্থায়ী থাকে? কখনই নহে, বরং আল্লাহ্ওয়ালাগণের 'বেলায়েত' তাঁহাদের গুণাবলী, মারেফাৎ এবং মহব্বতই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের স্মৃতি স্থায়ী ভাবে রক্ষা করিয়া থাকে। তাঁহারা আপনাদের স্থায়ী করণের মুখাপেক্ষী নহেন।

আরেফ শীরাযী বলেন :

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق + ثبت ست بر جریدۂ عالم دوام ما

"খোদার এশ্কে যাঁহার দেল জীবিত হইয়াছে, তিনি কখনও মরেন না, স্থায়িত্বের জগতের দফতরে তাঁহার নাম খোদিত হইয়া রহিয়াছে।"

আর মাওলানা নিয়ায বলেন :

طمع فاتحه از خلق نداریم نیاز + عشق من از پس من فاتحه خوانم باقی ست

"হে নিয়ায! আমি (মৃত্যুর পরে) মানুষের নিকট হইতে দোআ এবং ফাতেহার আশা করি না, আমার 'এশ্ক্ই আমার পরে আমার উপর ফাতেহা পড়িবার জন্য অবশিষ্ট থাকিবে।"

আর একটি উত্তর ইহাও দেওয়া যায় যে, যদি একান্তই স্মৃতি-চিহ্ন স্থায়ী রাখিতে ইচ্ছা কর—তবে উহার এক উপায় ইহাও আছে যে, কবর কাঁচা রাখ এবং প্রতি বৎসর উহা লেপা-মোছা করিতে থাক এবং মাটি ফেলিয়া সমান রাখ। আর একটি কৌতুকের বিষয় এই যে, দুনিয়াদারেরা ঐসমস্ত বুযুর্গ লোকের কবরকেই পাকা করে যাঁহাদিগকে তাহারা নিজেদের ধারণানুযায়ী সুন্নতের পাবন্দ মনে করে না। আর যাঁহাকে সুন্নতের পাবন্দ মনে করে তাঁহাদের কবর পাকা করে না, কাঁচাই থাকে। যেমন, হযরত শায়খ্ কুতুবুদ্দিন বখ্তিয়ার কাকী রাহেমাহুল্লাহ্র মাযার কাঁচা। সেখানে স্ত্রীলোকও যাতায়াত করে না। তাঁহার আশে-পাশের লোকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া গেল, "ইনি শরীয়তের খুব পাবন্দ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মাযারে এসমস্ত বিষয় জায়েয মনে করা হয় নাই। না-উ'যুবিল্লাহ্। অপরাপর আউলিয়ায়ে কেরাম যেন শরীয়তের পাবন্দ ছিলেন না এই ভ্রান্ত ধারণার কারণে ইহা পরিত্যাজ্য।

॥ সেমার (সঙ্গীতের) শর্ত ॥

এইরূপে হযরত শামসুদ্দীন তোর্‌ক্‌ পানিপথী রাহেমাহুল্লাহুর কবরের নিকট সঙ্গীতানুষ্ঠান হয় না। শুধু কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেও বলা হয় যে, তিনি অত্যধিক সুন্নতের পাবন্দ ছিলেন, কাজেই তাঁহার কবরের নিকট কাউয়ালী অনুষ্ঠান হয় না। এই উত্তরে তাহারা একথা স্বীকার করিয়াছে যে, সঙ্গীত, কাউয়ালী, কবর পাকা করা এসমস্ত কাজ সুন্নত বিরোধী, এই কারণেই তো যাঁহাদিগকে তাহারা সুন্নতের পাবন্দ মনে করে তাঁহাদের কবরের কাছে সুন্নত-বিরোধী কার্য করে না। অবশ্য তাহারা ঐ সমস্ত কার্যকে সুন্নত বিরোধী মনে করিয়া এরূপ জবাব দেয় নাই, তথাপি সত্য কথা কোন কোন সময় হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়াই পড়ে। আর ন্যায়বান লোকেরা তো নিজেদের ভুল পরিষ্কার ভাষায় স্বীকারই করিয়া ফেলে।

একবার আমি হযরত শাহ্‌ নিযামুদ্দীন কুদ্দেসা সিররুহুর মাযারে গিয়াছিলাম। তখন সেখানে কাউয়ালীর আসর জমাইবার আয়োজন করা হইতেছিল। কবর যেয়ারত সমাধা করিয়া বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেই সঙ্গীতের আয়োজনকারীরা আমাকে বাধা দিয়া বলিল : আপনি সঙ্গীত অনুষ্ঠানে শরীক হউন না কেন? আপনিও তো চিশ্‌তিয়া তরীকা পন্থী, চিশ্‌তিয়া তরীকার সকলেই তো কাউয়ালী অনুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি বলিলাম : "আমি এই কাউয়ালী অনুষ্ঠানে শরীক থাকিলে 'সুলতান্‌জী' নারাজ হইবেন।" সে ব্যক্তি বলিল : "কেন সুলতান্‌জী তো নিজেই কাউয়ালী শ্রবণ করিতেন।" আমি বলিলাম : হাঁ, কিন্তু সুলতান্‌জী নিজের "ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ" কিতাবে সঙ্গীত অনুষ্ঠানের জন্য চারিটি শর্ত লিখিয়াছেন। ১। শ্রোতা। ২। গায়ক ৩। শ্রবণীয় বিষয়-বস্তু। এবং ৪। শ্রবণের যন্ত্র পাতি।

শ্রোতার সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : "প্রবৃত্তির বশীভূত এবং কামভাব সম্পন্ন লোক হইতে পারিবে না।" আর গায়ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "স্ত্রীলোক এবং বালক হইতে পারিবে না। শ্রবণীয় বিষয় সম্বন্ধে শর্ত আরোপ করিয়াছেন যে, হাসি-কৌতুক কিংবা অশ্লীল শ্রেণীর বিষয় হইতে পারিবে না। আর সঙ্গীতের যন্ত্র-পাতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন : সেখানে সারেঙ্গী, বেহালা, হারমনীয়াম ইত্যাদি জাতীয় বাদ্য যন্ত্র থাকিতে পারিবে না"। আমি দেখিতেছি, এখানে উক্ত শর্তসমূহের সমাবেশ নাই। সুতরাং এই আসরে যোগদান করিয়া সুলতান্‌জীকে অসন্তুষ্ট করার দুঃসাহস আমার নাই।" আমার এই উত্তর শুনিয়া সকলে শরমিন্দা হইয়া গেল। আমি যদি সাধারণ মৌলবীদের ন্যায় সেখানে বাহাছ্‌ আরম্ভ করিতাম যে, সেমা (সঙ্গীত) মাত্রই হারাম, তবে আমার কথা কেহই শুনিত না; কিন্তু আমার এই নম্র উত্তরের এই ফল ফলিল যে, সকলে

স্বীকার করিল ; বাস্তবিকই আপনি সত্য বলিতেছেন। আমরা যেই ধরনের সেমা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা বুযুর্গানে দ্বীনের শর্ত-বিরোধী !

॥ কবর পাকা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা ॥

ফলকথা, ন্যায়বানেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এবং বিরোধী লোকেরা বাধ্য হইয়া সত্য কথা স্বীকার করিয়াই ফেলে। যেমন, বখ্‌তিয়ার কাকীর (রাঃ) কবরের খাদেমগণ পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল যে, কবর পাকা করা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

ইহা নিষিদ্ধ হওয়ার আর একটি হেকমত বুঝিয়া লউন। শরীয়ত যে কবর পাকা করিতে নিষেধ করিয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করা হইয়াছে। কেননা, প্রথম হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কবর যদি পাকাই করা হইত, তবে মানুষের বাসস্থানের জায়গাই থাকিত না, ক্ষেতিকৃষি করিবার জন্যও জমিন থাকিত না। কেননা, পৃথিবীর আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত এত মানুষের মৃত্যু হইয়াছে যে, জমিনের কোন অংশই 'মুর্দা' ছাড়া নাই। বলুন, সকলের কবরই যদি পাকা করা হইত তবে আমাদের ঠিকানা কোথায় হইত ? পাকা কবরের ছাদের উপর দোতালা, তিন তালা, নির্মাণ করিতে হইত যাহা পাহাড়ের ন্যায় হইয়া যাইত। পক্ষান্তরে কাঁচা কবরের এই সুবিধা রহিয়াছে যে, নিশ্চিহ্ন হইয়া গেলে তথায় আবার কবর খনন করা যায়। আবার জমিন ওয়াক্‌ফ্‌ না হইলে যতটুকু সময় নিশ্চিতরূপে ধারণা করা যায় যে, কবরস্থ মুরদার দেহ মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে ততটুকু সময়ের পরে তথায় ক্ষেতিকৃষিও করা যায়। আর এই যে বলিলাম, জমিনের সকল স্থানেই কবর আছে। জীবিত এবং মৃত লোকদের সংখ্যা গণনার প্রতি লক্ষ্য করিলে একথা বুঝে আসিতে পারে যে, যখন এক সময়েই এত মানুষ একত্রিত হইয়াছে, তখন ছয় সাত হাজার বৎসরে কি পরিমাণ অগণিত ও অসংখ্য মানুষ হইবে ? আর প্রত্যেকটি মানুষের জন্য কি পরিমাণ স্থানের প্রয়োজন হইত ? তাহা হইলে এত জায়গার সংকুলান কোথায় হইত ? এই হিসাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, আদি-কাল হইতে আজ পর্যন্ত সকলেই যদি জীবিত থাকিত, তবে এই ভূ-পৃষ্ঠে থাকিবার স্থান হইত না। ফলকথা, কবরসমূহ পাকা হইলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর এই সংকীর্ণতা দেখা দিত। এখন তো পূর্ব কালের মৃতলোকদের সমাধি স্থানেই সকলে বাস করিতেছে, তাহাদের কবরের বরং তাহাদের দেহের মাটি দ্বারা মানুষ ঘর-বাড়ী এবং হাড়ি-পাতিল ও ভাণ্ড-বাসন নির্মাণ করিতেছে। সম্ভবতঃ আমাদের ঘরের কলসী, সোরাহী ও বাসন-পত্র আমাদেরই পূর্ব পুরুষের দেহের মাটি দ্বারা নির্মিত।

জনৈক দিব্য চক্ষু সম্পন্ন বুযুর্গ লোকের কাহিনী মনে পড়িল। দিব্য চক্ষু বিশিষ্ট একজন মৌলবী ছাহেব কোন এক গ্রামে গেলেন, সেই গ্রামে একটি বিচিত্র

পেয়ালা ছিল, যাহাতে প্রত্যেক মৌসুমেই পানি গরম থাকিত, শীত ঋতুর চিল্লার সময়েও। উক্ত মৌলবী ছাহেবকে ইহার কারণ, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : ইহা আমার নিকট রাখিয়া যাও, আদেশানুযায়ী উহা এক রাত্রের জন্য তাঁহার নিকট রাখা হইল। পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল, উহাতে ঠাণ্ডা পানি রহিয়াছে। লোকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এই পেয়ালাটি একজন দোযখী লোকের দেহের মাটি দ্বারা নির্মিত। আজ আমি তাহার জন্য দোআ করিলে তাহার মাগফেরাত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পেয়ালার পানিও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমি বলিতেছিলাম, কবর পাকা করিলে এসমস্ত অনর্থের সৃষ্টি হয়। মৃত্যু তো মানুষকে বিলুপ্ত এবং নিশ্চিহ্ন করার জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে, অতঃপর স্থায়িত্বের সরঞ্জাম করা একটি অর্থহীন ব্যাপার।

॥ কবরের ফয়েযের রকম ॥

যদি কেহ বলেন, কবর হইতে ফয়েয লাভ হয় ; সুতরাং কবরগুলি স্থায়ী থাকা প্রয়োজন। আমি ইহার বাস্তবতা অস্বীকার করি না। কিন্তু প্রথমতঃ সেই ফয়েয্ ধর্তব্য এবং গণ্য নহে। কেননা, কবর হইতে যে ফয়েয্ লাভ করা যায়—তাহা এমন নহে যদ্দ্বারা কামালিয়াৎ হাছিল হইতে পারে ; বরং উহার মান এতটুকু যে, ছাহেবে নেসবৎ অর্থাৎ আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্ক কিঞ্চিৎ দৃঢ় হয়। সম্পর্কহীন লোক তো কোনই ফয়েয পায় না। সম্পর্কশীল ব্যক্তিও শুধু এতটুকু ফয়েযই পায় যে, সম্পর্কের মধ্যে সাময়িকভাবে একটু সবলতা আসে, এবং অবস্থার একটু উন্নতি হয়। কিন্তু উহা ক্ষণেকের জন্য মাত্র। ইহার দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করুন—যেমন, তন্দুরের নিকট বা চুল্লীর নিকট কিছুক্ষণ বসিলে শরীর গরম হয় বটে ; কিন্তু চুল্লির নিকট হইতে একটু নড়িয়া গেলে বাতাস লাগা মাত্র সেই গরম আর থাকে না। পক্ষান্তরে জীবিত পীর হইতে যে ফয়েয পাওয়া যায়, উহাকে শক্তিবর্ধক ঔষধের ন্যায় মনে করুন। উক্ত ঔষধ সেবন করিলে যেই শক্তি ও উত্তাপ দেহে উৎপন্ন হয় তাহা সমস্ত শরীরের মধ্যে মিশিয়া যায় এবং স্থায়ী থাকে। বিশেষতঃ সম্পর্কশালী ব্যক্তির প্রথমতঃ কবর হইতে ফয়েয লওয়ার আবশ্যকই নাই। তাহার জীবিত পীরের ফয়েযই তাহার জন্য বহু কবরের ফয়েয হইতে অধিক হিতকর। আর যদি কবরের ফয়েযের প্রয়োজন থাকে—তথাপি কোন পীরের সহিত সম্পর্কবিশিষ্ট লোকের পাকা কবরের প্রয়োজন নাই। কেননা, সে লক্ষণেই বুঝিতে পারিবে যে, এখানে কোন কামেল লোক কবরস্থ রহিয়াছে। সুতরাং ফয়েযের ওজুহাতেও কবর পাকা করার প্রয়োজনীয়তা রহিল না।

।। এবাদতের বরকত ।।

আমি বলিতেছিলাম—আল্লাহ্‌ওয়ালাদের চেয়ে অধিক সম্মানী কেহ নহে। তাঁহাদের সম্মান ও মহত্ত্ব মৃত্যুর পরেও বিদ্যমান থাকে, যদিও কবরের কোন চিহ্ন না থাকুক। এইরূপে প্রকৃত আরামও তাঁহাদের প্রাপ্য। যেমন, আমি এই মাত্র প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি। তবে দুনিয়ার শান্তিও যখন তাঁহারাই অধিক ভোগ করিতেছেন, সম্মানও সকলের চেয়ে অধিক পাইতেছেন ; সুতরাং দুনিয়াতেও তাঁহাদের চেয়ে অধিক সফলকাম কেহই নহে। এই কারণেই আমি বলিয়া থাকি—আল্লাহ্ তা'আলা এবাদতের সাকুল্য বিনিময়ই আখেরাতের জন্য বাকী রাখেন নাই। আখেরাতে তো এবাদতের বিনিময় পাওয়া যাইবেই—দুনিয়াতেও পাওয়া যাইতেছে--তাহাই এই শান্তি, নিরুদ্বেগ সম্মান এবং মহত্ত্ব। যেমন, কোরআন বলিতেছে : أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ "আল্লাহ্ তা'আলার যেকেরের ফলে মনে প্রশান্তি আসে।" অন্যত্র বলিতেছে : فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً "এবাদত ও যেকেরের ফলে এবাদতকারীগণ ইহজগতে উত্তম জীবন লাভ করেন," রাজা বাদশাহ্‌গণ যেই জীবনের হাওয়াও পায় না। অতঃপর তাঁহাদিগকে ইহজগতে অকৃতকার্য বলিতে পারে এমন মুখ কাহার আছে ? অতএব, খোদা প্রেমিক সত্যিকারের প্রেমিক হইলে দুনিয়াতেও বিফলকাম হন না আখেরাতেও অকৃতকার্য হন না। দুনিয়ার সফলতা তো তাহাই--যাহা আমি এইমাত্র বর্ণনা করিলাম। আর তাহাদের আখেরাতের কৃতকার্যতা সকলেই জানেন যে, এবাদতকারীদের নিমিত্ত সেখানে কত নেয়ামত এবং শান্তি রহিয়াছে। হাদীসে কুদসীতে উল্লেখ রহিয়াছে :

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصّٰلِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ *

"আমার নেক্‌কার বান্দাগণের জন্য এমন নেয়ামত প্রস্তুত রাখিয়াছি যাহা কোন চক্ষু কোন দিন দেখে নাই, কান কোন দিন শোনে নাই এবং কোন মানুষের অন্তরে কখনও ইহার কল্পনা উদিত হয় নাই।"

।। নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর ত্রুটি ।।

আমার বর্ণনা খুবই দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে। এতগুলি কথা এই প্রসঙ্গে বলিয়া ফেলিলাম যে, যদি কাহারও পক্ষে কোরআন শরীফ পড়া শুদ্ধ করিয়া লওয়ার আশা না থাকে, তবে সে নিজের সাধ্যানুসারে চেষ্টা করার পর আর অকৃতকার্য বলিয়া গণ্য হইবে না ; বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে শুদ্ধরূপে পাঠকারীদের সমান-বরঞ্চ তাহা অপেক্ষা অধিক সওয়াব দান করিবেন। এই প্রসঙ্গেই এই আলোচনা আরম্ভ হয়াছিল যে,

আল্লাহ্‌ তা'আলার এক বিচিত্র দরবার, এখানে কোন চেষ্টাকারীই বিফল হয় না। কেননা, আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধু মানুষের চেষ্টাই দেখিয়া থাকেন। তাহা ফলবতী হউক বা না হইক। অতএব, আর কাহারও পক্ষে কোরআন তেলাওয়াৎ এবং উহার হরফগুলির বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখিয়া লওয়া সম্বন্ধে কোন টালবাহানা করিবার সুযোগ রহিল না। আলহাম্‌দু লিল্লাহ্‌! এখন আমি দলিলের সাহায্যেও এবং দৃষ্টান্তের সাহায্যেও একথা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি যে, কোরআনের শব্দগুলি এবং উহাদের অন্তর্নিহিত অর্থ উভয়ই প্রয়োজনীয়। আর যাহারা বলেন যে, অর্থ না বুঝিয়া কোরআন পড়িলে কি লাভ ? তাঁহারা বড় জঘণ্য কথা বলিয়া ফেলেন। ইহাতে ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আমার উপরোক্ত বর্ণনা—এমন একটি কথার জবাব ছিল যাহার সহিত নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের দুর্নাম জড়িত। বস্তুতঃ ইহারা অতি সত্বর দুর্নামগ্রস্ত হইয়া পড়ে। কারণ—তাহাদের আকৃতি, রীতি-পদ্ধতি এবং এবং বাহ্যিক চালচলন ইসলামী বিধানের বিপরীত। কিন্তু খোদা না করুন, তাঁহাদের মধ্যে সকলের আকা-য়েদ খারাপ নহে ; বরং কাহারও কাহারও আকীদা ভালও আছে। কেবল বাহ্যিক আকৃতির কারণেই তাঁহারা দুর্নামগ্রস্ত।

আমি একবার ঢাকায় বিশেষ করিয়া নবাব সাহেবের আত্মীয়-স্বজনদের এক খাছ সভায় ওয়ায করিয়াছিলাম। তাহাতে অধিকাংশ আধুনিক ভাবধারার লোকই ছিলেন। উক্ত সভায় আমি বিশেষ করিয়া আকীদা সংশোধন করা সম্বন্ধেই বলিয়া-ছিলাম যে, আপনারা যদি নিজদিগকে সকল বিষয়ে সংশোধন নাও করিতে পারেন, তবে অন্ততঃ দুইটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করুন। প্রথমতঃ, নিজেদের আকীদা দুরুস্ত করুন। দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত না-জায়েয কাজ আপনারা করিতেছেন উহাদিগকে হারাম মনে করিয়া করিবেন। টানা হেঁচ্‌ড়া করিয়া উহাদিগকে জায়েয করার চেষ্টা করিবেন না। কেননা, আপনাদের অর্থহীন ব্যাখ্যায় হারাম কাজ কখনও হালাল হইতে পারে না। কিন্তু এই উল্টা ব্যাখ্যার এক কুফল এই দাঁড়াইবে যে, আপনারা হারামকে হালাল মনে করিতে আরম্ভ করিবেন। অথচ হারামকে হালাল মনে করা কুফরী। নিশ্চিত পর্যায়েরই হউক কিংবা ধারণাকৃত পর্যায়েরই হউক। যাহা হউক, এই অবস্থা বড়ই ভয়ানক। আর যদি হারাম মনে করিয়া করেন, তবে কুফরীর আশঙ্কা থাকিবে না। কেবল গুনাহ্‌গার হইবেন। ইহা কুফরী অপেক্ষা হাল্‌কা। আর একটি কথা এই যে, আপনি ইহাকে হারাম মনে করিতে থাকিলে বিচিত্র নহে যে,কোন সময় তওবা করারও তাওফীক হইতে পারে। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, সারা জীবনের মধ্যে আপনি এসমস্ত কাজ ত্যাগ করিতে পারিবেন না,তবুও কুফরী হইতে তো রক্ষিত থাকিবেন। এই বিষয়টি আরও একটি খাছ মজলিসে বর্ণনা করিয়াছিলাম। তখনকার

মত তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করা হইতে বুঝিয়াছিলাম তাঁহাদের অনেকের আক্বীদাই দুরুস্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, এযাবৎ যাহা বলিয়াছি, তাহা তো ছিল নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের সন্দেহের উত্তর।

।। মূর্খ দরবেশদের ভুল ।।

আর এক সন্দেহ রহিয়াছে দরবেশদের মধ্যে—যাহারা ধার্মিক শ্রেণীর মধ্যে উচ্চস্তরের বলিয়া পরিগণিত। আর মুসলিম সমাজের ঝোঁক সাধারণতঃ দরবেশদের প্রতি বেশী। এমনকি, আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরাও দরবেশদের প্রতি রুজু করিয়া থাকেন। তাঁহারাও দরবেশদের ভক্ত। তাহা প্রকৃত দরবেশই হউক কিংবা কপট দরবেশই হউক। ইহার কারণ এই যে, সাধারণ লোকেরা দরবেশদিগকে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমতা সম্পন্ন বলিয়া মনে করে এবং এসম্বন্ধে একটি বয়েতও প্রসিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে :

اولیا را هست قدرت از اله + تیر جسته باز گرداند زراه

"ওলিআল্লাহ্গণের ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলা হইতে প্রাপ্ত। তাঁহারা নিক্ষেপিত তীরও ফিরাইয়া আনিতে পারেন।"

কিন্তু সাধারণ মানুষ এই বয়েতটির অর্থ যাহা বুঝিয়া লইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, ইহাতে 'از اله।' অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তা'আলা হইতে" কথাটি উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব, বুঝিতে হইবে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ এবং তকদীরই আসল নির্ভর। কাজেই এখানেও সম্বন্ধ আল্লাহ্ তা'আলারই সঙ্গে যাহাকিছু হয় আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতেই হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাদের মধ্যে কতক দরবেশ বলিয়া থাকেন যে,শরীয়তের 'যাহের' এবং 'বাতেন' দুইটি দিক আছে। একটি বাহ্যিক আর একটি আভ্যন্তরিক। ইহাদের মধ্যে অভ্যন্তরই আসল উদ্দেশ্য। বাহিরের আকার উদ্দেশ্য নহে। আর কোরআনের শব্দসমষ্টি এবং এইরূপে নামায ও রোযার 'আরকান' এই সমস্ত বাহিরের আকার। অতএব, উদ্দেশ্য নহে। এই কারণে তাহারা এরূপ আক্বীদাও পোষণ করে যে, অভ্যন্তর ও হাক্বীকৎ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে আর এবাদতের প্রয়োজন থাকে না। আমি বলি, ইহা শরীয়তের হুকুম। এক্ষেত্রে কাহারও নিজস্ব মত কিংবা দিব্য চক্ষুর দর্শন কোন কাজে আসিবে না। শরীয়তের ঘোষণাই চরম বলিয়া ধর্তব্য—শরীয়ত বলিতেছে : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ "তোমরা মৃত্যু-মুহূর্ত পর্যন্ত তোমাদের প্রভুর এবাদৎ কর।" ইহাতে বুঝা যায়—মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত এবাদৎ অপরিহার্য কর্তব্য। বাহির এবং অভ্যন্তর উভয়ের সহিতই এবাদতের সম্পর্ক ; বরং এবাদতের অধিকাংশই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। অন্তরের দ্বারা কেবল নিয়ত করা শর্ত।

সুতরাং "শুধু ভিতরই উদ্দেশ্য, বাহির উদ্দেশ্য নহে" ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু এই মূর্খ দরবেশগণ আরও ধৃষ্টতা এই করিতেছে যে,এই আয়াতটির অর্থই বিগ্ড়াইয়া দিয়া বলিতেছে যে,এখানে يقين শব্দের উদ্দেশ্য বেলায়েতের একটি খাছ স্তর। তরীকত পন্থী উক্ত স্তর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিলে এবাদত মাফ হইয়া যায় এবং এবাদতের হুকুম উহার পূর্ব পর্যন্ত। এই স্তরে পৌঁছিলে—শুধু আভ্যন্তরীণ অঙ্গ দ্বারা এবাদত করিবার নির্দেশ থাকে—অর্থাৎ কেবল মনে মনে আল্লাহ্র যেকের করিতে থাক। বাহ্যিক আকারের এবাদত—নামায রোযার প্রয়োজন থাকে না। ইহাকে তাহারা "কলন্দরী তরীকা" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকে। কিন্তু এক মাত্র "তাসাওওফ" সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণেই তাহারা এসমস্ত সর্বনাশা উক্তি করিয়া থাকে।

॥ কলন্দরীর স্বরূপ ॥

'কলন্দর' শব্দটি সুফিয়ায়ে কেরামের একটি খাছ পরিভাষা। ইহার অর্থ 'তাসাওউফ' শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করুন। এই বিষয়ে অনেক কিতাব লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "আওয়ারেফুল মাআরেফ" নামক কিতাবটি খুবই ভাল। ঐসমস্ত কিতাবে "কলন্দর" শব্দের স্বরূপ খুব বিশদ ভাবে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে, ইত্যাদি যাহারা বাহিরের এবাদত কম করেন অর্থাৎ, আল্লাহ্র যেকের এবং ধ্যান নফল ও মুস্তাহাব নামাযের চেয়ে অধিক করেন। মোটকথা, তাহারা নফল নামায অধিক না পড়িয়া আল্লাহ্র যেকের-ফেকেরে অধিক মশ্গুল থাকেন। ইহার অর্থ এই নহে যে, তাঁহারা ফরয এবং ওয়াজেবকেও ত্যাগ করেন। কিন্তু আজকাল 'কলন্দর' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি "চার আবরু" অর্থাৎ, দাড়ি, গোঁপ এবং চোখের উপরিস্থ দুই ভ্রূ কামাইয়া ফেলে এবং মাথা মুড়াইয়া ফেলে। এই ধরণের কলন্দরী তো খুব সস্তা মূল্যেই লাভ করা যায়। নাপিতকে দুই পয়সা দিয়া যাহার ইচ্ছা সেই 'কলন্দর' সাজিতে পারে। এই কথাটিই কবি বলিতেছেন :

نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند + نه هرکه آئینه دارد سکندری داند
هزار نکتهٔ باریک تر ز مو این جاست + نه هرکه سر بتراشد قلندری داند

"কৃত্রিম উপায়ে চেহারা উজ্জ্বল করিলেই যে, প্রেমিকতা জানে তা নহে। আয়নার অধিকারী হইলেই যে, সেকান্দরী জানে তাহা নহে। এশ্কের ক্ষেত্রে এমন অনেক সূক্ষ্ম রহস্য আছে যাহা কেশ হইতেও সূক্ষ্ম। মাথা মুড়াইলেই যে, কলন্দরী জানে তাহা নহে।"

কলন্দরের বিপরীত আর এক দল আছে যাহাদিগকে "মালামতি" বলা হয়। ইহাও একটি পারিভাষিক শব্দ। যাহারা প্রকৃতপক্ষে এবাদত অধিক পরিমাণেই করেন, কিন্তু লোক-চক্ষু হইতে উহাকে গোপন রাখার জন্য খুবই যত্নবান থাকেন।

এরূপ 'আবেদ'কে "মালামতী" বলা হয়। ইঁহাদের বাহিরের অবস্থা দেখিয়া সর্ব-সাধারণ মনে করে—ইঁহারা সাধারণ লোকের চেয়ে অধিক কিছুই করেন না। ইঁহারা কেমন বুযুর্গ। কিন্তু আজকাল 'মালামতী' ঐ সমস্ত লোককে বলা হয়, যাহারা শরাব, কাবাব এবং যেনাকারীর সহিত আবার 'সুফী' হওয়ার দাবী করে। একেবারে মূল শব্দের অর্থই বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, এ সমস্ত শব্দ পারিভাষিক। এ সমস্ত শব্দের অর্থ তাসাওউফ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লও। নিজের তরফ হইতে মন গড়া অর্থ বলার অধিকার তোমাদের নাই।

যদি কেহ বলেন : "لَا مُشَاحَّةَ فِي الْاِصْطِلَاحِ পরিভাষায় কোন দোষ নাই। প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী পৃথক পরিভাষা রচনা করিয়া লওয়ার অধিকার আছে।" আমি তদুত্তরে বলিব, আপনাদের প্রবর্তিত "কলন্দরী" পরিভাষার সহিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই ; বরং শরীয়ত এরূপ কার্যকে খোদাদ্রোহিতা ও বেদ্বীনী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। পূর্ব বর্ণিত আয়াতের যে অর্থ তোমরা গ্রহণ করিয়াছ তাহা সম্পূর্ণ ভুল ; কেননা يقين শব্দের দ্বারা বেলায়েতের বিশেষ স্তর উদ্দেশ্য লওয়া তোমাদেরই পরিভাষা। কোরআন তোমাদের পরিভাষা অনুযায়ী নাযেল হয় নাই ; বরং আরবী ভাষায় নাযিল হইয়াছে, আরবী লোগাতের কিতাব তোমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। লোগাত দেখাইয়া বল—তোমরা যেই অর্থ বলিতেছ ইহা কি কোন কিতাবে লেখা আছে? অন্যথায় আমার নিকট শ্রবণ কর, আমি বলিতেছি, يقين শব্দ যখন اتى অর্থাৎ 'আসা' ক্রিয়ার কর্তা হয়, তখন উহার অর্থ হয় মৃত্যু। সর্বসাধারণ তাফ্‌সীরকারগণ এই ভিত্তিতেই বলিয়াছেন যে, এস্থলে يقين শব্দের অর্থ মৃত্যু। এই তো বলিলাম আভিধানিক প্রমাণ।

তাফ্‌সীরকারদের নিকট শরীয়তানুগ আরও একটি খুব শক্তিশালী দলিল বিদ্যমান আছে। তাহা এই যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ফরয তরকের জন্য যে সমস্ত শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন উহা হইতে কাহাকেও বাদ দেন নাই। সুতরাং "কোন বিশেষ স্তরে পৌঁছিলে বাহ্যিক এবাদতসমূহ মাফ হইয়া যায়," এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ; বরং ব্যাপার ইহার বিপরীত। কেননা, নৈকট্য যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই এবাদতের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মুস্তাহাব এবং সুন্নতে-গায়ের মুয়াক্কাদাহ্ ত্যাগ করার জন্য সাধারণ লোককে কোন শাস্তি প্রদান করা হইবে না। কিন্তু সান্নিধ্য প্রাপ্ত খাছ লোকগণ সুন্নতের একটুখানি ব্যতিক্রম করিলেও তজ্জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে। দুনিয়াতেও ইহার নযীর বিদ্যমান আছে, অশিক্ষিত গ্রাম্য লোক কোর্টে কোন প্রকার বেআদবী বা বে-আইনী কাজ করিলে তজ্জন্য তাহাকে পাকড়াও করা হয় না। কিন্তু পেশ্‌কার যদি অসঙ্গত সামান্য একটু কথাও বলে কিংবা বিনা কারণে হাসে,তবে

তাহার বিপদ হয়। نزدیکان را بیش بود حیرانی অর্থাৎ, "নিকটবর্তী লোকের পেরেশানী অধিক।" সুতরাং বিস্ময়ের উপর বিস্ময় এই যে, খোদার নিকটবর্তী হইয়াও মানুষ শরীয়তের বিধান হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া যাইবে? ইহা কখনই হইতে পারে না। আপাততঃ যদি ইহা মানিয়াও লওয়া হয় যে, আকৃতি উদ্দেশ্য নহে; বরং শুধু অভ্যন্তরই উদ্দেশ্য, তবুও ইহা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, নামায রোযা মা'ফ হইয়া যাইবে। কেননা, অভ্যন্তরের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের। যেমন মিষ্টতা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। পেয়ারার মিষ্টতা এক রকম, আনারের অন্য রকম, আমের আর এক রকম, ইক্ষুর আর এক রকম। ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহার সবগুলিতে মিষ্টতা আছে। কিন্তু রকম ভিন্ন ভিন্ন, তবে কি কেহ বলিতে পারে যে, ইক্ষু চোষণ করিলে আনার কিংবা আমের স্বাদ পাইবে। কখনও না। এই প্রকারে আমি বলি, যে অভ্যন্তরকে আপনারা উদ্দেশ্য মনে করেন উহাও বিভিন্ন প্রকারের। একটি নামাযের রূহ্, তাহা নামাযের দ্বারাই লাভ করা যাইবে, আর এক রূহ্ রোযার, তাহা রোযার দ্বারাই হাছেল হইবে, আর এক রূহ্ তেলাওয়াতে কোরআনের, তাহা কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের দ্বারাই লাভ করা যাইবে। ইহা কখনও হইতে পারে না যে, শুধু মনে মনে আল্লাহ্‌র যেকের করিলেই নামাযের রূহ্ হাছিল হইবে এবং রোযার রূহ্‌ও হাছিল হইবে, কোরআন তেলাওয়াতের রূহ্‌ও হাছিল হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি, অভ্যন্তরই উদ্দেশ্য; কিন্তু সেই অভ্যন্তর বাহিরের উক্ত বিশেষ আকার অবলম্বন ভিন্ন কখনও হাছিল হইতে পারে না। যদি কেহ এরূপ দাবী করে যে, নামায না পড়িয়াই সে নামাযের রূহ্ হাছিল করিয়া ফেলিয়াছে, তবে সে মিথ্যাবাদী। ইহার দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণরূপে ঐ ব্যক্তি যে ইক্ষুর রস চুষিয়া বলে যে, আমি আনার ও আমের মিষ্ট স্বাদ উপভোগ করিয়াছি। সুতরাং আমি বলি: হে দরবেশগণ! কান খুলিয়া শ্রবণ কর। নামায এবং তেলাওয়াতে কোরআনের 'রূহ' নামায পড়িলে এবং কোরআন তেলাওয়াত করিলেই হাছিল হইতে পারে, উহা ব্যতীত কিয়ামত পর্যন্ত উহাদের রূহ্ পাওয়া যাইতে পারে না। অতএব, তাহাদেরও অবশ্য কর্তব্য কোরআন তেলাওয়াত করা এবং বিশেষ ভাবে উহার জন্য চেষ্টা করা এবং শুধু যেকের ফেকেরকে যথেষ্ট মনে না করা, ইহা দরবেশদের ভুল।

আলেম সমাজের ভুল

এখন আমি নিজের সমাজেরও একটি ভুল প্রকাশ করিতেছি, অর্থাৎ, আলেম সম্প্রদায়ের। তাঁহারা যেন নিজদিগকে সকলের চেয়ে ভাল মনে করিয়া আনন্দিত না হন। বরঞ্চ তাঁহারাও একটি ভুলের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাহা এই যে, আলেম সমাজ শুধু কিতাবী এলম শিক্ষা করাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া লইয়াছেন।

এল্ম শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল করা দরকার মনে করেন না। অথচ আমলের উদ্দেশ্যেই এল্ম শিক্ষা করা। এরূপ আলেমদের অবস্থা এই যে, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ স্বভাব দুরুস্ত নহে। তাহা দুরুস্ত করার চিন্তাও তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের মধ্যে দুইটি স্বভাব আমার নিকট খুবই অপছন্দনীয়। একটি ধন-দৌলতের লিপ্সা আর একটি সম্মানের লিপ্সা।

এই দুইটি লিপ্সাই আলেম সমাজকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে মুদার্‌রেসগণের অবস্থা এই যে, তাঁহারা বেতনের জন্য পাগল, ইহা নিতান্ত খারাপ। এই কারণেই কোন মাদ্রাসার পরিচালক কোন মুদার্‌রেসের উপর নির্ভর করিতে পারেন না। ইনি স্থায়ী থাকেবেন কি না। কেননা, অন্য স্থান হইতে পাঁচ টাকা অধিক বেতনে দাওয়াত পাইলেই উক্ত মুদাররেস ছাহেব এই মাদ্রাসা পরিত্যাগ করিয়া সেদিকে চলিয়া যান। যদিও প্রথম স্থানে দীনের খেদমত অধিক এবং পরিবর্তী স্থানে দীনের খেদমত নামে মাত্র। অথচ প্রথম মাদ্রাসা হইতে তিনি যে বেতন পাইতেন তাহাতে আরামের সহিত তাঁহার দিন চলিয়া যাইতেছিল, এরূপ আচরণ প্রকাশ্য ধর্ম-বিক্রয়। ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায়, কেবল্ বেতনই তাঁহার উদ্দেশ্য, ধর্মের খেদমত উদ্দেশ্য নহে। অবশ্য পূর্বোক্ত মাদ্রাসার বেতনে যদি দিন নির্বাহ না হয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যে টানা-টানি বা সঙ্কীর্ণতা হয়, তবে অধিক বেতনে অন্যত্র যাওয়া দুষণীয় নহে। কিন্তু শর্ত এই যে, বাস্তব প্রয়োজনসমূহে টানাটানি হওয়া চাই। অতিরিক্ত প্রয়োজনসমূহে টানাটানি হইলে তাহা ধর্তব্য নহে। তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনই নহে। ঐব্যক্তি অযথা উহাকে প্রয়োজনের শামীল করিয়া রাখিয়াছে। অতএব, ইহা নিতান্ত অশোভনীয় কার্য, দীনের আলেম হইয়া ধন-দৌলতের লোভী হইবে।

তাঁহাদের মধ্যে দ্বিতীয় রোগ সম্মানের লিপ্সা। ইহার কারণে আলেমদের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হইয়াছে। প্রত্যেকেই নিজের একটি পৃথক দল গঠনের চিন্তায় আছেন, ধন-দৌলতের ব্যাপারে তো আলেমদের রুচি এইরূপ হওয়া উচিত :

اے دل آں بہ کہ خراب از مئے گلگوں باشی + بے زر و گنج بصد حشمت قارون باشی

অর্থাৎ, আলেমদের উচিত, নিজেদের অভাবের মধ্যে মত্ত থাকা এবং অপর হইতে নিজকে অভাবশূন্য মনে করা। দুনিয়াদারগণের ধন-দৌলতের প্রতি দৃষ্টিপাতও না করা। ইহা শুধু কথার কথাই নহে; বরং আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ ইহাকে কার্যে পরিণত করিয়াও দেখাইয়াছেন।

জনৈক বাদ্শাহ্ কোন একজন বুযুর্গলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। খান্কার দরজায় পৌঁছিলে দ্বারবান বাধা দিয়া বলিল, থামুন, আমি আগে শায়খ্‌কে সংবাদ দেই অনুমতি হইলে ভিতরে যাইতে পারিবেন। দ্বারবানের এই ব্যবহার বাদশাহের নিকট খুব খারাপ বোধ হইল। কিন্তু শায়খের প্রতি শ্রদ্ধা মনে লইয়া

আসিয়াছেন,কাজেই নীরব রহিলেন। দ্বারবান ভিতরে যাইয়া শায়খ্‌কে বলিল : বাদ-শাহ্‌ দ্বারে দণ্ডায়মান, হযরতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অনুমতি প্রদান করিলে বাদশাহ্‌ ভিতরে গেলেন। এমনিই তো দ্বারবানের ব্যবহারে রাগান্বিত ছিলেন। বুযুর্গের সম্মুখে যাইতেই হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন : در درویش را دربان نباید "দরবেশের দ্বারে দারওয়ান থাকা উচিত নহে।" শায়খ তৎক্ষণাৎ উত্তরে বলিলেন : بباید تا سگ دنیا نیاید "হাঁ উচিত, যেন দুনিয়ার কুকুর আসিতে না পারে।" বাদ্‌শাহ্‌ লজ্জিত হইয়া গেলেন।

এইরূপে বাদশাহ শাহজাহান হযরত শায়খ সালীম চিশ্‌তী রাহেমাহুল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, শায়খ পূর্বে নিজের পা গুটাইয়া বসিয়াছিলেন। বাদ্‌শাহ তথায় পৌঁছিতেই তিনি নিজের পা দুইখানি ছড়াইয়া দিলেন। বাদশাহর সঙ্গে একজন আলেম লোকও ছিলেন। তিনি শায়খের এই ব্যবহারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কখন হইতে পা লম্বা করিয়া দিলেন? শায়খ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, যখন হইতে হাত গুটাইয়াছি।

এসমস্ত মহাপুরুষ নিজদিগকে পরের মুখাপেক্ষী মনে করেন না বলিয়া সামা-জিক শিষ্টাচারও মানিয়া চলেন না। এই কথাটি হযরত আরেফ শীরাযী নিজের কবিতায় বলিতেছেন :

اے دل آں بہ کہ خراب از مئے گلگوں باشی + بے زر و گنج بصد حشمت قارون باشی

"হে মন! দরিদ্রতা ও ফকীরীর রঙ্গীন শরাবে মত্ত থাকা তোমার জন্য, কারূনের ন্যায় ধনবান হইয়া মহা জাঁকজমকে থাকা অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম।" উপরোক্ত 'বয়েতে' আরেফ (রঃ) যাহা বলিয়াছেন তাহা ছিল—ধন-দৌলতের মহব্বত সম্বন্ধে। আর একটি 'বয়েতে' তিনি সম্মানের লিপ্‌সা সম্বন্ধে বলিতেছেন :

در رہ منزل جاناں کہ خطرہاست بجاں + شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

"প্রিয়তমে এশ্‌কের পথে, যেখানে জানের উপর বিপদ অসংখ্য, প্রথম পদ-ক্ষেপের শর্ত এই যে, মাজ্‌নু হইতে হইবে।"

এখানে 'মাজ্‌নু' শব্দের অর্থ 'বিলীন'। কেননা, আশেককে মাজ্‌নু বলা হয়। আর আশেক সর্বদা বিলীনই হইয়া থাকে। অর্থাৎ, নিজের মান-সম্মান সবকিছু প্রিয়তমের জন্য উৎসর্গ করিয়া দেয়; যেমন কবি বলেন :

عاشق بد نام کو پروائے ننگ و نام کیا + اور جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا

"বিফলকাম আশেকের মান-সম্মানের কোন পরওয়া নাই। যে ব্যক্তি নিজেই অকৃতকার্য অন্য কাহারও সঙ্গে তাহার কিসের কাজ?"

হযরত আরেফ (রঃ) আরও বলেন :

"এশ্ক যদিও জ্ঞানবান লোকের নিকট দুর্নামের বিষয়। কিন্তু (আমরা মাজ্নু) আমরা মান-সম্মানের প্রত্যাশী নহি।"

আর মাওলানা বলেন :

عشق آں شعلہ ست کو چوں بر فروخت + ہرچہ جز معشوق باقی جملہ بسوخت

"এশ্ক্ সেই অগ্নিশিখা যখন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, একমাত্র মা'শুক ভিন্ন অপরাপর সকল বস্তুকেই জ্বালাইয়া ছাইভস্ম করিয়া ফেলে।"

আলেমগণের মধ্যে ইহাই প্রধান ত্রুটি—তাঁহারা এশ্করূপ মহা মূল্যবান ধন অর্জন করেন না। এই কারণেই তাঁহাদের মধ্যে সম্মানের লিপ্সা থাকিয়া যায়। এই কারণেই তাঁহাদের অন্তরে নেতৃত্ব এবং পদের চিন্তা বিদ্যমান থাকে। প্রত্যেকে নিজের জন্য সেই নেতৃত্ব ও পদ লাভেরই চেষ্টা করেন। যেমন কেহ কেহ কাউন্সিলের মেম্বরী পদের ভোট পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

বন্ধুগণ! এই পদে বা নেতৃত্বে কোনই ইজ্জত নাই। আমাদের সম্মান তো ইহাতেই নিহিত রহিয়াছে যে, আমরা মর্যাদার সর্বাপেক্ষা পিছনের সারিতে দাঁড়াই আর মানুষ আমাদিগকে টানিয়া সামনে লইয়া যায়। কিন্তু এখানে ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টা। মানুষ আমাদিগকে পশ্চাতে রাখিতে চায় আর আমরা সম্মুখে যাইতে চাই। এই বিপদটি হইতে কেহ কেহ মুক্ত থাকিলেও আর একটি দোষের কথা বলিতেছি তাহা হইতে কেহই মুক্ত নহে। থাকিলেও ক্বচিৎ এক আধ জন। দোষটি এই—আজ যদি গ্রামের মধ্যে অন্য একজন ইমাম আসিয়া পড়েন—যিনি গ্রামের ইমামের চেয়ে কোরআন শরীফ ভাল পড়েন, কিংবা কোন 'ওয়ায়েয' আসিয়া পড়েন যিনি তাঁহা অপেক্ষা ভাল ওয়ায করেন, কিংবা মাদ্রাসায় আর একজন শিক্ষক আসেন যিনি আগের শিক্ষক অপেক্ষা ভাল পড়ান, তবে পুরাতন ব্যক্তি আগন্তুক ইমাম ও আলেমের প্রতি রাগান্বিত হন, হিংসা করেন এবং ভিতরে ভিতরে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন। মুখে হয়ত কিছু বলেন না। অথচ সরলতা ও দ্বীনদারী ইহাকেই বলে যে, যদি নিজের সম্মুখে দীনের খেদমতকারী সহস্র জনও হয়, তবে এই মনে করিয়া হাজার হাজার আনন্দ করা উচিত যে, আল্হামদুলিল্লাহ্ ধর্ম প্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমার ওস্তাদ মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) বলিতেন : ভাই! কেহ যদি রাহে-নাজাতও পড়ায় কিংবা কায়দায়ে বোগদাদীও পড়ায় সে আমাদেরই সাহায্য করে। ইহার অর্থ এই যে, আমরা সারা দুনিয়ার মানুষকে শিক্ষা দিতে অক্ষম। অথচ কামনা এই যে, ঘরে ঘরে ধর্মের চর্চা হউক। অতএব, যে ব্যক্তি যেখানেই ধর্মের কাম করিতেছেন তিনি আমাদেরই সাথী ও সাহায্যকারী। অতএব, দেওবন্দের ন্যায় ছাহারানপুরে ও কানপুরে আরবী শিক্ষার মাদ্রাসা কায়েম হইয়াছে শুনিয়া আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত।

॥ আলেম সমাজকে সতর্কীকরণ ॥

আমি বিশেষ করিয়া আলেম সমাজকে বলিতেছি—নিজেদের মধ্যে এইরূপ রুচি উৎপন্ন করুন এবং নিজেদের আমল ও স্বভাব দুরুস্ত করুন। কিসের পদ এবং কিসের নেতৃত্ব? স্মরণ রাখিবেন! কাওমের দায়িত্ব আপনাদের ঘাড়ে। এমন না হয় যে, আপনাদের এসমস্ত কার্যের দরুন মানুষ ধর্মকে হীন মনে করিতে আরম্ভ করে। আমি দেখিতে পাইতেছি আপনাদের এসমস্ত কাজের কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মানুষ আলেমদের লোভ-লালসা এবং দলাদলির কারণে দীনী এলমকে হীন মনে করিতেছে। আপনারাই সমাজকে ডুবাইয়াছেন। আপনারাই তাহাদের আমলকে বিনাশ করিয়াছেন। সর্বসাধারণ যখন আলেমদিগকে দলাদলি করিতে দেখিবে—তবে বলুন, তাহারা কি দলাদলি করিবে না? অবশ্যই করিবে। তখন তাহাদের সংশোধন করিতে যাইব—আমরা কোন মুখে?

বন্ধুগণ! তোমরা মুস্‌লিম সমাজের খাদেম—মাখ্‌দুম অর্থাৎ সেবার পাত্র নও, তবে রাস্তায় কোন সাধারণ লোককে দেখিলে তোমরা তাহাকে সালাম কর না, বরং তাহা হইতে সালাম পাওয়ার অপেক্ষায় থাক, ইহার কারণ কি? ইহাও সেই সম্মানের লিপ্‌সা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, তোমরা নিজেকে বড় মনে করিয়া থাক। আর কত কাঁদিব। হাজার হাজার কথা আছে। কবি বলেন:

یک تن وخیل آرزو دل بچه مدعا دهم + تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهم

"এক দেহ, আর আকাঙ্ক্ষা অনেক, কোন্ আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিব? সারা শরীরে ক্ষত। কোন্ কোন্ জায়গায় পট্টি লাগাইব?"

একটি বিষয় হইলে উহার জন্য কাঁদা যায়। দুঃখের বিষয়, আমরা তো আপাদ মস্তক দোষের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি।

বন্ধুগণ! আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তো এরূপ ছিলেন না, বরং তাঁহাদের অবস্থা এই ছিল যে, হযরত মাওলানা মোহাম্মদ মোয্‌হার ছাহেব নানুতোবী (রঃ) একদা তাঁহার 'খাটিয়ার' পায়ের দিকে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে ক্ষৌরী করার জন্য নাপিত আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি শিয়রের দিকে খালি জায়গা দেখাইয়া বলিলেন: "ভাই! বস!" সে বলিল: "আমি শিয়রের দিকে বসিতে পারি না। আপনি শিয়রের দিকে সরিয়া বসিলে আমি পায়ের দিকে বসিতে পারি।" তিনি বলিলেন: "তবে এখন চলিয়া যাও, যখন আমি শিয়রের দিকে বসিয়াছি দেখিতে পাও। তখন আসিয়া ক্ষৌরী করিও। আমি পায়ের দিক ছাড়িয়া শিয়রের দিকে যাইয়া বসিব, এত ঝামেলা এখন আমার দ্বারা হইবে না। "তখন অন্য একজন বুযুর্গ লোক তথায় বসিয়াছিলেন, তিনি নাপিতকে বলিলেন: "তুমিই বসিয়া যাও, তিনি এখন শিওরের দিকে বসিবেন না।" বন্ধুগণ! আমাদের পূর্বপুরুষদের অবস্থা তো এইরূপ ছিল।

।। আমলের উপযোগী দৃষ্টান্ত ।।

আমি যদিও কিছুই নই। কিন্তু আল্‌হামদুলিল্লাহ্! আমি আমার পূর্বপুরুষগণের কার্য পদ্ধতির 'আশেক'। উহারই ফলে বিগত রমযান শরীফে সর্বসাধারণ জামে মসজিদের ইমামত গ্রহণ করার জন্য আমার নিকট অনুরোধ জানাইল। অথচ আদিকাল হইতেই ইমামত এবং খোৎবা পাঠের পদ আমাদের শহরে খতিবদের বংশেই রহিয়াছে। আমি—তাঁহাদের মধ্যেই আছি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অন্য বংশের লোকই জামে মসজিদের ইমামতি করিতেছিল। আল্লাহ্‌র কসম, এই কারণে আমার মনে এক দিনের জন্যও কোন সময় বিরূপ কল্পনা আসে নাই যে, ইমামতের পদ অন্যের কাছে কেন থাকিবে? কিন্তু এখন কোন কারণে জনসাধারণ পূর্ব ইমামের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে এবং আমাকে ইমাম নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। আমি তাহাদিগকে পরিষ্কার বলিয়া দিয়াছি, পূর্ববর্তী ইমাম স্বয়ং আমাকে এজাযত না দেওয়া পর্যন্ত আমি ইমামতি করিতে পারি না। (ফলে ইমামের পক্ষ হইতে) তাহারা আসিয়া আমাকে অনুরোধ করিলে আমি মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া পরিষ্কার বলিয়া দিলাম। আমি এখন আপনাদের অনুরোধে ইমামতি কবুল করিতেছি এবং পরিষ্কার বলিতেছি যে, মানুষ সাধারণতঃ ইমামতিকে যেমন নিজের হক বলিয়া মনে করিয়া থাকে আমি তদ্রূপ ইহাকে নিজের হক মনে করি না। আমার বংশের কেহ ওয়ারিশী সূত্রে ইহার দাবীদারও হইতে পারিবে না। শুধু এখনকার জন্য আমিই ইমাম থাকিব, যতদিন আপনারা আমার ইমামতিতে সন্তুষ্ট থাকেন। আপনাদের মধ্যে এক ব্যক্তিও যদি অসন্তুষ্ট হয় চাই কি সে জোলাই হউক কিংবা তেলিই হউক। সে যখনই ডাকে আমার নামে একখানা কার্ড এই মর্মে ছাড়িয়া দিবে যে, "তুমি ইমামত ছাড়িয়া দাও" আমি সেই দিনই ইমামত ত্যাগ করিব। আল্লাহ্‌র শপথ—ইমামত, মিম্বর এবং ওয়াযের খাহেশ আমার নাই। মানুষ আমার নিকট হইতে মিম্বর এবং ওয়াযের কাজ লইতে থাকুক এবং যখন ইচ্ছা তাহা হইতে আমাকে নিষেধ করিয়া দেউক। আমার কোন হুজ্‌রাও যদি কাড়িয়া লওয়া হয় তাহাতেও আমার আফসুস্ থাকিবে না। আমি নিজের ঘরে কিংবা কোন জঙ্গলে বসিয়া খোদার যেকের করিতে থাকিব।

।। দুনিয়া ও ধর্মের শান্তির রহস্য ।।

দুঃখের বিষয় আজকাল আলেমদের মধ্যে এই বিষয়টি দেখা যায় না; বরং নানা স্থান হইতে আমার কানে আসিতেছে যে, তথায় ইমামতি লইয়া ঝগড়া-কলহ হইতেছে। ওয়ায লইয়া ঝগড়া হইতেছে। আসল ব্যাপার এই যে, উদ্দেশ্য হইল সম্মান ও মর্যাদা লাভ করা। তাহাতে অপর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়াইলেই অসন্তোষের

সৃষ্টি হয়। খোদার সম্মতি উদ্দেশ্য নহে। খোদার সম্মতি উদ্দেশ্য হইলে এসমস্ত ইমামতি এবং পদ মর্যাদা জানের উপর বোঝা বলিয়া বোধ হইত।

আমাদের হাজী ছাহেবের এক ঘটনা—এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট এই মর্মে এক খানা চিঠি লিখিল যে, আপনার অমুক মুরীদ এরূপ এরূপ কাজ করিতেছে। তাহাকে নিষেধ করিয়া দিন। অন্যথায় জনসাধারণ আপন'র প্রতি আস্থা ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ার আশংকা রহিয়াছে। হযরত জবাব দিলেনঃ ভাই! অপরের উপর কেন চাপাইতেছ। তুমি যদি শ্রদ্ধাহীন হইতে চাও, তবে হইয়া যাও, তোমাদের আস্থা হারাইবার কি ভয় তুমি আমাকে দেখাইতেছ? আমি তো খোদার কাছে এই কামনাই করি, মানুষ আমাকে ত্যাগ করুক। মরদুদ মনে করিয়া সকলে আমা হইতে আলাদা হইয়া যাউক। শুধু আমি থাকি আর আমার খোদা। তোমাদের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা তো আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এক মনে খোদার ধ্যান করিবারও ফুরসৎ পাইতেছি না। বস্তুতঃ আশেক কামনা করে যে, তাহার অবস্থা এইরূপ হউক:

چه خوش وقتے وخرم روزگارے + که یارے برخورد ز وصل یارے

"সেই সময়টুকু কতই না আনন্দের ও খুশীর—যখন প্রেমিক তাহার প্রিয়তমের মিলন-সুধা পান করে।"

ভাবিয়া দেখুন,যদি কাহারও এরূপ রুচি হয়,তবে পদ,ইমামত ও খ্যাতি তাহার নিকট ঘৃণেয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। আর যদি এরূপ রুচি না হয় এবং খ্যাতি লাভের লিপ্সা হয়,তবে তাহা লাভ করার এই পন্থা নহে যাহা আজকালের সাধারণ আলেমগণ অবলম্বন করিয়াছে। বরঞ্চ উহার পন্থাও নিজকে বিলীন করিয়া দেওয়া। নিজেকে যতই বিলীন করিতে চেষ্টা করিবে ততই খ্যাতি ছড়াইতে থাকিবে। অবশ্য খ্যাতি ছড়াইবার উদ্দেশ্যে নিজকে বিলীন করার চেষ্টাও নিন্দনীয় বটে। কিন্তু নিন্দনীয় হইলেও তাহাতে খ্যাতি অবশ্যই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে—যাহা তোমার কাম্য। এতদ্ভিন্ন আরও একটি উপকার এই হইবে যে, মুসলমানগণ তোমার দলাদলির ক্ষতি হইতে নিরাপদ থাকিবে। এই মর্মেই কোন কবি বলিতেছেন:

اگر شہرت ہوس داری اسیر دام عزلت شو + که در پرواز دارد گوشه گیری نام عنقارا

"যদি খ্যাতির লোভ কর, তবে নির্জন কুটিরে নিজকে বন্দী কর। নির্জনতা অবলম্বনের কারণেই ওনকার নাম জগতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।"

কিন্তু আমার বুঝে আসে না মানুষ সুখ্যাতির প্রত্যাশী হয় কেন? ইহাতে তাহারা কোন্ সৌন্দর্য দেখিতে পাইয়াছে? গভীর ভাবে চিন্তা করিলে তাহারা দেখিতে পাইবে – ইহার যথার্থতা শুধু এতটুকু যে,"মানুষ আমাকে বড় জানিবে।" ইহা নিছক একটি কল্পিত বস্তু। অতএব, ইহার লাভটুকু তো শুধু কল্পিত ও ধারণাপ্রসূত। কিন্তু উহার অনিষ্টকারিতা বাস্তবিক ও সুনিশ্চিত। এই মর্মেই মাওলানা রূমী বলেন:

اشتہار خلق بند محکم ست + بند ایں از بند آہن کے کم ست

چشمہا و خشمہا در شکہا + بر سرت ریزد چو آب از مشکہا

"সুখ্যাতি মানুষের জন্য একটি মজবুত বেড়ি। ইহার বন্ধনী লৌহ-বন্ধনী অপেক্ষা একটুও কম নহে। নানাবিধ আশা, ভীতি ও সন্দেহ মোশক হইতে পানি ঢালার ন্যায় তোমার মাথার উপর ঢালিতে থাকে।"

খ্যাতনামা লোকের প্রতি মানুষের হিংসা ও শত্রুতা জন্মে। তাহার পিছে লাগিয়া যায়। বস্তির উপর কখনও শত্রুর আক্রমণ হইলে সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধ লোক-দিগকে হত্যা করা হয়। অবিখ্যাত হাবা বোকাদের কেহই জিজ্ঞাসা করে না ; সুতরাং অবিখ্যাত থাকাতেই শান্তি। কবি বলেন :

خویش را رنجور ساز وزار زار + تا ترا بیروں کنند از اشتہار

"নিজেকে দুঃখ পীড়িত ও দুর্বল করিয়া রাখ, তাহা হইলে তুমি সুখ্যাতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।"

নিজেকে অখ্যাত ও গোপন করিয়া রাখ। দুনিয়ার শান্তিও ইহারই মধ্যে, আখেরাতের শান্তিও ইহারই মধ্যে। কেননা, অখ্যাত লোক একমনে নির্জনে বসিয়া আল্লাহ্র যেকের-ফেকের করার খুব সুযোগ পায়। আর নির্জন বসতির ফলে কল্ব্ খুবই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হইয়া থাকে। এসম্বন্ধে কবি বলেন :

قعر چہ بگزید ہر کو عاقل ست + زانکہ در خلوت صفا ئی ہا دل ست

"যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সে কূপের গভীর কন্দর অবলম্বন করে। কেননা, নির্জন স্থানে থাকিলে অন্তর স্বচ্ছ ও পরিষ্কার হয়।

॥ সাধারণ লোকের সংশোধনের উপায় ॥

তবে হাঁ, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে বিখ্যাত করেন এবং সে নিজে সুখ্যাতির প্রত্যাশী না হয়, তবে সে অপারগ এবং এই বাধকতার কারণে এই সুখ্যা-তিতে তাহার কোন ক্ষতিও হয় না। কেননা, গায়েব হইতে সে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি সুখ্যাতির প্রত্যাশী হইবে অবশ্যই সে সুখ্যাতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ইহার প্রমাণ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ছহীহ্ হাদীস। হুযূর (দঃ) আবদুর রহমান ইব্নে সামুরাহ্ নামক ছাহাবীকে বলিয়াছেন :

لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا (متفق عليه)

"নেতৃত্বের প্রত্যাশা করিও না। কেননা তোমার প্রার্থনানুসারে যদি তোমাকে উহা প্রদান করা হয়, তবে তোমাকে উহার হাতে সপর্দ করা হইবে। (আল্লাহ্র তরফ

হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না) আর তোমার প্রার্থনা ব্যতীত যদি এমনিই তোমাকে নেতৃত্ব প্রদান করা হয়, তবে উহা রক্ষা করার জন্য গায়েব হইতে তোমাকে সাহায্য করা হইবে। (বোখারী ও মুছলিম)

এই বিষয়টি আমি এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিলাম যে, আমি শুনিতে পাইলাম, এই শহরে ইমামতি প্রভৃতি লইয়া খুব ঝগড়া হয়। অতএব, আলেম সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য—যদি একজন লোকও তাঁহাদের কাহারও ইমামতিতে অসন্তুষ্ট থাকে তৎক্ষণাৎ তিনি ইমামতি ত্যাগ করেন। অতঃপর ইন্‌শা আল্লাহ্ সেই অপসারণকারীই অতি সত্বর সম্মুখে আসিয়া হাত জোড় করিবে। স্মরণ রাখিবেন! আলেম সম্প্রদায় যে পর্যন্ত ধন-দৌলত ও মান-মর্যাদার মোহ ত্যাগ না করিবেন, সে পর্যন্ত সর্বসাধারণের সংশোধন হইতে পারে না। সাধারণের দৃষ্টিতে ধর্মের সম্মান বা মর্যাদাও হইতে পারে না।

এই বর্ণনা খুবই দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। সময়ও অনেক্ষণ অতীত হইয়াছে, কিন্তু আশা করি, সবকিছু প্রয়োজনের অনুরূপই বর্ণনা করা হইয়াছে। আজিকার ওয়াযে সকল সম্প্রদায়কে স্পর্শ করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া সকলের নিকটই তিক্ত বোধ হইবে। কিন্তু তিক্ত হইলেও মসলাযুক্ত, স্বাদ-শূন্য তিক্ত নহে; বরং এই তিক্ততা তামাক এবং আফিমের তিক্ততার ন্যায়। একবার কেহ ইহার তিক্ততা বরদাশ্‌ত করিয়া লইলে অতঃপর সে সারা জীবনের জন্য একেবারে অনুগত ভৃত্য হইয়া পড়িবে। এইরূপে এই ওয়াযটির তিক্ততা একবার বরদাশ্‌ত্ করিয়া লউন। অতঃপর 'ইনশা আল্লাহ্' সারাজীবন ব্যাপী আমাকে দোআ করিতে থাকিবেন।

॥ কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ সূক্ষ্মতত্ত্ব ॥

এখন আমি পুনরায় আলোচ্য আয়াতটি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা আয়াত দুইটিতে এই ভুলটি দুর করিয়া দিয়াছেন—যাহা কেহ কেহ মনে রাখিয়াছেন যে, কোরআনের শুধু ভাবার্থ ই মুখ্য উদ্দেশ্য, এই ধারণা ভুল। কেননা আলাহ্ তা'আলা কোরআনের আয়াতসমূহকে "কোরআন এবং কিতাব" আখ্যা দান করিয়াছেন। ইহার অর্থ—কোরআনের আয়াতসমূহ লেখা ও পড়ার উপযোগী। বলা বাহুল্য, লেখা ও পড়া শব্দের সহিতই সংশ্লিষ্ট। নিরেট এ অর্থের সঙ্গে লেখা বা পড়ার কোন সম্পর্ক নাই।

এখানে একটি সূক্ষ্মকথা আছে—এক আয়াতে قرآن শব্দকে كتاب শব্দের আগে এবং অন্য আয়াতে كتاب শব্দকে قرآن শব্দের আগে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—এক হিসাবে কোরআনের শব্দ সমষ্টি অধিক উদ্দেশ্যমূলক আর এক হিসাবে ভাবার্থের সমষ্টি অধিক উদ্দেশ্যমূলক। এই সূক্ষ্মতত্ত্বটির সন্ধান এইরূপে পাওয়া যায় যে, পড়ার উপযোগী বস্তু হইতেছে শব্দ, আর শব্দগুলির নিকটতম

বোধগম্য বস্তু হইল অর্থ। আর লেখার বিষয় হইল শব্দগুলির নক্‌শা বা ছবি এবং উহার নিকটতম বোধগম্য বস্তু হইতেছে শব্দ, আর ভাবার্থ হইতেছে উহার দুরবর্তী বোধগম্য। অতএব, তেলাওয়াতকালে শব্দের উচ্চারণের সাথে সাথে প্রথম দফায়ই ভাবার্থের দিকে মন ধাবিত হয়। আর লেখার বেলায় প্রথম মনের আকর্ষণ হয় শব্দের দিকে, অতঃপর শব্দের মাধ্যমে অর্থের দিকে। আর উদ্দেশ্যমূলক হওয়ার অর্থ এই বোধগম্য হওয়াই বটে। সুতরাং তেলাওয়াতের মধ্যে অধিক আকর্ষণ অর্থের দিকেই বুঝা যাইতেছে এবং লেখার বেলায় মনের অধিক আকর্ষণ শব্দের দিকে থাকে। অতএব, সম্পূর্ণ বর্ণনার মধ্যে এই ইঙ্গিতই পাওয়া যাইতেছে যে, শব্দগুলিও এই পর্যায়ের উদ্দেশ্যযুক্ত যে, সর্বদিক দিয়া ভাবার্থ শব্দ হইতে অধিক উদ্দেশ্য, শুধু ভাবার্থই মুখ্য উদ্দেশ্য, এই ধারণা ভুল।

এই স্থান হইতে আরও একটি মাসআলা জানা যাইতেছে,যাহা সম্বন্ধে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। অর্থাৎ, কোরআন শরীফ দেখিয়া 'নযরানা' তেলাওয়াত করা ভাল, না মুখস্থ পড়া ভাল। যাঁহারা মুখস্থ পড়াকে ভাল মনে করেন, তাঁহারা বলেন, ইহাতে অনুধাবনের সুযোগ অধিক হয়। অন্য কোন মাধ্যম ব্যতীত শব্দ হইতে সরাসরি অর্থের দিকে মন ধাবিত হয়। আর শব্দের নক্‌শা সম্মুখে থাকিলে নক্‌শা হইতে শব্দের দিকে এবং শব্দের মাধ্যমে অর্থের দিকে মন রুজু করে। আবার কেহ কেহ কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়াকে ভাল মনে করেন। কেননা, ইহাতে মনোযোগ আকর্ষণের বিভিন্ন দিক রহিয়াছে। নক্‌শার মাধ্যমে শব্দের প্রতি এবং শব্দের মাধ্যমে অর্থের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। অতএব, এখানে বিভিন্ন প্রকারের এবাদত হইতেছে। এই বিভিন্নতা হইতেছে মাদ্‌লুল তথা লক্ষ্যণীয় বস্তুর প্রেক্ষিতে। (কেননা, নকশার প্রতি দৃষ্টি করিলে শব্দের দিকে লক্ষ হয় এবং শব্দের দিকে লক্ষ করিলে অর্থের দিকে লক্ষ হয়।) আবার বোধগম্য বস্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারীর পরিপ্রেক্ষিতেও বিভিন্ন প্রকারের এবাদত হয়। নক্‌শার প্রতি দৃষ্টি করিলে চক্ষুর এবাদত,শব্দ উচ্চারণে রসনার এবাদত। ইহাতে দুইটি এবাদত এক সঙ্গে হইয়া যায়। হুযুর (দঃ) বলিয়াছেন:

قِرَاءَةُ الرَّجُلِ الْقُرْآنَ فِيْ غَيْرِ الْمُصْحَفِ اَلْفُ دَرَجَةٍ وَقِرَاءَتُهُ فِي الْمُصْحَفِ تُضْعَفُ عَلٰى ذٰلِكَ اِلٰى اَلْفَيْ دَرَجَةٍ *

"মানুষ কোরআন শরীফ না দেখিয়া তেলাওয়াত করিলে এক হাজার সওয়াব প্রাপ্ত হয়। আর কোরআন শরীফ দেখিয়া পড়িলে দুই হাজার সওয়াব পায়। —বায়হাকী)

এস্থলে আরও একটি রহস্য আছে। অর্থাৎ,কোরআনের হেফাযতে এক হিসাবে নির্ধারিত শব্দগুলির গুরুত্ব অধিক। কেননা, খোদা না করুন,যদি দুনিয়ার সমস্ত কোরআন শরীফ ধ্বংস হইয়া যায়, তবে কোরআনের শব্দ সমষ্টির হাফেযগণ কোরআনকে

পুনরায় একত্রিত করিতে পারেন। আবার অন্য হিসাবে নক্শা অর্থাৎ, অক্ষরসমূহের দাগচিহ্ন অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা যাইতে পারে। কেননা, কোরআনের শব্দ লইয়া মতভেদ দেখা দিলে, কোরআন শরীফের লেখা দেখিয়া মীমাংসা করা যাইতে পারে। অতঃপর, "مبين" অর্থাৎ 'স্পষ্ট' শব্দটির মধ্যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, কোরআনের পঠন এবং লিখন উভয়ই খুব প্রকাশ্যও স্পষ্ট হওয়া উচিত। এই জন্যই ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ কোরআন শরীফের সাইজ ছোট করিতে নিষেধ করিয়াছেন; বরং তেলাওয়াতের জন্য যে সমস্ত কোরআন শরীফ ছাপান হয়—উহার সাইজ বড় হওয়া মুস্তাহাব, যেন লেখাগুলি খুব পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়। কিন্তু হামায়েল শরীফের মত মধ্যম সাইজ হইলেও ক্ষতি নাই। কেননা, সফরে কোরআন শরীফ সঙ্গে লইতে সহজ হয়। তবে আজকাল তাবীযের আকারে যে সমস্ত ক্ষুদ্র সাইজের কোরআন শরীফ প্রকাশিত হইয়াছে, নিঃসন্দেহে উহা মাকরূহ।

॥ হুরূফে মুকাত্তাআতের রহস্য ॥

এখন হুরূফে মুকাত্তাআত অর্থাৎ, পৃথক পৃথক হরফগুলির রহস্য বর্ণনা করিতেছি। যাহা আলোচ্য আয়াতগুলির প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি ইহাদের দ্বারাও আমার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমার বক্তব্য প্রমাণ করিব। হুরূফে মুকাত্তাআতের মধ্যে অনেক প্রকারের রহস্য আছে। একটি রহস্য এই যে, এইগুলি আল্লাহ্ ও রাসূলের মধ্যে কতকগুলি গুপ্ত রহস্য। হুযূর (দঃ) ইহাদের অর্থ জানিতেন। কিন্তু তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। কেননা, মহান শরীঅতের বিধানাবলীর সহিত ইহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। অবশ্য অন্যান্য বিভাগের সহিত সম্পর্ক আছে। সে সমস্ত বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ফেরেশ্তাগণ ও আম্বিয়ায়ে কেরামের নিকট উক্ত রহস্যসমূহ প্রকাশ করা হইয়াছে। সাধারণ উম্মতবৃন্দের সহিত কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তাহা আমাদিগকে জানান হয় নাই।

এক সময়ে পড়াইবারকালে ছাত্রদের সম্মুখে 'হুরূফে মুকাত্তাআত' সম্বন্ধে আমি এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণনা করিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে জনৈক কোর্ট ইন্স্পেকটার তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনি সত্য বলিয়াছেন। বাস্তবিকই প্রত্যেক বিভাগের কতক গুপ্ত রহস্য আছে। যাহা অন্য কোন বিভাগের লোককে জানান হয় না।" আমি বলিলাম, "আপনি তো এমনভাবে সমর্থন করিতেছেন, যেন আপনি ইহার ভুক্তভোগী। সে বলিল, "জী হাঁ, ইতিমধ্যেই আমাকে এরূপ এক ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। একদিন আমি পুলিশ ইন্স্পেকটারের বাংলোয় গিয়াছিলাম। তাঁহার টেবিলের উপর একখানি খাতা দেখিয়া আমি একটু পড়িব মনে করিয়া হাতে লইতেই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার হাত হইতে উহা লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইহা আপনার দেখিবার বিষয় নহে। ইহাতে গুপ্ত পুলিশদের

ব্যবহার্য কতকগুলি সাংকেতিক পরিভাষা রহিয়াছে। অপর কোন বিভাগের লোককে ইহা জানিতে দেওয়া হয় না। সি, আই, ডি, বিভাগের লোকেরা এ সমস্ত সাংকেতিক পরিভাষায় টেলিগ্রাম যোগে একে অন্যকে সংবাদ আদান প্রদান করিয়া থাকে। আর কাহারও এই গোপন সংকেত জানিবার অধিকার নাই।" কোর্ট ইন্‌স্পেকটারের ঘটনা শুনিয়া আমার মনে খুবই আনন্দ হইল। দেখিলাম জাগতিক কার্যকলাপেও আমার একথার নযীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

হুরূফে মুকাত্তাআতের আর একটি তাৎপর্য আমার মনে এইমাত্র উদয় হইয়াছে। তাহা এই যে, সম্ভবতঃ হুরূফে মুকাত্তাআতগুলি দ্বারা আমাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, কোরআনের ভাবার্থই কেবল মুখ্য উদ্দেশ্য নহে ; বরং উহার শব্দগুলিও অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা, কোরআনে এমনও কতকগুলি শব্দ আছে—যাহার অর্থ কেহই জ্ঞাত নহে। যদি শুধু অর্থই উদ্দেশ্য হইত, তবে অর্থ নাজানা শব্দ কোরআনে কেন থাকিবে ? অথচ তাহা কোরআনেরই অংশ। উহাকে 'কোরআন নয়' বলিয়া বিশ্বাস করিলে কাফের হইতে হইবে। উহাতে আরও একটি রহস্য এই রহিয়াছে যে, হুরূফে মুকাত্তাআতগুলিতে একক, দশক ও শতক অর্থবোধক হরফগুলিকে একত্রিত করা হইয়াছে। কোন কোন আহ্‌লে কাশফ (অন্তর দৃষ্টি সম্পন্ন মহাপুরুষ) উক্ত হরফগুলির সাহায্যে কোন কোন অনাগত আকস্মিক বিপদাপদের ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ প্রমাণও পেশ করিয়াছেন। উহা একটি স্বতন্ত্র বিদ্যা। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রহস্য আছে।

আমার আনুপূর্বিক বর্ণনার সারমর্ম এই যে, কোরআনের শুধু অর্থকেই মুখ্য বস্তু এবং শব্দগুলিকে বেকার মনে করিবেন না এবং শব্দ গুলিকেও মুখ্য বস্তু মনে করিয়া অর্থকে বেকার সাব্যস্ত করিবেন না ; বরং কোরআনের শব্দ এবং অর্থ এবং উভয়কে মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। এই কারণেই ওছুল শাস্ত্রবিদগণ কোরআনের সংজ্ঞা বর্ণনায় বলিয়াছেন : اَلْقُرْاٰنُ اِسْمٌ لِلنَّظْمِ وَالْمَعْنٰى جَمِيْعًا "শব্দ এবং অর্থের সমষ্টির নাম কোরআন।" আর হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) হইতে নামাযের মধ্যে ফারসী ভাষায় কেরাআত পড়া জায়েয বলিয়া যে বর্ণনা পাওয়া যায়, ইহার ভিত্তি একথার উপর নহে যে, তিনি কেবল অর্থকেই কোরআন মনে করিতেন ; বরং উহার ভিত্তি অন্য কিছুর উপর যাহা ওছুল শাস্ত্রবিদগণ বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তদুপরি ইমাম সাহেবের এই মত প্রত্যাহারকৃত, তিনি পরে তাঁহার এই মত পরিবর্তনও করিয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ মত কোন যুক্তি বা প্রমাণ স্বরূপ উত্থাপন করা যাইতে পারে না। ফলকথা, বিশুদ্ধ ধর্ম উহাকেই বলা যাইবে যাহাতে ভিতর এবং বাহির দুই-ই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং কোরআনের অবস্থাও তদ্রূপই মনে **করিতে হ**ইবে। এসম্বন্ধে কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন :

بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد + برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب معنی را

"ক্বোরআনের সৌন্দর্য জগতের বসন্ত মন প্রাণকে সতেজ ও প্রফুল্ল করিয়া তোলে। বাহ্যিক রূপ দর্শনকারীদিগকে বাহিরের রূপ দ্বারা এবং আভ্যন্তরীণ গুণগ্রাহীদিগকে সুগন্ধ দ্বারা।"

আমি সম্ভবতঃ আগেও বলিয়াছিলাম। এখনও আবার বলিতেছি,আপনারা কি কেবল বিবীর গুণ বিবেচনা করিয়াই বিবাহ করেন, না রূপের প্রতিও লক্ষ্য করেন? নিশ্চিতরূপে বলা যায় আপনারা রূপ এবং গুণ উভয়ের বিচার করিয়া থাকেন। তবে কেবল ধর্মের বেলায়ই বাহিরের আকৃতি অকর্মণ্য হইয়া পড়িল কেন। কেহ কেহ আমার এই উক্তির বিপরীতার্থ বোধক একটি বয়েত মাওলানা রূমীর বলিয়া চালাইয়াছেন।

من زقرآں مغز را برداشتم + استخوان را پیش سگاں بگذاشتم

"আমি ক্বোরআনের মগজ অর্থাৎ সারমর্ম উঠাইয়া লইয়া হাড়গুলি কুকুরের সম্মুখে ত্যাগ করিয়াছি।"

খুব ভালরূপে শ্রবণ করুন এই বয়েতটি মাসনবী কিতাবের নহে। জানিনা কোন্ শায়েরের এই বয়েতটি রচনা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাকে কোন প্রমাণ রূপে দাঁড় করা যাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন বয়েতটি যাহারই হউক না কেন, শরীয়তের দলিল বিদ্যমান থাকিতে বয়েত দ্বারা প্রমাণ গ্রহণ করা জায়েয হইবে কেন? বরং বয়েতটিরই অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া লওয়া ওয়াজেব হইবে, অবশ্য যদি তাহা কোন নির্ভরযোগ্য শায়েরের বয়েত হইয়া থাকে। অন্যথায় উহা গ্রহণযোগ্যই নহে। বস্তুতঃ ক্বোরআনে শব্দ এবং অর্থ উভয়ই মগজ বা সার পদার্থ। ইহাতে ফল বা আঁটি বলিতে কিছুই নাই। ক্বোরআনের শান এইরূপ :

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم + کرشمۂ دامن دل می کشد کہ جا اینجا ست

"মাথা হইতে পা পর্যন্ত যেখানেই দৃষ্টিপাত করি ভ্রূভঙ্গীতে আমার অন্তর আকর্ষণ করিয়া বলে, এই স্থানই স্থান।"

সুন্দর লোকের প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গী মনমুগ্ধ কর হইয়া থাকে। তাহার কোন কিছুই অতিরিক্তও নহে অনর্থকও নহে; বরং উহার কোন বস্তুর অভাব ঘটিলে সৌন্দর্যই ত্রুটিযুক্ত হইয়া পড়িবে।

এখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করিলাম। তজ্জন্য ক্ষমা চাহিতেছি (সভাস্থল হইতে আওয়ায আসিল,মারহাবা,মারহাবা জাযাকাল্লাহ্, আপনার যতক্ষণ ইচ্ছা বর্ণনা করুন। আমরা সকলেই আগ্রহান্বিত। তিনি বলিলেন :) বসুন, এখন আমি শেষ করিয়াছি। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোআ করুন। তিনি যেন আমাদিগকে আমলের তাওফীক এবং সুবুদ্ধি দান করেন।

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ❋

তা'মীমুত্ তা'লীম

(শিক্ষা ব্যাপক করণ)

হিজ্রী ১৩৪০ সনের ২১শে জুমাদাস্সানী মুযাফ্ফর নগর মাহ্মুদিয়া মাদ্রাসায় বসিয়া "শিক্ষার ব্যাপক করণ" সম্বন্ধে হযরত থান্বী (রঃ) এই ওয়ায করেন। উক্ত সভায় ওলামা, তোলাবা এবং আধুনিক শিক্ষিত প্রায় ৬০০ ছয় শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। হযরত মাওলানা যাফর আহ্মদ ওস্মানী ছাহেব উহা লিপিবদ্ধ করেন। সাড়ে চারি ঘণ্টায় এই ওয়ায শেষ হয়।

●

সাধারণ লোকেরা দ্বীনী এল্মকে আরবী ভাষাতেই সীমাবদ্ধ মনে করিয়াছে। আরবী ভাষা শিখিবার অবসর প্রত্যেকের নাই। তাই বলিয়া তাহারা উর্দু ভাষার মাধ্যমেও দ্বীনী মাস্আলাগুলি শিক্ষা করে নাই। উর্দু ভাষার মাস্আলা শিখিয়া লওয়াকে তাহারা এল্ম বলিয়াই মনে করে না। অথচ উর্দু ভাষায় দ্বীনী এল্ম শিক্ষা করিলে সেই ফযীলত এবং সওয়াবই হাছেল হইতে পারে, যাহা এল্ম শিক্ষা করা সম্বন্ধে হাদীসসমূহে ও কোরআন শরীফে বর্ণিত আছে।

●

خطبۂ ماثورہ

بسم الله الرحمن الرحيم ط الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد *

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم ط ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ط ولقد علموا لمن اشترنه ما له فى الاخرة من خلاق قف ولبئس ما شروا به انفسهم ط لوكانوا يعلمون ٥ ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ط لوكانوا يعلمون *

ভূমিকা

এই আয়াত দুইটির প্রথম খণ্ড একটি বড় আয়াতের অংশ, ইহাতে একটি কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, পূর্ণ আয়াতটি আমি এই জন্য পাঠ করি নাই যে, যে বিষয়টি এখন আমার বর্ণনা করা উদ্দেশ্য তাহা উহাতে নাই। তাহা কেবল এই অংশেই আছে যাহা আমি তেলাওয়াত করিয়াছি, যদিও পূর্ণ আয়াতে বর্ণিত কাহিনীটিও জরুরী। বস্তুতঃ কোরআনের কোন অংশই অনাবশ্যক নহে। কিন্তু বিশেষ সময়ও বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য আয়াতের কোন একটি অংশকেও অবলম্বন করা হয়। এই কারণেই আমি গোটা আয়াতটি পাঠ করি নাই; বরং উহার শেষের অংশটুকু মাত্র পড়িয়াছি, তবলীগের জন্য এরূপ করা জায়েয আছে। স্বয়ং হুযূরে আকরাম (দঃ)-ও কোন কোন সময় প্রমাণের স্থলে কোন আয়াতের অংশ বিশেষ পাঠ করিতেন, কিন্তু নামাযের মধ্যে এরূপ করা উচিত নহে যে, একটি আয়াতের মাঝখান হইতে পড়া আরম্ভ করা কিংবা আয়াতের মধ্যস্থলে পড়া শেষ করা। নামাযের মধ্যে পূর্ণ আয়াত বরঞ্চ পূর্ণ সূরা পাঠ করা উচিত। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, লম্বা লম্বা সূরা পড়িবে, যাহাতে মুক্‌তাদীদের কষ্ট হইবে; বরং ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ যে সময়ের জন্য যে পরিমাণ পাঠ করা সঙ্গত বলিয়াছেন, সেই পরিমাণ সূরাই পাঠ করিবেন। নামাযের মধ্যে কোরআন শরীফ পাঠ করার নিয়ম এইরূপ। কিন্তু ওয়ায-নছীহতের বেলায় কোন আয়াত মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করা, কিংবা আয়াতের মাঝখানে পড়া বাদ দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। আমি পুর্ণ আয়াত না পড়িয়া অংশবিশেষ পাঠ করার কারণ ইহাই।

তবে একটি কথা। এখন আমি এই আয়াতাংশটি কেন অবলম্বন করিলাম? কারণ, যদিও কোরআনের যাবতীয় বিষয়-বস্তুই প্রয়োজনীয় এবং এই কারণে সেই কেস্‌সাটিও জরুরী যাহা গোটা আয়াতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু এখন আমি এল্‌মে দ্বীন শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি এলমী মাদ্রাসার মধ্যে ওয়ায করিতেছি। সুতরাং এল্‌ম সম্বন্ধেই কিছু বর্ণনা ও আলোচনা করা সঙ্গত। আর তালেবে এল্‌মদিগকে এল্‌মের বিভিন্ন প্রকার হক সম্বন্ধে অবহিত করা এবং এল্‌মের হক পালনে তাহারা যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি করিতেছে, উহার সংশোধন করিয়া দেওয়া উচিত।

॥ যাদু বিদ্যা ॥

এখন আমি যেই বিশেষ প্রণালীতে এল্‌মের বর্ণনা করিতে চাহিতেছি তাহা আমার তেলাওয়াতকৃত আয়াতের শেষ ভাগে বর্ণিত আছে, অনুবাদের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ

"তাহারা এমন বিদ্যা শিক্ষা করে যাহা তাহাদের জন্য ক্ষতিকর এবং তাহাদের কোনই উপকারে আসে না।" ইহারা ইহুদী সম্প্রদায়, আর তাহারা যে বিদ্যা শিক্ষা করিত তাহা যাদু-বিদ্যা। উপর হইতে বিভিন্ন প্রকারে ইহুদীদের নিন্দাবাদ বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রসঙ্গে ঐসমস্ত লোকের নিন্দাবাদও বর্ণিত হইয়াছে, যাহারা যাদু ব্যবসায়ে লিপ্ত রহিয়াছে,এ সম্পর্কেই হারূত মারূতের কিস্‌সাও বর্ণিত হইয়াছে। যদিও আমার ওয়াযের সহিত এই কিস্‌সাটির সম্পর্ক বেশি নাই। তথাপি যোগ-সূত্র স্থাপনের নিমিত্ত উহার উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করি।

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ج وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ط وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ط فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ط وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ※

"আর তাহারা অনুসরণ করিত ঐ এলমের যাহা শয়তানরা হযরত সোলায়মানের (আঃ) রাজত্বকালে পাঠ করিত। সোলায়মান কাফের ছিলেন না; বরং শয়তানরাই কাফের ছিল, যেহেতু তাহারা মানুষকে যাদু-বিদ্যা শিখাইত। আর তাহারা অনুসরণ করিত ঐ যাদু-বিদ্যার যাহা বাবেল শহরে হারূত মারূত নামক দুই ফেরেশ্‌তার উপর নাযিল করা হইয়াছিল। তাহারা দুইজন ততক্ষণ পর্যন্ত কাহাকেও কিছু শিখাইত না যতক্ষণ না এই কথা বলিয়া দিত যে, "আমরা তোমাদের জন্য 'আযমাইশ'। অতএব, তোমরা কাফের হইও না। অতঃপর মানুষ তাহাদের নিকট হইতে এমন যাদু-বিদ্যা শিখিত যদ্দারা তাহারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইত। প্রকৃত পক্ষে তাহারা উক্ত যাদু দ্বারা আল্লাহ্‌র হুকুম ভিন্ন কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারিত না।" ইহার পরেই আয়াতের সেই অংশ রহিয়াছে, যাহা আমি প্রথমে তেলাওয়াত করিয়াছিলাম। এই আয়াতগুলির উদ্দেশ্য ইহুদীদের নিন্দাবাদ করা। কেননা, তাহাদের মধ্যে যাদু-বিদ্যার চর্চা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল এবং তাহারা এই বিদ্যায় বিশেষ বিচক্ষণ ছিল। তাহারা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপরও যাদু করিয়াছিল। হুযূরের উপর উহার ক্রিয়াও হইয়াছিল। অতঃপর ওহীর দ্বারা হুযূরকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, অমুক ব্যক্তি আপনার উপর যাদু করিয়াছে, যেমন সূরা-ফালাকে সেদিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে: وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ অর্থাৎ, "আপনি বলুন,

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি (আল্লাহ্‌র নিকট) ঐ সমস্ত স্ত্রীলোকের অনিষ্টকারিতা হইতে, যাহারা গিরাসমূহে মন্ত্র পড়িয়া পড়িয়া ফুৎকার প্রদানকারিণী। বিশেষ করিয়া গিরায় ফুৎকার প্রদানের কথা এখানে উল্লেখ করার কারণ এই যে, হুযূরের প্রতি যে যাদু করা হইয়াছিল তাহা এই প্রকারের যাদু ছিল যে, তাহারা এক খণ্ড ধনুকের ছিলায় এগারটি গিরা দিয়াছিল এবং প্রত্যেকটি গিরায় যাদু-মন্ত্র পড়িয়া ফুৎকার দিয়াছিল। আর খাছ করিয়া এখানে মেয়েলোকদের কথা এই জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই ঘটনায় স্ত্রীলোকেরাই হুযূরের উপর যাদু করিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, কিছু অভিজ্ঞতার দ্বারা এবং কতকটা বিজ্ঞান শাস্ত্রের সাহায্যে বুঝা যায় যে, স্ত্রী-লোককৃত যাদু অধিক ক্রিয়া করিয়া থাকে। কেননা, যাদুর মধ্যে কল্পনা-শক্তির প্রভাব অধিক, উহা বৈধ যাদুই হউক অথবা অবৈধ যাদুই হউক!

॥ নিয়তের প্রভাব ॥

যাদু দুই প্রকার। হারাম যাদু। কথ্য ভাষায় সাধারণতঃ ইহাকেই যাদু বলা হয়। আর হালাল যাদু। যেমন, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবীয তুমার প্রভৃতি। আভিধানিক অর্থে এই সমস্তকে যাদু বলা যায়, তবে এইগুলিকে হালাল যাদু বলা হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাবীয এবং মন্ত্র-তন্ত্র প্রভৃতি সকল অবস্থায় হালাল নহে; বরং ইহারও বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। যদি উহাতে আল্লাহ্‌র নামের সাহায্য লওয়া হয় এবং উদ্দেশ্য বৈধ হয়, তবে এরূপ যাদু আমল করা জায়েয। কিন্তু নাজায়েয উদ্দেশ্যে আমল করা হইলে তাহা হারাম। আর যদি শয়তানের সাহায্য লওয়া হয়, তবে উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, তাহা একেবারেই হারাম। কেহ কেহ ধারণা করে—যদি উদ্দেশ্য সৎ হয়, তবে শয়তানের সাহায্যে যাদু করাও জায়েয। ইহা সম্পুর্ণ ভুল। খুব অনুধাবন করুন।

এখান হইতে একটি কথা জানা গেল যে, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ, যাবতীয় কাজের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। হাদীসটির হুকুম সকল অবস্থায় প্রয়োজ্য নহে। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সদুদ্দেশ্যে হারাম কাজ করাও জায়েয হইবে। হারাম কাজ যে উদ্দেশ্যেই করা হউক না কেন তাহা হারামই থাকিবে; বরং এই হাদীসটি মুবাহ কাজ এবং এবাদতের সঙ্গে নির্দিষ্ট; অর্থাৎ মুবাহ কাজ যদি ভাল নিয়তে করা হয়, তবে সওয়াব আছে। আর মন্দ উদ্দেশ্যে করিলে তাহাতে গোনাহ্ হইবে। এতদ্ভিন্ন কোন ফরয এবং ওয়াজেব কার্য নিয়ত ব্যতীত শুদ্ধ হয় না।

সারকথা এই যে, উদ্দেশ্যের আগে উহা সিদ্ধ করার উপায় এবং উছিলা যাচাই করিয়া লওয়া আবশ্যক। যদি উপায়টি জায়েয প্রকারের হয়, যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নামের সাহায্য লওয়া। তবে অবশ্য উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। উদ্দেশ্য

ভাল হইলে, তদবস্থায় তাবীয এবং যাদু মন্ত্র ইত্যাদিকে জায়েয বলা হইবে। আর যদি উদ্দেশ্য অসৎ এবং না-জায়েয হয়, তবে উহাকে হারাম বলা হইবে। আর যদি উপায় উপকরণই হারাম হয়, যেমন, শয়তানের নামের সাহায্য লওয়া। তবে উদ্দেশ্য যেমনই হউক না কেন, তাহা হারামই থাকিবে। উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন, যেমন কাহারও উদ্দেশ্য নামাযের জন্য মানুষকে একত্রিত করা এবং এই উদ্দেশ্যে সে একটি নাচ গানের আসর জমাইল—যেন নাচ দেখিবার আগ্রহে মানুষ একত্রিত হয় এবং নামায পড়িয়া লয়। এস্থলে তাহার উদ্দেশ্য যদিও খুবই প্রশংসনীয়, কিন্তু উহার জন্য হারাম উপায় অবলম্বন করিল; সুতরাং এই ব্যবস্থা হারাম বলিয়া গণ্য হইবে। এখন আপনি দেখিতে পাইলেন যে, যদ্যপি নামায আল্লাহ্ তা'আলার নিকট অতি প্রিয় কার্য কিন্তু উহার জন্যও যখন হারাম কার্যকে উছিলা করা হইল, তখনই শরীয়ত উহাকে হারাম সাব্যস্ত করিল, ইহা হইতেই এসমস্ত লোকের ভুল ধরা পড়িয়া যায়—যাহারা বলে যে, কাহারও উপকারার্থে তাবীয-তুমার বা মন্ত্র-তন্ত্র আমল করা সকল প্রকারে জায়েয, যদিও তাহাতে শয়তানেরই সাহায্য লওয়া হয়। ইহার কারণ এই বর্ণনা করে যে, মানুষের উপকারের জন্যই ত করা হইয়াছে। কাজেই ইহাতে দোষ কি?" আমি বলি নামাযের তুলনায় দুনিয়ার উপকার কিছুই নহে, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দুনিয়া ঘৃণিত এবং নামায অতীব প্রিয়, নামাযের জন্যই যখন হারাম উপায় অবলম্বন করা জায়েয নহে, তখন দুনিয়াবী উপকারের জন্য শয়তানের সাহায্য লওয়া কেমন করিয়া জায়েয হইবে।

মুসলমানের রুচি তো এইরূপ হওয়া উচিত, প্রত্যেক কাজে সর্বপ্রথম লক্ষ্য করিবে ইহার প্রতি খোদা তা'আলা রাযী কি না। যে কাজে খোদা রাযী নহেন তাহা তুচ্ছ, দুনিয়ার মঙ্গল তাহাতে যতই থাকুক না কেন। মুসলমানের নিকট খোদার সন্তুষ্টি হইতে উত্তম কোন কাজই নাই।

দেখুন, প্রিয়জন যদি নিজের প্রেমিকদের চপেটাঘাত করে আর তাহার অবাধ্য লোকদিগকে টাকা-পয়সা দান করে, এমতাবস্থায় প্রেমিকেরা কি কামনা করিবে? নিশ্চিতরূপে বলা যায়,টাকা-পয়সা লাভ করার জন্য কখনও তাহারা প্রিয়জনের অবাধ্য-তাচরণ করা পছন্দ করিবে না; বরং সে আনন্দের সহিত চড় খাওয়াই পছন্দ করিবে, কেননা, প্রিয়জনের সন্তুষ্টি ও খুশী ইহাতেই নিহিত আছে। এইরূপে খোদা-প্রেমিক খোদার সম্মানের মুকাবেলায় দুনিয়ার হিতাহিতের পরওয়া কখনও করিতে পারে না; বরং মাওলানা রূমী (রঃ)-এর ভাষায় খোদা-প্রেমিকের রুচি এইরূপ হইয়া থাকে:

نا خوش تو خوش بود بر جان من + دل فدائے یار دل رنجان من

هر کجا دلبر بود خرم نشین + فوق گردون ست نے قعر زمین

هر کجا یوسف رخے باشد چو ماه + جنت ست آن گرچه باشد قعر چاه

"তুমি আমাকে দুঃখ দিলেও তাহা আমার প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করে। মন আমার প্রাণে দুঃখ প্রদানকারী বন্ধুর জন্য উৎসর্গিত। আস্মানের উপরও বুঝি না—যমিনের অতল গহ্বরও বুঝি না—যেখানেই আমার প্রাণ-প্রিয়তম থাকিবে সেখানেই আনন্দ নিকেতন। চাঁদের ন্যায় ইউসুফের চেহারা যেখানেই থাকিবে তাহা কূপের গভীর তলদেশ হইলেও বেহেশ্ত তুল্য।"

॥ এশ্কের মর্যাদা ॥

এমন কি, প্রেমিকগণ তো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির মুকাবেলায় দোযখেরও পরোয়া করেন না। তাঁহাদিগকে দোযখে নিক্ষেপ করিয়াই যদি খোদা সন্তুষ্ট হন, তবে তাহাতেই তাঁহারা আনন্দিত থাকেন। তখন দোযখই তাঁহাদের জন্য বেহেশ্তে পরিণত হইবে। এই মর্মেই মাওলানা রূমী বলেন :

بے تو جنت دوزخ ست ای دلربا + با تو دوزخ جنت ست اے جانفزا

"হে মনোহারী! তোমা ব্যতীত বেহেশ্তও আমার নিকট দোযখ সমতুল্য। হে প্রাণ বল্লভ! তুমি সঙ্গে থাকিলে দোযখও আমার নিকট বেহেশ্তে রূপান্তরিত হইবে।"

কেহ এইরূপ মনে করিবেন না যে, ইহা কবিদের অতিরঞ্জন। একবার তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দিলেই সমস্ত বাহাদুরী দমিয়া যাইবে। অতএব খুব অনুধাবন করুন—ইহা অতিরঞ্জন নহে; বরং একান্ত সত্যকথা। এখনওআল্লাহ্‌র এমন মখলুক আছেন যাঁহারা খোদার খুশীর মুকাবেলায় দোযখের কোন পরওয়া করেন না।

দেখুন, যে সমস্ত ফেরেশ্তা অনুগত, ফরমাঁবরদার এবং সন্তোষ প্রার্থী তাঁহাদের মধ্যে একদল দোযখের দারোগা এবং কার্যনির্বাহক আছেন। তাঁহারা সর্বদা দোযখের মধ্যেই অবস্থান করেন। অবশ্য দোযখে তাঁহারা কোন প্রকার কষ্ট ভোগ করেন না। কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁহাদের চোখের সম্মুখে সর্বদা আগুনএবং ধুঁয়াই বিরাজমান। রক্ত এবং পুঁজের দৃশ্য। অতি নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর ছুরতওআকৃতি সাপ-বিচ্ছু ও অজগর প্রভৃতি বিদ্যমান। আর তাঁহাদের একদল বেহেশ্তের কার্যনির্বাহক সেখানে তাঁহাদের সম্মুখে সর্বদা বেহেশ্তেরসুরম্য দৃশ্যসমূহ রহিয়াছে। মনোহর ফুলের বাগানে সুন্দর সুন্দর ফুল এবং ফল। সুশীতল বায়ুরাশি। সুন্দর সুন্দর মুখাকৃতি। তদুপরি বেহেশ্তবাসীদের সাহচর্য যেখানে সকলেই সুসভ্য, শিষ্টাচারী ও মহান। পক্ষান্তরে—দোযখের দারোগা ফেরেশ্তাগণের সম্পর্ক এমন লোকের সঙ্গে—যাহাদের কথাবার্তায় কোন রস নাই। সর্বদা তিরস্কার, ভর্ৎসনা,অভিশাপএবং গালিগালাজ-ই চলিতে থাকে। যেমন আল্লাহ্ পাক বলেন : كلما دخلت امة لعنت اختها "যখনই উহাতে কোন দল প্রবেশ করে, তখনই সঙ্গিগণকে লা'নৎ ও অভিশাপ করে।"

তবে কি দোযখ এবং বেহেশ্‌তের এই রক্ষীবৃন্দের এ সমস্ত বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই ? অবশ্যই আছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও দোযখের দারোগাগণ দোযখে কোন কষ্ট ভোগ করেন কি ? কখনই না। যদি তাঁহাদিগকে বলা হয় যে, খোদার মরযী অবশ্য নাই, কিন্তু তোমরা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে বেহেশ্‌তের রক্ষণা-বেক্ষণকারী করিয়া দেওয়া যায়। সেখানে এমন সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, মনোহর উদ্যান এবং নহরসমূহ রহিয়াছে। সর্বোপরি সুসভ্য মহান লোকের সাহচর্য আছে। পরন্তু খোদার মরযী— তোমাদের এই বিশ্রী দৃশ্যপূর্ণ দোযখেরই রক্ষকরূপে নিযুক্ত থাকা। তখন তাঁহারা ইহাই বলিবেন ঃ

بے تو جنت دوزخ ست اے دلربا + باتو دوزخ جنت ست اے جانفزا

"তোমাবিহনে বেহেশ্‌তও হইবে দোযখ, হে প্রাণহারী। তুমিসহ দোযখও হইবে বেহেশ্‌ত, হে প্রাণবর্ধন।" তবে ফেরেশ্‌তাকূলের মধ্যে যখন এমনও এক সম্প্রদায় রহিয়াছেন যাঁহারা দোযখে অবস্থান করিয়া তেমনি সন্তুষ্ট, যেমন বেহেশ্‌তের রক্ষক ফেরেশ্‌তাগণ বেহেশ্‌তে থাকিয়া সন্তুষ্ট আছেন। অতএব, মানুষ জাতির মধ্যে খোদা প্রেমিক দলের অবস্থা যদি এইরূপ হয় তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে? কেননা, মানুষের মধ্যে তো এশ্‌ক্‌ এবং মহব্বতের উপকরণ সর্বাপেক্ষা অধিক। বরঞ্চ বলা যাইতে পারে যে, এশ্‌ক্‌ এবং মহব্বত মানুষের মাধ্যেই আছে। ফলকথা, ইহা কবিসুলভ অতিরঞ্জন নহে ; বরং সত্য কথা এবং বাস্তবিক কথাই তত্ত্ববিদগণের মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকে।

কবিসুলভ অতিরঞ্জন প্রসঙ্গে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িল। আমি যখন হযরত হাজী ছাহেব কেবলার দরবারে ছিলাম, তখন আমরা হযরতের নিকট মস্‌নবী কিতাব পড়িতাম। একদিন পড়িবার সময় তাওহীদের বিষয়বস্তু সম্বলিত এই বয়েতটি নযরে পড়িল ঃ

حمله شان پیدا و نا پیدا ست باد + آنچه نا پیدا ست هرگز کم مباد

"উহার আক্রমণ প্রকাশ্যে দৃশ্যমান—এবং বায়ু অদৃশ্য। যাহা অদৃশ্য তাহা যেন কখনও হ্রাস না পায়।"

এই কবিতাটি পাঠ করিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কেননা, এখানে "نا پید ا ست" শব্দের ভাবার্থ আল্লাহ্ তা'আলা। পূর্বের বয়েতগুলি পাঠ করিলে তাহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে। মাওলানা রূমী (রঃ) ইতিপূর্বে বলিয়াছেন ঃ জগতে যাহাকিছু ঘটে সবকিছুরই কর্তা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা। আর আমাদের দৃষ্টান্ত—বাঘের ছবি অঙ্কিত পতাকার ন্যায়। ঝাণ্ডা যখন বায়ু প্রবাহে আলোড়িত হইতে থাকে, তখন মনে হয়, বাঘটি যেন আক্রমণ করিতেছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে সেই বাঘ নড়িতেও পারে না, আক্রমণও করিতে পারে না ; বরং বায়ুর আলোড়নে উহাতে আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সেই নড়াচড়ার কারণেই আমরা দেখিতে পাই, বাঘটি যেন কাহাকেও আক্রমণ

করিতেছে। কিন্তু বায়ু আমরা দেখিতে পাই না ; বরং বাহিরে আমরা দেখিতে পাই বাঘটিই নড়িতেছে। আমাদের দৃষ্টান্তও তদ্রূপ। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের অস্তিত্ব কিছুই নহে ! কেবল আল্লাহ্ তা'আলার ক্রিয়ার ফলে বাহিরে আমরা কাজ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। যেমন, মাওলানা রূমী (রঃ) বলেন :

ما همه شیران ولے شیر علم + حمله شان از باد با شد دم بدم

"আমরা সকলেই বাঘ, কিন্তু পতাকায় অঙ্কিত বাঘ ; প্রতি মুহূর্তে বায়ুর আলোড়নে উহার আক্রমণ প্রকাশ পায়।" অতঃপর বলেন :

حمله شان پیدا ست و نا پید ا ست باد + آنچه نا پید است هر گز کم مباد

"অর্থাৎ, কবি বলেন (পতাকায় অঙ্কিত) বাঘের আক্রমণ তো বাহ্য দৃষ্টিতেই দেখা যায়, কিন্তু উহাতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বায়ু অদৃশ্য অর্থাৎ, দৃষ্টির অগোচর।" তারপর বলেন : "যাহা অদৃশ্য তাহা যেন কখনও কম না হয়।" এখানে অদৃশ্য বলিতে আল্লাহ্ তা'আলাকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এখানে সন্দেহ এই হয় যে, "কখনই যেন কম না হয়।" এরূপ দোআ আল্লাহ্ তা'আলার সম্বন্ধে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? ইহাতে আমি মনে করিয়াছিলাম, মাওলানা রূমী (রঃ) হয়ত কবিসুলভ প্রণালীতে এরূপ দোআ করিয়া থাকিবেন, যেমন মূসা (আঃ)-এর যমানার জনৈক আল্লাহ্গত প্রাণ ব্যক্তির ঘটনায় দেখা গিয়াছিল যে, তিনি এই শ্রেণীর বিষয়-বস্তুই, যাহা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য অসম্ভব উল্লেখ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ নিছক মহব্বতের প্রাবল্যের কারণে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত এমন ধরনের কথাবার্তা বলিতেছিলেন, যাহা কেবল দুনিয়ার প্রিয়জনকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা যাইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলার শান তাহা হইতে অনেক উর্ধ্বে, এইরূপে মাওলানা রূমী এই বয়েতে আল্লাহ্ ত'আলার জন্য যে দোআ করিয়াছেন আল্লাহ্ উহার মুখাপেক্ষী নহেন, তবে কেবল মহব্বতের প্রাবল্যেই মাওলানা রূমী (রঃ) বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, "যাহা অদৃশ্য ও গুপ্ত আল্লাহ্ করেন—তাহা যেন কম না হয়।" অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা নিরাপদে থাকেন।" ফলকথা, আমি এই বয়েতের নানাবিধ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোন ব্যাখ্যাই মনমত হইতেছিল না। কেননা, মাওলানা রূমীর (রঃ) মর্যাদা এ সমস্ত ব্যাখ্যা হইতে বহু উর্ধ্বে। তিনি এসমস্ত উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'আলা সম্বন্ধে এরূপ দোআ করিতে পারেন না। মাওলানা যদিও অতিশয় বড় "ছাহেবেহাল" কিন্তু মূসা (আঃ)-এর যমানার সেই খোদা-প্রেমিকের ন্যায় হালের দ্বারা তত প্রভাবান্বিত ছিলেন না। (কেননা, উক্ত খোদা-প্রেমিক হালের প্রাবল্যে ভাববিভোর হইয়া বলিতেছিল, "খোদাকে যদি পাইতাম, তবে মাথার চুল আঁচড়াইয়া সিঁথি কাটিয়া দিতাম, পা ধোয়াইয়া দিতাম ইত্যাদি।" কিন্তু মাওলানা রূমী এত জ্ঞানহারা হন নাই যে, খোদার জন্য যাহা সঙ্গত ও শোভনীয় নহে—তেমন দোআ করিবেন। হযরত

হাজী ছাহেব কেব্‌লার সম্মুখে যখন মসনবীর সবক আরম্ভ হইল, তখন তিনি এই বয়েতটি শ্রবণ করিয়া উহার ব্যাখ্যাস্বরূপ এমন একটি শব্দ বলিয়াছিলেন যে, উহা দ্বারা সমস্ত জটিল সন্দেহের অবসান ঘটিল এবং বুঝিতে পারিলাম ইহা মাওলানা রূমীর কবিসুলভ উক্তি নহে ; বরং প্রকৃত কথা।

حمله شاں پیدا است و نا پیدا ست باد + آنچه نا پیدا است هر گز کم مباد -

হযরত হাজী ছাহেব কেব্‌লা বলিলেন : 'از دل ما' অর্থাৎ, "আমাদের অন্তর হইতে যেন কম না হয়।" সোবহানাল্লাহ্! এই একটি মাত্র শব্দের দ্বারা কবিতাটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হইল ; বরং এরূপ বলা উচিত যে, কবিতাটির মধ্যে প্রাণ তো সঞ্চারিতই ছিল, কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি নাই। হাজী ছাহেবের ব্যাখ্যায় তথ্য প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এখন কবিতাটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে, 'যে বস্তু অদৃশ্য, আল্লাহ্ করেন—তাহা যেন আমাদের অন্তরসমূহ হইতে হ্রাস না পায়।' এখন আর কোন সন্দেহ রহিল না এবং বুঝা গেল যে, তত্ত্ববিদগণের কথা প্রকৃতই হয়। তবে তাহা বুঝিবার জন্যও তত্ত্বজ্ঞানী হওয়া আবশ্যক। এইরূপে আমাদের আলোচ্য কবিতায়ও অতিশয়োক্তি কিছু নাই।

بے تو جنت دوزخ است اے دلربا + با تو دوزخ جنت است اے جا نفزا -

কেননা, বাহাদুরীর প্রশ্ন তো তখনই আসিবে যদি দোযখে তাহার আযাবও হয় এবং সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষের দরুণ দোযখে আযাবই রহিল না। কারণ, খোদা-প্রেমিকদের নিকট একমাত্র খোদা হইতে বিচ্ছেদ থাকাই আযাব। আর খোদার সন্তোষ যদি দোযখেও তাহার সঙ্গে থাকে, তবে বিচ্ছেদ কোথায়? ইহাই তো যথার্থ মিলন। ফলকথা, খোদা-প্রেমিকগণ বাহ্যিক দুঃখ কষ্টকে আযাব বলিয়াই মনে করেন না, তাঁহারা কেবল প্রিয়জনের অসন্তোষ এবং বিচ্ছেদকেই আযাব মনে করেন। হযরত আরেফ শীরাযী বলেন :

شنیده ام سخن خوش که پیر کنعاں گفت + فراق یار نه آں می کند که بتواں گفت
حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر + کنا یتیست که از روزگار هجراں گفت

"একটি সুন্দর কথা শুনিয়াছি—যাহা কেন্‌আনের বৃদ্ধ (হযরত ইয়াকুব আঃ) বলিয়াছিলেন, বন্ধুর বিচ্ছেদ এমন দুঃখ দেয় না যাহা ব্যক্ত করা যাইতে পারে।" শহরের ওয়ায়েয কেয়ামতের ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বিচ্ছেদ কালের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন।"

খোদা-প্রেমিকগণ বাহিরের দুঃখ-কষ্টকে আযাব মনে না করার রহস্য এই যে, আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট, আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গ লাভের আস্বাদনের কাছে বাহ্যিক দুঃখ-কষ্ট এমনিভাবে পরাভূত হইয়া পড়ে যে, উহার কোন উল্লেখযোগ্য ক্রিয়া অনুভূত হয় না। অতএব, দোযখের মধ্যে

ফেরেশতাগণের বাহ্যিক আযাব হইলেও তাঁহারা উহাতে সন্তুষ্ট থাকিতেন, কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ উহাতেই হইত। আর আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ তাঁহার সন্তোষেরই প্রত্যাশী হইয়া থাকেন। কিন্তু ফেরেশ্তাদের তো দোযখে বাহ্যিক কোন কষ্টও নাই। মোটকথা, তাঁহারা দোযখে তেমনি বিচরণ ও অবস্থান করিতেছেন যেমন আরামের সহিত বেহেশ্ত্ রক্ষী ফেরেশতাগণ বেহেশ্তে অবস্থান করিতেছেন। এতটুকু বর্ণনায় আমার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, খোদার অসন্তোষই প্রকৃত ক্ষতি; ইহার তুলনায় দুনিয়ার লাভ-লোকসান কিছুই নহে।

॥ শরীয়ত-বিধান এবং কারণ ॥

কেহ কেহ মনে করে,নিয়ত ভাল হইলে এবং কাহারও উপকারার্থে করা হইলে যে যাদু মন্ত্রে শয়তানের সাহায্য গ্রহণ করা হয়, তাহাও জায়েয আছে। এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল। এইরূপে আজকাল একটি রোগ কতক লোকের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে যে, তাহারা পাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। যেমন, সুদ কেন হারাম হইল? ইহাতে ক্ষতি বা অনিষ্টকারিতা কি? জীবন বীমা কেন নাজায়েয? ইহাতে তো বিরাট লাভ রহিয়াছে। আপনারা স্মরণ রাখিবেন, এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার কোন মুসলমানের নাই। মুসলমানের জন্য সুদ হারাম হওয়ার এতটুকু কারণই যথেষ্ট যে, আল্লাহ্তা'আলা ইহাতে অসন্তুষ্ট হন। "প্রিয়জন একাজে অসন্তুষ্ট হন" এতটুকু কথা জানিয়া লওয়ার পর প্রেমিক ব্যক্তি আর কোন যুক্তি বা কারণের প্রতীক্ষা করিতে পারে না। তবে মুসলমানগণ পাপকার্যসমূহের যুক্তি এবং কারণের অনুসন্ধান কেন করিবে? তুমি যদি খোদার আশেক না-ই হইতে চাও, তবে তাঁহার গোলাম তো অবশ্যই আছ। এখন তুমি নিজেই বিচার করিয়া দেখ—তোমার কোন চাকর বা গোলাম যদি তোমার নিকট জানিতে চায় যে, "আপনি আমার অমুক কাজে নারায কেন? ইহার কারণ আগে বলুন, অতঃপর আমি উহা হইতে নিবৃত্ত থাকিব; অন্য-থায় আমি আমার মত অনুযায়ী কাজ করিব।" তাহা হইলে আপনি তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবেন?

আফসুস! আমরা খোদার সহিত এতটুকুও ব্যবহার করি না; অথচ তাঁহার বিধানসমূহের কারণ অনুসন্ধান করি। আজকাল অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষিত লোকে-রাই এই রোগে আক্রান্ত। তাঁহারা এই উত্তর যথেষ্ট মনে করেন না যে, খোদা তাআলা সুদ খাওয়াতে নারায হন বলিয়া সুদ হারাম; বরং তাঁহারা যুক্তি সঙ্গত কারণ জানিতে চান। কারণ নাজানা পর্যন্ত তাঁহাদের তৃপ্তি হয় না।

এক সাহেব বলিলেন, আমি সুদ নিন্দনীয় হওয়ার এই কারণ মানি না যে, সুদ খাইলে দোযখে যাইতে হইবে; বরং এই কারণে আমি উহাকে হারাম মনে করি যে,

উহাতে অমানুষিকতা অত্যধিক। নিজের একজন ভাইকে ঋণ দিল একশত টাকা,আর উশুল করিয়া লইল দুইশত টাকা। আমি বলিতেছি, ইহা এমন একটি যুক্তি সামান্য একটু চিন্তা করিলে প্রত্যেকটি জ্ঞানী লোকই ইহা খণ্ডন করিতে পারে। কেননা,জ্ঞানী-মাত্রই বলিতে পারে,অমানুষিকতা প্রত্যেক ব্যবসায়েই করা হইয়া থাকে। যেমন,আমি দশ টাকায় একখানা কাপড় খরিদ করিয়া তাহা বিশ টাকায় বিক্রি করিলাম। ইহা অমানুষিকতা ছাড়া আর কি? দুই হাজার টাকায় আমি একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়া দশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে গেলাম। ইহাও অমানুষিকতা। এইরূপে এক খণ্ড ভূ-সম্পত্তি আমি এক হাজার টাকায় খরিদ করিয়া পনর হাজার টাকায় বিক্রয় করিতে গেলাম—তাহাও অমানুষিকতা। এখন আসুন, যিনি অমানুষিকতার যুক্তিতে সুদকে হারাম মনে করেন তিনি এ সমস্ত কার্যের এবং সুদের অবস্থার মধ্যে কোন যুক্তি সঙ্গত পার্থক্য বর্ণনা করুন। কখনও তিনি কোন যুক্তি সঙ্গত পার্থক্য দেখাইতে পারিবেন না।

মক্কার কাফেরেরাও এরূপ সন্দেহেরই সম্মুখীন হইয়াছিল। তাহারা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিত, إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا "ব্যবসায় তো সুদেরই ন্যায়" সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে কি ব্যবধান?

বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয়টা একইরূপ বলিয়াই মনে হয়। তবে এখন তোমার সেই অমানুষিকতার যুক্তি কোন্ চুলায় রহিল? ইহাদের উক্তির যে উত্তর কোরআনে দেওয়া হইয়াছে তাহাই শ্রবণের যোগ্য। আল্লাহ্ তাআলা সুদ এবং ব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্যের কোন যৌক্তিক কারণ না দর্শাইয়া; বরং এই পার্থক্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا আল্লাহ্ তাআলা ব্যবসায় হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।" অতএব, উভয় বস্তু সমান কেমন করিয়া হইতে পারে? উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে,আল্লাহ্‌তা'আলা বেচা-কেনা এবং ব্যবসায়কে হালাল ও সুদকে হারাম করিয়াছেন। আল্লাহ্ তাআলা সর্বময় কর্তা,তাঁহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে। তিনি যাহা ইচ্ছা হালাল করিতে পারেন এবং যাহা ইচ্ছা হারাম করিতে পারেন। কারণ জিজ্ঞাসা করার অধিকার কাহারও নাই। আলেমদের উচিত এবিষয়ে কোরআনের বিধান অবলম্বন করা। সাধারণ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী আলেমগণ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট কোন সাধারণ লোক এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা সাধারণের রুচি অনুসারে ও মরযী অনুযায়ী উত্তর প্রদানের চেষ্টা করেন। অতএব, স্মরণ রাখুন,যাঁহারা মনগড়া যুক্তি বর্ণনা করেন তাঁহারা শরীয়তের মূল শিথিল করিতেছেন। কেননা, তাঁহারা যে যুক্তি প্রদর্শন করিবেন—হয়ত কোন বুদ্ধিমান লোক তাহা খণ্ডন করিয়া দিতে পারেন। তখন আপনি যে যুক্তির উপর শরীয়ত বিধানের ভিত্তি নিরূপণ করিয়াছিলেন তাহা যদি সন্দেহজনক হইয়া পড়ে,শরীয়তের বিধানটিও সন্দেহযুক্ত হইয়া পড়িবে। আমি আলেম সম্প্রদায়কে উপদেশ দিতেছি—তাঁহারা যেন

সর্বসাধারণের মরযী রক্ষা করিবার প্রয়াস না পান। কেননা, তাহাতে সাধারণেরও ক্ষতি এবং আলেমদেরও ক্ষতি। বিশেষতঃ তাহাতে শরীয়তের ভিত্তিও দুর্বল হইয়া পড়ে; বরং কেহ যদি তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে, অমুক কাজ হারাম হওয়ার কারণ কি? তবে শুধু এতটুকু জবাব দিবেন যে, "আল্লাহ্ তাআলা হারাম করিয়া দিয়াছেন। কিংবা হাদীস শরীফে ইহার প্রতি নিষেধ আসিয়াছে।"

।। শরীয়তের মূলনীতি ।।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া শর্ত আরোপ করিয়া দেয় যে, ইহার উত্তর ক্বোরআন শরীফ হইতে দেওয়া হউক। আর আলেমগণও অযথা চেষ্টা করিয়া থাকেন যে, ক্বোরআন দ্বারাই প্রমাণিত করিয়া দেওয়া যাউক। অথচ শরীয়তের মূলনীতি যখন চারিটি বস্তু রহিয়াছে ক্বোরআন, হাদীস, এজমা' (ওলামায়ে উম্মতের ঐক্যমত) এবং ক্বেয়াস, তখন প্রত্যেক আলেমেরই অধিকার রহিয়াছে যে, কোন মাস্আলাকে তিনি ক্বোরআন দ্বারা কিংবা হাদীস দ্বারা কিংবা এজমা' দ্বারা অথবা মুজ্তাহেদের ক্বেয়াসের সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন। আপনি দুনিয়ার সমস্ত মাস্আলা ক্বোরআনের সাহায্যে কতক্ষণ পর্যন্ত ও কেমন করিয়া প্রমাণ করিবেন? ক্বোরআন দ্বারা-ই যদি সমস্ত মাস্আলা জানা যাইত, তবে আবার শরীয়তের অন্যান্য মূলনীতিগুলির প্রয়োজন কেন হইত?

কেহ কেহ দাবী করেন যে, ক্বোরআনেই প্রত্যেক বিষয়ের মীমাংসা রহিয়াছে। এমন কি, তাঁহারা রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির প্রমাণও ক্বোরআন দ্বারাই দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অথচ ক্বোরআনে সকল বিষয় বিদ্যমান থাকার অর্থ কখনও ইহা নহে। অন্যথায় কাপড় বুনিবার প্রণালী, বিভিন্ন প্রকারের মেশিন এবং কল কারখানা নির্মাণের নিয়ম পদ্ধতিও ক্বোরআনেই থাকা উচিত ছিল। তাহা হইলে ক্বোরআন তো একটি শিল্প ও কলকারখানা সম্বন্ধীয় পুস্তক হইয়া গেল। আচ্ছা বলুন তো চিকিৎসা-শাস্ত্র "তিব্বে-আকবর" কিতাবে যদি কেহ জুতা সেলাইবার প্রণালী অন্বেষণ করেন, তবে তিনি আহ্মক কিনা? আর যদি তিব্বে-আকবার কিতাবে জুতা সেলাইয়ের প্রণালী লিখিত থাকিত, তবে উহাকে তিব্বের কিতাব কখনও বলা যাইত না। তিব্বে-আকবার কিতাবে এসমস্ত বিষয় বিদ্যমান থাকা উহার গুণের পরিচায়ক হইবে না। তদ্রূপ তিব্বে রূহানীর কিতাব ক্বোরআন শরীফে এ সমস্ত আজেবাজে বিষয় বিদ্যমান থাকিলে তাহা ক্বোরআনের গুণ না হইয়া বরং দোষ হইত।

ক্বোরআনে অবশ্য ধর্মীয় সমস্ত বিষয়ই বর্ণিত আছে, কিন্তু সমস্ত কিছু বিষদভাবেও স্পষ্টরূপে বর্ণিত থাকা যরূরী নহে; বরং উহাতে মূলনীতিসমূহ বর্ণিত রহিয়াছে। তাহা হইতে মুজতাহেদগণ শাখা বিধানসমূহ আবিষ্কার করিয়া লন। যেমন, ক্বোরআন পাকে একটি মূলনীতি বর্ণিত আছে: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"রাসূলুল্লাহ্(দঃ) তোমাদিগকে যে নির্দেশ দান করেন তাহা গ্রহণ কর এবং যে বিষয়ে নিষেধ করেন তাহা হইতে নিবৃত্ত থাক।" অতএব এখন হুযূর (দঃ)-এর হাদীসসমূহ দ্বারা ধর্মের যতগুলি বিধান পাওয়া যাইতেছে, সবগুলি এই মূলনীতিরই শাখা প্রশাখা। সুতরাং আমাদের অধিকার আছে—হাদীস দ্বারা কোন কোন বিধানের প্রমাণ দেওয়ার। কোরআন শরীফে একটি মূলনীতি ইহাও বর্ণিত আছে যে, فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الْاَبْصَارِ "হে জ্ঞানিগণ! তোমরা এ'তেবার অর্জন কর।" পরস্পর সদৃশ দুই বস্তুর একটিকে অপরটির উপর অনুমান করার নাম এ'তেবার। ইহাতে বুঝা যায়, কোন কোন বিধান কেয়াস দ্বারাও প্রমাণিত হয়। এইরূপে কোরআনে বহু মূলনীতি রহিয়াছে। তবে "প্রত্যেক মাস্আলার উত্তরই কোরআন দ্বারা দিতে হইবে," আমাদের উপর এমন বাধ্য বাধকতার কি প্রয়োজন?

অধুনা "কোরআনীয়া সম্প্রদায়" নামে একদলের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা কোরআন ছাড়া আর কিছুই মানে না। ইহারা মায্হাব অমান্যকারী 'গায়ের মুকাল্লেদদের চেয়েও জঘণ্য। তাহারা তো কেবল কেয়াস অমান্য করিত, আর ইহারা হাদীসের অস্তিত্বই উড়াইয়া দিয়াছে। এই কোরআনীয়াসম্প্রদায়ের জনৈক আলেমকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—"নামাযে রাকআতের সংখ্যাগুলি কোরআন দ্বারা প্রমাণ কর।" আমরা দেখিতেছি, কোরআনে শুধু নামায পড়িবার নির্দেশ আছে, আর কোন কোন আয়াতে নামাযের ওয়াক্তের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কিন্তু ফজরের ফরয দুই রাক্আত, যোহরের নামাযের ফরয চারি রাকাআত এইরূপে রাকআতের সংখ্যা কোথাও উল্লেখ নাই। তবে তোমরা এই রাকআতের সংখ্যা কোথা হইতে বুঝিতে পারিলে?" যদি হাদীস দ্বারা বুঝিয়া থাক, তবে সাব্যস্ত হইয়া গেল যে, হাদীসও ধর্মীয় বিধানসমূহের অন্যতম প্রমাণ, অন্যথায় কোরআন শরীফ খুলিয়া দেখাও রাকআতের সংখ্যা কোথায় বর্ণিত আছে?" সে ব্যক্তি একদিনের সময় চাহিল, ইহাতেই তাহার মায্হাব ভিত্তিহীন বলিয়া বুঝা গেল যে, এখন পর্যন্ত রাকআতের সংখ্যাই তাহার জানা নাই। পূর্ব হইতেই আমল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে পরবর্তী দিন অনেক কিছু ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এই আয়াতটি পেশ করিল:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰئِكَةِ رُسُلًا اُولِىْٓ اَجْنِحَةٍ مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۔

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার জন্য যিনি আসমান এবং যমিনের সৃষ্টিকর্তা এবং দুই-দুই, তিন-তিন, ও চার-চার ডানাধারী ফেরেশ্তাদের সৃষ্টিকারী।" এই ছিল তাহার নামাযের রাকআতসমূহের প্রমাণ। সোবহানাল্লাহ্! ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপই হইল "আঘাত করিলাম হাঁটুতে নষ্ট হইল চক্ষু।" আচ্ছা দেখুন তো এই আয়াতে

ফেরেশ্তাদের ডানার সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে? না নামাযের রাকআতের সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে ? যদি শুধু সংখ্যার উল্লেখই তাহাদের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হয়, তবে শুধুএই আয়াতটিই কেন ? আরও এমন বহু আয়াত পাওয়া যাইবে। যেমন, আল্লাহ্ তাআলা বলেন : فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ তোমরা স্ত্রীলোকদের মধ্য হইতে তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী বিবাহ কর—দুই-দুই, তিন-তিন এবং চার-চার। উক্ত আলেম নামাযের রাকাআতের সংখ্যার প্রমাণে যেই সংখ্যাযুক্ত আয়াত পেশ করিয়াছেন, এই আয়াতেও সেই সংখ্যাগুলিই উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু এগুলি কিসের সংখ্যা ? নামাযের রাকআতের সংখ্যা, না ফেরেশতাগণের ডানার কিংবা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা। اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيْم

মোটকথা, আলেমদের কখনও এই পন্থাঅবলম্বন করা উচিত নহে যে, প্রত্যেক মাসআলার উত্তরই কোরআন হইতে দেওয়ার চেষ্টা করিবেন, কিংবা প্রত্যেক মাসআলারই যৌক্তিক প্রমাণ বর্ণনাকরিবেন। কেননা, কোন কোনমাসআলায় আপনি কোন যুক্তি বা কারণই খুঁজিয়া পাইবেন না। কিংবা পাইলেও তাহা খুব দুর্বল। অতএব, মনগড়া যুক্তি কিংবা দুর্বল যুক্তি বর্ণনা করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আপনি শরীয়-তের ভিত্তিই দুর্বল করিতে চাহিতেছেন।

কোন একজন লোক আমার নিকট নিজের এক ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলিলেন : "আমি জনৈক আধুনিক ভদ্রলোককে দাড়ি সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলাম : "আপনি দাড়ি কামান কেন ? ইহা গুনাহের কাজ, আপনার তওবা করা উচিত। সে বলিল, দাড়ি রাখার প্রমাণ আপনি কোরআন হইতে দিতে পারিলে, আমি তওবা করিব, আর দাড়ি কামাইব না।" আমি বলিলাম, কোরআনের দ্বারাই আমি দাড়ির প্রমাণ দিতে পারি এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আয়াতটি পাঠ করিলাম।

قَالَ يَا ابْنَ اُمَّ لَا تَاْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَلَا بِرَاْسِيْ *

"হারূন (আঃ) মূসা (আঃ)কে বলিলেন, হে আমার মাতৃ নন্দন! আমার দাড়ি এবং মাথা ধরিও না।" ইহাতে বুঝা যায় হারূন (আঃ)-এর দাড়ি ছিল, অন্যথায় মূসা (আঃ) কোথা হইতে তাহা ধরিতেন ?"

আমি উক্ত নছীহতকারী লোকটিকে বলিলাম, "যদি সে ব্যক্তি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত, হাঁ, এই আয়াতের দ্বারা দাড়ির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, কেননা, হারূন (আঃ)-এর দাড়ি ছিল। কিন্তু ইহা তোপ্রমাণিত হইল না যে,দাড়ি রাখা ওয়াজেব। তবে আপনি কি উত্তর দিতেন ? আর দাড়ির অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আপনি কোরআনকে কেন কষ্ট দিলেন ? নিজের দাড়িই দেখাইয়া দিতে পারিতেন : "নিন, আমার দাড়ি দেখুন, ইহাতেই তো দাড়ির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া যাইত।"

সে বলিল, তাহার এত বুদ্ধি কোথায় ছিল যে, সে আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিত? আমি তো তাহাকে ঘাবড়াইয়া দিয়াছিলাম। আমি বলিলাম, আপনাদের মধ্যে ও আমাদের তালেবে-এল্‌ম্‌দের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। আমরা কখনও এরূপ প্রমাণ উত্থাপন করিতে পারিতাম না যাহা আমাদের নিজেদের বিবেচনাই দুর্বল এবং খুঁতযুক্ত। আমাদের মুখ দিয়া এরূপ দলিলই বাহির হইত না। আমরা সাধ্যানুযায়ী এমন কথাই বলিতাম যাহা দুনিয়ার কোন জ্ঞানীই খণ্ডন করিতে না পারে; যদিও তাহা সম্বোধিত ব্যক্তির রুচিমত না হউক। অতএব, খুব অনুধাবন করুন যে, প্রশ্নকারীর রুচী অনুযায়ী উত্তর প্রদানের প্রণালী শরীয়তের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। ইহারা এই ভাবিয়া মনে মনে খুশী হয় যে, আমরা শরীয়তের সঙ্গে বন্ধুত্বই স্থাপন করিলাম। কিন্তু তাহাদের বন্ধুত্ব ঠিক সেই বিখ্যাত "ভল্লুকের বন্ধুত্বরই" অনুরূপ।

কথিত আছে, একব্যক্তি একটি ভল্লুক পুষিত। সে উহাকে পাখা নাড়িয়া বাতাস করা শিখাইয়াছিল। প্রভু যখন শয়ন করিত, তখন ভল্লুক দাঁড়াইয়া পাখা নাড়িয়া তাহাকে বাতাস করিতে থাকিত। তাহার কোন কোন বন্ধু তাহাকে নিষেধও করিয়াছিল যে, হিংস্র জন্তুর বিশ্বাস নাই। তাহার দ্বারা এই শ্রেণীর খেদমত গ্রহণ করা উচিত নহে যে, নিজে ঘুমাইয়া পড়িবে আর উহাকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া রাখিবে। সে উত্তর করিল, না বন্ধু, ইহা শিক্ষাপ্রাপ্ত; অর্থাৎ, ইহা এখন সভ্য ও শিষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন আর জংলী নহে। সুতরাং উহার পক্ষ হইতে এখন আর কোন ভয় নাই। একদিন সেই প্রভু সাহেব বিছানায় পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন। ভল্লুকটি অভ্যাস অনুযায়ী পাখা ঝুলাইতেছিল। হঠাৎ একটি মাছি আসিয়া প্রভুর নাকের ডগার উপর বসিল। ভালুক তখনই উহাকে তাড়াইয়া দিল। মাছি আবার আসিয়া যথাস্থানে বসিল। কোন কোন মাছি এত পাজী হয় যে, যতই উহাকে তাড়াইবেন ততই সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিবে, মোটেই নিবৃত্ত হয় না। ফলতঃ মাছিটি ভালুকটিকে বিরক্ত করিয়া তুলিল। তাড়াইতে তাড়াইতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। তবুও মাছি পুনরায় আসিয়া হাজির হইতে লাগিল। এমন কি, ভালুক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সে পাখা ফেলিয়া দিয়া বড় এক খণ্ড পাথর কুড়াইয়া আনিয়া হাতে রাখিল এবং মনে মনে বলিল, যদি মাছি পুনরায় আসে, তবে আমি এই পাথর দ্বারা উহাকে মারিয়াই ফেলিব। অবশেষে মাছি আবার আসিয়া নাকের উপর বসিতেই ভালুকটি মাছিটিকে লক্ষ্য করিয়া একটি বড় পাথর প্রভুর নাকের উপর মারিল। জানি না, মাছি মরিল কিনা। কিন্তু প্রভুর মস্তিষ্ক ভর্তা হইয়া গেল।

এই ভালুকটি যেমন নিজের ধারণানুযায়ী প্রভুর খেদমতই করিয়াছিল এবং তাহার ইচ্ছাও ছিল কষ্টদায়ক প্রাণীকে ধ্বংস করা, সে প্রভুকে ধ্বংস করিতে চাহে নাই। কিন্তু প্রত্যেকেই বুঝিতে পারেন এই বন্ধুত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রভুর সহিত শত্রুতাই ছিল।

অনুরূপ ভাবে আজকাল আমাদের এসমস্ত অজ্ঞ ভাইয়েরা শরীয়তের সহিত ভালুকের ন্যায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে।

॥ আত্মগরিমা ও অহংকার ॥

এসমস্ত ধৃষ্টতামূলক প্রশ্নসমূহের আসল রহস্য এই যে, মানুষের মধ্যে ইদানিং আত্মগরিমা ও অহংকার প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বশ্যতা ও আনুগত্যের স্বভাব লোপ পাইতে চলিয়াছে। এই কারণেই মানুষের স্বভাব গোলামসুলভ মনোভাব লইয়া ইস্লামী শরীয়তের বিধানগুলি মান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারে না। শুধু শরীয়তের বিধানেই নহে; বরং অবাধ্যতা, আত্মগরিমা ও অহংকারের রুচি প্রত্যেক ব্যাপারেই দেখা যাইতেছে। এমনকি, কোন কাজে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া সেই ভুল স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হইলেও উহার জন্য এমন এক পন্থা অবলম্বন করিয়া লয় যাহাতে বিন্দু পরিমাণ অনুতাপ বা নম্রতা বুঝা যায় না। কতকগুলি নিয়মতান্ত্রিক শব্দ আওড়ানই যথেষ্ট মনে করা হয়। এই ভুল ত্রুটি স্বীকারের ক্ষেত্রেও নিজের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা হয়। যেমন, আধুনিক সভ্যতায় ক্ষমা প্রার্থনার এক বিচিত্র পদ্ধতি দেখা যাইতেছে। কোন হতভাগা তাহাদের দ্বারা যতই ক্ষতিগ্রস্ত হউক না কেন, শুধু এতটুকু বলিয়াই ছুটিয়া যায় যে, আমি দুঃখিত, আমার কারণে আপনার ক্ষতি হইয়া গেল। সোবহানাল্লাহ্! একজনকে জুতা মারিয়া শুধু এতটুকু বলিয়াই সরিয়া পড়িল, "আমি দুঃখিত।"

এই প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। এক ব্যক্তির চোঁয়ালের দাঁতে ব্যথা হইলে সে ডাক্তারের নিকট গেল এবং বলিল,"আমার চোয়ালের দাঁতটি তুলিয়া ফেলুন।" জানি না ডাক্তার কি ভুল করিল, তাহার ব্যথাযুক্ত দাঁতটি না উঠাইয়া একটি ভাল দাঁত উঠাইয়া ফেলিল। তাহাতে লোকটি তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়া গেল এবং বলিল, হায়! ডাক্তার সাহেব, আপনি কি করিলেন? ডাক্তার বলিল, আমি দুঃখিত, আমি ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। বেচারার চক্ষু হারাইয়াছে, আর তিনি একটু দুঃখ প্রকাশ করিয়াই মনে করিলেন যে, ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়াছেন। তদুপরি আরও আশ্চর্যের কথা এই যে,দুঃখও অন্তর হইতে প্রকাশ করে না। তাহাদের দুঃখ প্রকাশের সুরও এমন হইয়া থাকে যাহা হইতে ফেরআউনী ভাব প্রকাশ পায়।

কানপুরে জনৈক তালেবে-এল্‌ম একজন মুদার্‌রেসের সহিত বে-আদবী করিয়াছিল। বিচার আমার নিকট আসিলে আমি ছাত্রটিকে বলিলাম, ওস্তাদের কাছে ক্ষমা চাও। অন্যথায় তোমাকে মাদ্রাসা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে। সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে সম্মত হইল। কিন্তু তাহার ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গী এইরূপ ছিল যে, উভয় হাত কোমরের পশ্চাতে রাখিয়া সটান দাঁড়াইয়া মুখে বলিল, আমি আপনার কাছে

ক্ষমা চাহিতেছি। এই অবস্থা দেখিয়া আমার রাগ হইল। আমি তাহাকে ২।৩ চড় লাগাইয়া বলিলাম,বে-আদব! এই কি মা'ফ চাহিবার ঢং? হাত জোড় করিয়া সামনে দাঁড়া। পায়ে ধর! অন্যথায় এখনই তোকে মাদ্রাসা হইতে বাহির করিয়া দিব। ইহা আধুনিক সভ্যতার কুফল। দুঃখের বিষয়! তালেবে-এল্‌ম এবং আলেমদের মধ্যেও ইহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে,ক্ষমা এইরূপে চায় যাহাতে অনুতাপের গন্ধমাত্র থাকে না।

যাহা হউক, প্রসঙ্গক্রমে এই কথাগুলি আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি বলিতে-ছিলাম মানুষের মধ্যে এই পাগলামি ঢুকিয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যাপারকেই ক্বোরআনের মধ্যে ঢুকাইতে চায়।

একটি কেস্‌সা মনে পড়িল,বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করিয়াছে যে, মানুষের শুক্রের মধ্যে এক প্রকারের কীট থাকে, তাহারই দ্বারা গর্ভ সঞ্চার হয়। কোন এক ব্যক্তির ঝোঁক হইল—তিনি ক্বোরআন দ্বারা এই বিষয়টি প্রমাণ করিবেন। কেননা বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার কখনও ভুল হইবার নহে। উহা নিঃসন্দেহে নির্ভুল। এখন কোন প্রকারে এই বিষয়টি ক্বোরআনের দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হউক। أستغفر الله العظيم। মোটকথ,তিনি টানা হেঁচড়া করিয়া বিষয়টি ক্বোরআন দ্বারা প্রমাণ করিলেন। এখন শুনুন,তাহার প্রমাণ কেমন চমৎকার! তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন--اقرأ باسم ربك الذى خلق ○ خلق الانسان من علق আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে "আলাক্" দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। অভিধানে আলাক্ শব্দের অর্থ জমাট রক্তও আছে এবং জোঁকও আছে। তিনি এই আয়াতটির অর্থ করিলেন "আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে জোঁক দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন। কেমন বাজে কথা কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন—তোমার এই ব্যাখ্যা দ্বারা বিজ্ঞানের উক্ত বিষয়টি কেমন করিয়া প্রমাণিত হইল? কেননা, তাহারা ত একথা বলেন নাই যে, মানুষের শুক্রের মধ্যে জোঁক থাকে। হাঁ,তবে আপনার এই ব্যাখ্যার উপর একটি টীকা চড়ান উচিত যে, মানুষ সাধারণতঃ যে প্রাণীকে জোঁক বলিয়া থাকে এস্থলে সেই জোঁক উদ্দেশ্য নহে; বরং জোঁক বলিতে এখানে কীট উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা করিয়া সেই ভদ্রলোক হয়ত আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আপনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? এই ধরনের ব্যাখ্যায় শরীয়তকে কি পরিমাণ বিকৃত করা হয় এবং ইহা হইতে বিরত থাকা কি পরিমাণ আবশ্যক? কেহ যদি এই জাতীয় মাস্‌আলার প্রমাণ ক্বোরআন হইতে প্রত্যাশা করে, তাহাকে পরিষ্কার বলিয়া দেওয়া উচিত, ক্বোরআন শরীর-বিজ্ঞানের গ্রন্থ নহে। এইরূপে যদি কেহ কোন বস্তু হারাম হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তবে তাহাকে শুধু বলিয়া দাও যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহা নিষেধ করিয়াছেন। অযথা নিজের মনগড়া যুক্তি বা কারণ বর্ণনা করা উচিত নহে।

।। যুক্তি সঙ্গত কারণ ।।

কেহ কেহ كَلِّمُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ হাদীসটি দ্বারা প্রমাণ আনয়ন করে যে, হাদীস শরীফে নির্দেশ আসিয়াছে : "মানুষের সহিত তাঁহাদের জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে কথাবার্তা বল।" আজকাল যখন মানুষের স্বভাব এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে তাহাদের তৃপ্তি হয় না; সুতরাং আমাদেরও উচিত সেই প্রণালীতে কথা বলা। আমি বলিতেছি, আপনি হাদীসটির প্রকৃত মর্ম বুঝেন নাই। হাদীসটির প্রকৃত অর্থ হইল, লোকের সম্মুখে এমন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় বর্ণনা করিও না যাহা তাহারা বুঝিতে না পারে। এই অর্থ নহে যে, তুমি তাহাদের বিকৃত রুচির পরিলক্ষিতে কথাবার্তা বল।

এখন আপনারা স্বয়ং মীমাংসা করুন, হারাম কার্যসমূহের স্পষ্ট ও সহজ কারণ কোন্‌টি এবং সূক্ষ্ম ও জটিল কারণ কোন্‌টি ? বলা বাহুল্য, সর্বাপেক্ষা সহজ ও সংক্ষেপ জবাব ইহাই হইবে যে, খোদা তা'আলা ইহা নিষেধ করিয়াছেন, কাজেই ইহা হারাম। হাদীসে এবিষয়ে নিষেধ আসিয়াছে, সুতরাং এরূপ করা গুনাহ্‌র কাজ। আর যে, সমস্ত কারণ ও যুক্তি আপনারা নিজেরা মনগড়া বর্ণনা করিতেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহাই সাধারণের বোধের অগম্য। অতএব, এই হাদীস দ্বারাও আমার কথারই পোষকতা পাওয়া যাইতেছে।

তবে বলিতে পারেন, এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে সাধারণ লোকের তৃপ্তি হয় না। সেক্ষেত্রে আমি বলি, তাহাদের মনে তৃপ্তি আনিয়া দেওয়া আপনাদের দায়িত্ব নহে। আপনাদের সেই জবাবই দেওয়া উচিত যাহা প্রকৃত এবং মৌলিক জবাব, অর্থাৎ, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।" ইহা এমন একটা জবাব— ক্বেয়ামত পর্যন্ত যাহা আর কখনও খণ্ডন করা যাইবে না। আর যদি যুক্তি সঙ্গত কারণ বর্ণনা করার এতই আগ্রহ হইয়া থাকে, তবে উহার প্রণালী এই যে, প্রথমে উক্ত প্রকৃত জবাব দান করুন এবং বলিয়া দিন যে,আসল জবাব তো ইহাই। অতঃপর অতিরিক্ত যৌক্তিক প্রমাণও বর্ণনা করুন। ফলতঃ, যদি কেহ উহা খণ্ডন করিয়াও দেয়, তবে প্রথমোক্ত অকাট্য জবাব তো নিরাপদ থাকিবে এবং শরীঅত-বিধানের নির্ভর আপনাদের বর্ণিত যুক্তির উপর থাকিবে না।

একবার আমি রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলাম। ঘটনাক্রমে জনৈক ইংরেজী শিক্ষিত সাহেবও আমারই বগীতে সফর করিতেছিলেন। কোন এক ষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহার এক চাকর আসিয়া একটি কুকুর তাঁহার নিকট দিয়া গেল। সাহেব উহাকে একটি শিকের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেন। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে তিনি আমার দিকে লক্ষ করিয়া বলিতে লাগিলেন : "আমি বুঝিতে পারি না, কুকুর পুষিতে শরীঅত

কেন নিষেধ করিয়াছে? অথচ কুকুরের মধ্যে এমন এমন গুণ রহিয়াছে এবং তিনি কুকুরের মধ্যে এমন গুণসমূহ আছে বলিয়া বর্ণনা করিলেন যাহা স্বয়ং প্রভুর মধ্যেও ছিল না।

আমি বলিলামঃ আপনার এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর আছে। একটি উত্তর সাধারণ আর একটি খাছ। সাধারণ উত্তরটি এই যে, نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم "রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে কুকুর পুষিতে নিষেধ করিয়াছেন।" আর হুযূর আমাদের চেয়ে ঢের বেশী জ্ঞানী ছিলেন। সুতরাং আমাদের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নাই যে, হুযূর কেন নিষেধ করিয়াছেন। এই উত্তর শ্রবণ করিয়া তিনি নীরব হইয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার চেহারা দেখিয়া মনে হইল, তিনি এই উত্তরে তৃপ্ত হইতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি বলিলেন ঃ "আমি আপনার খাছ উত্তরটি শুনিবার জন্যও আগ্রহান্বিত।" আমি বলিলাম ঃ "খাছ উত্তরটি এই যে, কুকুরের মধ্যে যদিও অনেক গুণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে এত বড় একটি দোষ আছে যে, উহা তাহার সমস্ত গুণকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। তাহা এই যে, কুকুরের মধ্যে স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি নাই, নিজের প্রভুর সে যতই অনুগত হউক না কেন, স্বজাতির সহিত উহার এমন ঘৃণা ও বিদ্বেষ যে, দ্বিতীয় আর একটি কুকুর তাহার দৃষ্টিগোচর হইতেই সে উহাকে ছিড়িয়া খাওয়ার জন্য দৌড়ায়। সুতরাং যে প্রাণীর মধ্যে স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি নাই, উহা সঙ্গে রাখার যোগ্য নহে। এই উত্তরটি যেহেতু ভদ্র লোকটির রুচি অনুযায়ী হইয়াছিল, কেননা, ইহারা দিবা-রাত্র স্বজাতির প্রতি সহানুভূতি ও সমবেদনার পাঠ আওড়াইয়া থাকে, যদিও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক কমই হয়। এই উত্তরটি শ্রবণ করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং বলিল ঃ "প্রকৃত উত্তর এইটি।" অথচ হইা কোন উত্তরই নহে, একটি কৌতুক মাত্র।

অতঃপর আমি বেরেলী শহরে এক তহ্‌শীলদার সাহেবের নিকট শুনিলাম, অলিগড় কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আমার উপরোক্ত এই উত্তরটি লইয়া বেশ চর্চা করা হইতেছে এবং ছাত্রগণ বলে, বাস্তবিকপক্ষে জাতির জন্য এরূপ আলেমের প্রয়োজন আছে—যিনি এই ধরণের তত্ত্ববিশ্লেষণে সক্ষম। ইহাদের বোধশক্তির উপর পাথর পড়ুক। আমি বলি, তাহারাই এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারে। অন্যথায় আমাদের কাছে ইহার কোন উত্তর নাই। আমি নিজেই এই উত্তরটিকে নাকচ করিয়া দিতে পারি। একটি কুকুর আর একটি কুকুরকে দেখিলে যে ঘেউ ঘেউ করে, চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে, সে কি উদ্দেশ্যে চীৎকার করে। নিজের জাতির প্রতি সহানুভূতি-হীনতার কারণে না নিজের প্রভুর প্রতি সহানুভূতিশীলতার কারণে? বাহ্যিক দৃষ্টিতে বুঝা যায়—প্রভুর প্রতি সহানুভূতিশীলতার কারণেই সে ঘেউ ঘেউ করে। সে এই মনে করিয়া অপর কুকুরের প্রতি ঘেউ ঘেউ করে যে, এই কুকুরটি আমার প্রভুর শত্রু।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়,কাহারও বাড়ীতে দশটি কুকুর পোষা হইলে উহারা একে অন্যকে দেখিয়া ঘেউ ঘেউ করে না ; বরং উহারা সর্বদা অপরিচিত কুকুর দেখিলেই এরূপ করিয়া থাকে। তাহাও প্রভু উহাকে বারণ না করা পর্যন্ত। প্রভু বারণ করা মাত্রই উহার ঘেউ ঘেউ বন্ধ হইয়া যায়। কেননা, তখন সে বুঝিতে পারে যে, ইহা আমার প্রভুর শত্রু নহে। ইহা দ্বারা আমার প্রভুর কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই। ইহার পরে সে প্রভুর নিকটে যাইয়া তাহার পদ লেহন করিতে থাকে এবং এমন ভাব-ভঙ্গী প্রকাশ করিতে থাকে, যেন সে প্রভুর জন্য বড়ই আশেক। তাহার ভালবাসার আতিশয্য দেখিয়া মন ঘাব্ড়াইতে আরম্ভ করে। কুকুরের শত্রুতাও খারাপ, অতিরিক্ত আসক্তিও খারাপ।

নিন্, যেই উত্তর শ্রবণ করিয়া তাহারা এত আনন্দিত, আমি নিজেই উহাকে নাকচ করিয়া দিলাম। পক্ষান্তরে আমার প্রথম উত্তর অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদিগকে কুকুর পুষিতে নিষেধ করিয়াছেন—ইহা এমন একটি উত্তর যাহা খণ্ডন করার সাধ্য কাহারও নাই। এখন যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কেন নিষেধ করিয়াছেন ? তদুত্তরে আমি বলিব : "আমাকে এই প্রশ্ন করিবার কোন অধিকার তোমার নাই। তোমার যদি সাহস থাকে, তবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌র নিকট প্রশ্ন করিও।"

একজন জজের সামনে মোকদ্দমা পেশ করা হয়, তিনি আইন অনুযায়ী উহার ফয়ছলা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে এরূপ প্রশ্ন করিবার অধিকার কাহারও নাই যে, এরূপ আইন কেন প্রণয়ন করা হইয়াছে ? যদি কোন বোকা এরূপ প্রশ্ন করিয়াই বসে, তবে তিনি বলিতে পারেন : আমি আইনজ্ঞ, আইন প্রণেতা নহি। এই প্রশ্ন তোমার পার্লামেন্ট অথবা আইন-সভাকে করা উচিত। আর জজের এই উত্তরকে সমস্ত জ্ঞানীরা খুব যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়া থাকেন। তবে ইহার কারণ কি থাকিতে পারে যে, এরূপ উত্তর আলেমগণের পক্ষ হইতে দেওয়া হইলে যুক্তিসঙ্গত মনে করা হইবে না ? তাহাদের প্রতি প্রশ্নবান এবং দুর্নাম কেন হইবে ?

আলেমগণ কখন এরূপ দাবী করিয়াছিল যে, আমরাই আইন প্রণেতা ? বরং তাঁহারা তো পরিষ্কার ভাষায়ই বলিয়া থাকেন, আমরা আইনের জ্ঞান রাখি মাত্র। আমাদিগকে কেবল ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, এই আইনটি কোন্ কিতাবে আছে ? আমরা তোমাদিগকে কোরআনে, হাদীসে, কিংবা ফেকাহ্‌র কিতাবে তাহা দেখাইয়া দিব। আইন প্রণয়নের কারণ ও যুক্তি আমরা জানি না। এই প্রশ্ন আইন প্রণয়নকারীকে জিজ্ঞাসা কর। আইন প্রণেতা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা। রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)ও আইন প্রনয়ণকারী নহেন ; তিনিও শুধু আইন প্রচারক। তাঁহার অবস্থা তো শুধু এইরূপ :

گفتۂ او گفتۂ اللہ بود + گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود ۔

"হুযুর (দঃ)-এর কথা আল্লাহ্‌রই কথা, যদিও আল্লাহ্‌র একজন বন্দার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে।"

আর হুযূরের সম্মুখে ওলামায়ে কেরামের অবস্থা এইরূপ ঃ

در پس آئینه طوطی صفتم داشته اند + آنچه استاد ازل گفت همان می گویم

"তোতা পাখীর ন্যায় আমাকে আয়নার পশ্চাতে রাখা হইয়াছে। আযলের ওস্তাদ যাহাকিছু বলেন, আমি তাহাই বলিয়া থাকি।

।। বিধানসমূহের হেকমত ।।

আমার উপরোক্ত বর্ণনার অর্থ—এই নহে যে, শরীঅতের বিধানগুলির কোন হেকমত ও যুক্তি নাই। যুক্তি অবশ্যই আছে এবং আলেমগণ তাহা অবগতও আছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কি আবশ্যক হইয়া পড়িল যে, তোমাদিগকে বলিতেই হইবে? আমাদের নিকট গিনি স্বর্ণ আছে কিন্তু আমরা তোমাদিগকে দিব না। কাহারও কোন ধার ধারি কি? ফলকথা, আমরা আইন প্রণেতা নই যে,আইনের যুক্তি বিশ্লেষণ করাও আমাদেরই দায়িত্ব হইবে? আমরা তো শুধু এতটুকু অবগত আছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা সুদকে হারাম করিয়া দিয়াছেন, কাজেই উহা হারাম, যদি প্রশ্ন কর যে, কোথায় হারাম করিয়াছেন? ইহার উত্তর প্রদান করা অবশ্য আমাদেরই দায়িত্ব। আমরা বলিয়া দিব : أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا "আল্লাহ্ তা'আলা কেনাবেচা অর্থাৎ, ব্যবসায়কে হালাল করিয়াছেন এবং সুদকে হারাম করিয়াছেন।"

আমি বলিতেছিলাম, একজন ভদ্রলোক সুদ হারাম হওয়ার এই কারণ মনে করিয়াছিলেন যে, ইহাতে বড়ই অমানুষিকতা হয়। তাহার এই যুক্তি কোন যুক্তিই নহে। কেননা, এই অমানুষিকতার যুক্তি প্রত্যেক ব্যবসায়ের মধ্যেই প্রয়োগ করা যায়; বরং সুদ হারাম হওয়ার আসল কারণ উহাই যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি।

কেহ কেহ শরীঅতের বিধানসমূহের যুক্তি নিজে মনগড়া আবিষ্কার করিয়া খাদ্য শস্যের ব্যবসায় হারাম মনে করিতেছে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। খাদ্য-শস্যের ব্যবসায় অন্যান্য পণ্যের ব্যবসায়েরই অনুরূপ। উহার ব্যবসায়ে কোন নিষেধ নাই। তবে বলিতে পারেন খাদ্য-শস্যের ব্যবসায়ে লোকে মূল্য চড়িবার অপেক্ষায় শস্য আবদ্ধ করিয়া রাখে। আমি বলি, মূল্য চড়িবার জন্য স্বাভাবিক অপেক্ষা করাতেও ক্ষতি কিছুই নাই। হাঁ, অতি মূল্য বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা কিংবা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করা খারাপ। তবে সাধারণভাবে নিজের লাভের জন্য দোআ করা জায়েয। যদিও তাহাতে পরোক্ষভাবে শস্যের মূল্য বৃদ্ধিরই আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য হয়। ফেকাহশাস্ত্রের আলেম যে, احتكار 'এহ্‌তেকার' অর্থাৎ,খাদ্য-শস্য আটক করিয়া রাখা নিষেধ করিয়াছেন,উহার অর্থই এই যে দুর্ভিক্ষের সময়ে যখন দেশে খাদ্য-শস্য দুর্লভ হইয়া পড়ে এবং খাদ্যাভাবে লোকের কষ্ট

হয়, তখন খাদ্য-শস্য অতিরিক্ত লাভের আশায় আটক করিয়া রাখা হারাম। যদি বাজারে খাদ্য-শস্য পাওয়া যায়, তদবস্থায় লাভের আশায় শস্য আটক করিয়া রাখা হারাম নহে। মোটকথা, সাধারণের মধ্যে যে একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে, "লাভের আশায় খাদ্য-শস্য আটক করিয়া রাখা হারাম" তাহা ঠিক নহে। ফলকথা, আমরা নিজের তরফ হইতে মনগড়া যুক্তি আবিষ্কার করিয়া হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করিয়া রাখিয়াছি। ইহার ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, খাদ্য-শস্যের ব্যবসায় একেবারে মুসলমানের হাতছাড়া হইয়া কেবলহিন্দুর হাতে চলিয়া গিয়াছে। আজ যদি হিন্দুরা মুসলমানদের নিকট খাদ্য-শস্য বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেয়, তবে মুসলমানদের কষ্টের অবধি থাকিবে না। আমার মতে প্রত্যেক শহরে, বাজারে এবং গ্রামে খাদ্য-শস্যের ব্যবসায়ী মুসলমানও থাকা আবশ্যক। যাহাতে মুসলমানদিগকে কোন সময় দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে না হয়। মুদ্দাকথা, এইরূপ যুক্তি ও কারণ প্রথমতঃ আলেমদের জ্ঞাত থাকা জরূরী নহে। তাঁহারা অবগত থাকিলেও তাঁহাদের একথা বলিবার অধিকার আছে যে, আমরা বলিব না।

আপনি যদি ডাক ঘরে যাইয়া কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন, এক তোলা মালের ডাকমাশুল কত ? সে যদি আপনাকে বলিয়া দেয়, মাশুল তিন পয়সা। আপনি যদি ইহার উপরও প্রশ্ন করেন যে, তিন পয়সা মাশুল হওয়ার কারণ কি ? ইহার উত্তরে সে কি বলিবে ? বলা বাহুল্য, সে এই উত্তরই দিবে যে, সাহেব! আমি আইন অনুযায়ী কাজ করিতেছি। আপনি যদি তিন পয়সার কম টিকেট লাগান, তবে আমি আপনার লেফাফা বিয়ারিং পোষ্ট করিয়া দিব। তার পরের কথা আমি জানি না, ইহার কারণ কি এবং কি নয় ? যদি আমার কথায় আপনার বিশ্বাস না হয়, তবে আমি আপনাকে ডাক বিভাগের আইন বই দেখাইতে পারি। তাহাতে দেখিবেন এক তোলার মাশুল আমি যাহা বলিয়াছি তাহাই, ইহার চেয়ে অধিক আপনি আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন না।

দুঃখের বিষয়, পোষ্ট অফিসের কেরাণী এরূপ উত্তর দিলে সকলেই তাহা মানিয়া লন। অথচ আলেমদের এই জাতীয় উত্তর মানা হয় না।

আমি বুঝিতে পারি না, এই দুই উত্তরের মধ্যে পার্থক্য কি ? কিন্তু আজকাল তো প্রত্যেকেই নিজেকে ধর্মীয় বিষয়ে মুজ্তাহেদ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। নিজের বিবেক অনুযায়ী কারণ বা যুক্তি খাড়া করিয়া উহারই উপর ধর্মের বিধানসমূহের নির্ভর মনে করে। যেমন কোন কোন লোককে বলিতে শুনা গিয়াছে যে, আরবের লোকেরা উষ্ট্র-চারক জংলী লোক ছিল। তাহাদের মুখ-মণ্ডলের উপর ধূলা-বালি এবং হাতে পায়ে প্রস্রাবের ছিটা পড়িত। এই কারণেই তাহাদের উপর ওযু ফরয করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, নামাযের পূর্বে ওযু করিয়া লও। এই কারণে ওযুর মধ্যে ঐসমস্ত অঙ্গ

ধৌত করাই ফরয করা হইয়াছে, যাহা অধিকাংশ সময় কাজে-কর্মে থাকার কারণে ময়লাযুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু আমরা সভ্য লোক, অধিকাংশ সময়েই মোজা এবং হাত মোজা পরিয়া থাকি। তদুপরি কাঁচের জানালাযুক্ত গৃহে বাস করি। আমাদের হাতে পায়ে ধূলা-বালু বা ময়লা লাগিতে পারে না। সুতরাং আমাদের জন্য ওযূ ফরয নহে।

এই যুক্তিটি তেমনই হইল—যেমন যুক্তি কোন এক রেল ষ্টেশনে জনৈক সীমান্তের পাঠান দর্শাইয়াছিল। উক্ত পাঠান দুই মন ওযনের একটি বস্তা বগলে চাপিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। সে তাহা লাগেজ-বুক করায় নাই। গেট চেকারকে টিকেট দেখাইবার সময় চেকার বলিল: 'এই মালের বিল কোথায়?' সে উত্তর করিল: 'বিল আবার কি?' চেকার বলিল: 'এই বস্তার টিকেট?' সে আবারও নিজের টিকেটখানিই দেখাইল। চেকার বলিল: "ইহা তো তোমার টিকেট। এই মালের টিকেট দেখাও।" সে বলিল: 'না' আমারও এই টিকেট মালেরও এই টিকেট।' চেকার বলিল: 'পনর সেরের অতিরিক্ত ওযনের মালের জন্য পৃথক টিকেট করিতে হয়।' তখন পাঠান বলিয়া উঠিল: 'ইহাই আমার পনের সের। রেলওয়েবিভাগ পনের সেরের যে আইন করিয়াছে উহার অর্থ এই যে, যে পরিমাণ মাল মানুষ অনায়াসে বহন করিয়া নিতে পারে উহার মাশুল লাগিবে না। ভারতবর্ষের লোকেরা পনের সেরই বহন করিতে পারে। এই কারণেই আইনে পনর সের নির্ধারিত হইয়াছে। আমরা দুই মন বহন করিতে পারি। কাজেই ইহাই আমাদের পনর সের।

তবে কি চেকার বাবু তাহার এই যুক্তি মানিয়া নিতে পারে? কখনই না। সে ইহাই বলিবে যে, আমরা আইনের রহস্য বা যুক্তি কিছুই জানি না। আমাদের নিকট রেলওয়ে গাইড্‌ রহিয়াছে। তাহাতে আইন এইরূপই রহিয়াছে যে; পনর সেরের অতিরিক্ত মাল হইলে উহার লাগেজ বুক করিতে হইবে। উহাতে হিন্দুস্থানী এবং কাবুলীর কোন ভেদাভেদ নাই। দুনিয়ার সমস্ত সভ্য লোকই এই উত্তরকে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মানিয়া নিবেন।

এইরূপে আমিও ওযূ ফরয হওয়ার উক্ত উদ্ভট যুক্তির উত্তরে বলিতেছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নামাযের জন্য ওযূ ফরয করিয়াছেন। উহাতে সভ্য ও গেঁয়ো লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং গ্রাম্য এবং শহরে সকলের উপরই ওযূ করা ফরয। আমি কোরআনে তোমাদিগকে ব্যাপক নির্দেশ দেখাইতে পারি। ইহা ভিন্ন আমি আর কিছু জানি না। আমরা জানি না, এই নির্দেশ বা বিধানের যুক্তি বা কারণ কি?

॥ আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক ॥

উপরোক্ত বিষয়টি এই প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছিল যে, মানুষ মনে করিয়া থাকে, কোন ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কিংবা কোন পার্থিব উপকারার্থে তাবীয,

মন্ত্র-তন্ত্র ইত্যাদি আমল করা সকল অবস্থায়ই জায়েয, চাই কি তাহাতে শয়তানেরই সাহায্য লওয়া হউক, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। আর আমি বলিয়াছিলাম যে, পার্থিব ক্ষতি কোন ক্ষতি নহে। আসল ক্ষতি আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষ। কিন্তু মানুষ ইহাকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে করে। মনে করে, এখনই কি আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ হইবে? পাপ কার্য করিয়া লই, পরে তওবা করিব। পাক ছাফ হইয়া আল্লাহ্‌র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। আমি বলি, প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সাক্ষাতের সময়টুকু কাহারও জানা নাই। হইতে পারে, এই নিশ্বাসই শেষ নিশ্বাস। আপনার যদি জীবনের উপর এতই ভরসা থাকে, তবে বলুন, তওবা করার ভরসায় পাপ কার্য করা কোন্ বুদ্ধিমত্তার কাজ? ইহার দৃষ্টান্তও তো ঠিক সেইরূপ—যেমন, কেহ বিষের ক্রিয়ানাশক তিরইয়াকের ভরসায় বিষ পান করিল কিংবা সাপের মন্ত্র জানে বলিয়া সাপ দ্বারা নিজেকে দংশন করাইল। মনে করে, তিরইয়াক দ্বারা বিষের ক্রিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে এবং মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করিয়া সাপের বিষ নামাইয়া ফেলিবে। তবে যাহারা তওবার ভরসায় গুনাহের কাজ করিয়া থাকে। তাহারা কি এরূপ করিতে পারিবে? কখনও পারিবে না। এতদ্ভিন্ন আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্কও তো আছে। ইহাই কি সেই মহব্বতের প্রমাণ?

বন্ধুগণ! কোন আশেক যদি জানিতে পারে যে, আমার মা'শুক অমুক কাজে অসন্তুষ্ট হন। সে কি কখনও এরূপ কল্পনা করিতে পারে যে, এখনও তো মা'শুকের সঙ্গে সাক্ষাতের বিলম্ব আছে, চল, সেই কাজটি করিয়াই লই। বন্ধুগণ! সত্যি-কারের প্রেমিক কখনও এরূপ করিতে পারে না। তাহার প্রেম কখনও প্রিয়-জনের মরযীর বিপরীত করিবার জন্য তাহাকে অনুমতি প্রদান করে না। সাক্ষাতে যত বিলম্বই থাকুক না কেন, বরং সাক্ষাতের সম্ভাবনা না থাকিলেও না। কিন্তু দুঃখের বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আমরা উহার বিপরীত ব্যবহার করিতেছি। মনে হয়, পূর্ণ মহব্বতই নাই, তবে এমতাবস্থায় তো অভিযোগের কারণ আরও অধিক হইয়া দাঁড়াইল। আমরা স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কেমন মহব্বত রাখিতেছি! একটি সামান্য সুশ্রী আকৃতির প্রতি আমাদের কেমন আন্তরিক সম্পর্ক হইয়া যায়—অথচ আল্লাহ্ তা'আলার সহিত এই শ্রেণীর মহব্বত হয় না। যিনি প্রতাপে, সৌন্দর্যে, গুণে এবং দানে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিপূর্ণ; বরং সামান্য যাহাকিছু সৃষ্ট-জীবের মধ্যে আছে উহাও তাঁহারই দান। কবি বলেন:

اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن + صبر چوں داری ز رب ذو المنن

اے کہ صبرت نیست از دنیائے دوں + صبر چوں داری ز نعم الماھدوں

"ওহে, তুমি স্ত্রী-পুত্র হইতে ছবর করিতে পারিতেছ না। অসীম অনুগ্রহশীল আল্লাহ্ তা'আলা হইতে কেমন করিয়া ছবর করিতেছ? ওহে, তুমি তুচ্ছ দুনিয়া হইতে

ছবর করিতে পারিতেছ না, আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হইতে কেমন করিয়া ছবর করিতেছ ?"

আল্লাহ্ তা'আলার সহিত যদিও মৌলিক মহব্বত আছে; কিন্তু অন্যান্য বস্তুর মহব্বত উহাকে পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে, এই কারণে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। মানুষকে সাপে কাটিলে নিম পাতার তিক্ততা সে অনুভব করিতে পারে না। এইরূপে আমাদিগকে দুনিয়ার সাপে কাটিয়াছে এই কারণেই খোদার অসন্তোষের তিক্ততা আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না ; বরং অন্য কথায় এরূপ বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষের সুমিষ্ট স্বাদই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি নাই। কাজেই তাঁহার অসন্তোষের তিক্ত স্বাদের অনুভূতিও আমাদের নাই। اَلْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا অর্থাৎ, প্রত্যেক বস্তুর তথ্য উহার বিপরীত বস্তুর দ্বারা জানা যায়। হযরত আউলিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষের মিষ্ট স্বাদ উপভোগ করিয়াছেন। কাজেই তাঁহারা আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের তিক্ত স্বাদ অনুভব করিতে পারেন। তরীকত-পন্থীর হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপনজনিত এক মিষ্ট-স্বাদ বিদ্যমান থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক থাকার কারণে তাঁহাদের অন্তরে এক প্রকারের নূর বা জ্যোতি উৎপন্ন হয়, যাহা হারাইয়া ফেলিলে তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ দাঁড়ায় :

بر دل سالک ہزاراں غم بود + گر زباغ دل خلالے کم بود

"তরীকত-পন্থীদের আন্তরিক অবস্থা কিছু মাত্র হ্রাস পাইলে তাঁহাদের অন্তরের উপর দুঃখ ও চিন্তার পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ে। আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের অনুভূতি অন্য লোকের কেমন করিয়া হইবে ? অন্তর তো পূর্ব হইতেই রুটি সেঁকিবার তাওয়ার ন্যায় কাল হইয়া রহিয়াছে। হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্পর্ক স্থাপন পূর্বক নূর উৎপন্ন কর। তখন বুঝিতে পারিবে—আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষের তিক্ততা কেমন। অতঃপর এই বিষয়টি আপনাআপনিই বুঝে আসিবে যে, বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির আসল ক্ষতি। উহার মুকাবেলায় দুনিয়ার লাভ-লোকসানের কোন অস্তিত্বই নাই।

॥ হারাম হওয়ার ভিত্তি ॥

এই মাসআলাটিকে কোরআনে মজিদের মধ্যে পরিষ্কার ভাবে মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

وَاِثْمُهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا *

"মানুষ আপনাকে শরাব এবং জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, উহা হালাল না হারাম। আপনি বলুন, ইহাদের মধ্যে একটি গুনাহ্ আছে কিন্তু তাহা অতি বড় গুনাহ্ আর ইহাতে মানুষের নানাবিধ লাভ আছে। সোব্হানাল্লাহ্! কেমন নিখুঁত প্রণালীর উত্তর! অর্থাৎ শরাব এবং জুয়া হারাম হওয়া সম্বন্ধে মানুষের মনে এই ধোকা হইতে পারিত যে, এতদুভয়ের মধ্যে মানুষের পার্থিব লাভ অনেক আছে। সুতরাং এগুলি হারাম না হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সন্দেহের মৌলিকতা অস্বীকার করেন নাই; বরং উহাকে স্বীকার করিতেছেন যে, বাস্তবিকই উহাতে মানুষের লাভও আছে এবং সেই লাভও একটিই নহে; বরং এক বচনের পরিবর্তে বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করিয়া দেখাইতেছেন যে, উহাতে অনেক লাভ আছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে তাহাতে আবার একটি গুনাহ্ও আছে।

এস্থলে একটি কথা লক্ষ্যণীয় এই যে, লাভের ক্ষেত্রে তো "منافع للناس" বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আর ক্ষতির ক্ষেত্রে এক বচনের শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন إِثْمٌ। ইহা যদি খোদার কালাম না হইয়া কোন মানুষের কালাম হইত, তবে সামনাসামনি হওয়ার জন্য ক্ষতির ক্ষেত্রেও বহুবচনের শব্দ آثام। (অনেক গুনাহ্) বলা হইত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা এস্থলে এই সূক্ষ্মতত্ত্বটি জানাইয়া দিতে চাহেন যে, কোন বিষয়ে যদি হাজার হাজার লাভও থাকে, কিন্তু তৎসঙ্গে উহার মধ্যে একটি গুনাহ্ থাকিলেও অর্থাৎ, যদি তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা অসন্তুষ্ট হওয়ার আভাষও থাকে, তবে ঐ হাজার লাভ সেই একটি মাত্র গুনাহের মুকাবেলায় তুচ্ছ এবং কিছুই না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার সামান্য একটু সন্তোষ যেমন বিরাট সম্পদ, কারণ আল্লাহ্ বলেন: وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ "অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলার সামান্য সন্তোষও অতি বৃহৎ" তদ্রূপ তাঁহার সামান্য অসন্তোষও ভীষণ আযাবের কারণ, উহার কারণ একটি গুনাহ্ই হউক না কেন। এই কারণেই এখানে إِثْمٌ শব্দটি একবচন ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু উহাকে كَبِيرٌ অর্থাৎ' 'বৃহৎ' বিশেষণে বিশেষিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সারকথা এই যে, শরাব এবং জুয়ার মধ্যে লাভ তো অনেকই আছে। কিন্তু তাহাতে একটি গুনাহ্ আছে। সেই একটি গুনাহ্ও এত বৃহৎ যে উহা সেই লাভসমূহকে বিলীন করিয়া দিয়াছে। এই কারণে সম্মুখের দিকে বহুবচনের শব্দ منافع ব্যবহার করেন নাই; বরং এক বচনের نفع শব্দ বলিয়াছেন: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا অর্থাৎ, উভয়ের গুনাহ্ উহাদের লাভ অপেক্ষা অনেক বড়। এস্থলেএক বচনের শব্দ نفع ব্যবহার করার কারণ পূর্বোক্ত কথা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, উক্ত লাভসমূহের মুকাবেলায় একটি গুনাহ্ও আছে। আর নিয়ম এই যে, এক মন মিষ্টির সঙ্গে যদি এক তোলা পরিমাণ বিষ মিশান থাকে, তবে সেই সাকুল্য মিষ্টিও ঐ এক তোলা বিষের কারণে

নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপে যখন উক্ত লাভসমূহ একটি গুনাহের কারণে নষ্ট হইয়া গেল তখন উহা আর বহুবচনের শব্দে প্রকাশ করার যোগ্য রহিল না। এই কারণেই আল্লাহ্ বলিয়াছেন : وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا এই আয়াতটি দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গেল যে, পার্থিব লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে কোন বস্তু বা কার্য হারাম এবং পাপযুক্ত হয় না। যেমন, কোন কোন মানুষ মনে করিয়া রাখিয়াছে। আরকোনকোন সময় তাহারা মুখে বলিয়াও ফেলে যে, এই কাজ করাতে ক্ষতি কি ? ইহা তো লাভজনক বস্তু। যেমন, তাবীয এবং মন্ত্র-তন্ত্রের ব্যাপারে বহু লোক এই ধোকায় পতিত রহিয়াছে যে, যে কাজ মানুষের উপকার হয় তাহা জায়েয—উহাতে শয়তান হইতেই সাহায্য লওয়া হউক কিংবা যতই গর্হিত শব্দ ব্যবহার করা হউক না কেন। আপনি দেখিতে পাইয়াছেন যে, শরাব এবং জুয়ার মধ্যে মানুষের জন্য একটি লাভ নহে, বহু সংখ্যক লাভ রহিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাহা হারাম—কেন ? শুধু এই জন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না, উহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এখন বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তোষই যাবতীয় বস্তু বা কার্য হারাম হওয়ার ভিত্তি।

অতএব, বুঝা গেলযে, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "কার্যসমূহের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভরশীল" হাদীসটি গুনাহের কাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। গুনাহের কাজ যে নিয়তেই হউক জায়েয হইতে পারে না; বরং উহার মতলব আমি পূর্বে যাহা বর্ণনা করিয়াছি তাহাই। অর্থাৎ, কোন কোন নেকআমল এমনও আছে যে, নিয়ম ব্যতিরেকে সওয়াব পাওয়ার উপযোগী হয় না। যেমন মুবাহ কার্যসমূহ। আর কতকগুলি কাজ আছে নিয়ত ভিন্ন শুদ্ধই হয় না। যেমন, নামায, রোযা প্রভৃতি।

॥ ওযূ ছাড়া নামায ॥

যেমন কোন ব্যক্তি যদি নামাযের ন্যায় অবস্থা ও আকৃতি করে ; কিন্তু নামাযের নিয়ত না করে, তবে তাহা নামায বলিয়া গণ্য হইবে না। এই প্রসঙ্গে আমি আপনাদিগকে একটি কথা বলিয়া দিতে চাই—যদিও তাহা বলিতে মন চায় না। কিন্তু শুধু এই উদ্দেশ্যে বর্ণনা করিতেছি যে, কোন সঙ্কট সময়ে যেন মানুষ নিজের ঈমান রক্ষা করিতে পারে এবং কুফরী হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কথাটি এই যে, কোন কোন সময় এমনও অবস্থা হয় যে, কোন বেনামাযী আসিয়া নামাযীর দলের মধ্যে আটকিয়া পড়ে। নামাযের সময় আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল নামাযী নামাযের জন্য তৈয়ার হইয়া যায়। এখন উক্ত বেনামাযী লোকটি বড় সঙ্কটে পড়ে। নামায না পড়িলে সকলে তিরস্কার করিবে, ভালমন্দ বলিবে, আর যদি নামায পড়িতে যায়, তবে বিপদ এই যে, তাহার উপর গোসল ফরয হইয়া রহিয়াছে। এখন সকলের সম্মুখে গোসল করিলে অধিকতর বদনাম অর্জন করিতে হয়। এবতাবস্থায় বেনামাযী লোকটি দুর্নাম

হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য নামাযে যাইয়া শরীক হয়। আর ফেকাহ্ শাস্ত্রের আলেমগণ লিখিয়াছেন যে, অযূ ভিন্ন নামায পড়া কুফরী। অতএব, আমি বলি এরূপ সঙ্কটে পড়িয়া যদি কেহ নামায পড়িতে চায়, তবে সে যেন নামাযের নিয়ত না করে; বরং নিয়ত না করিয়া শুধু নামাযীদের অনুকরণ করিতে থাকে। এই উপায়ে সে কুফরী হইতে রক্ষা পাইবে যদিও এমতাবস্থায় সে নামায না পড়ার পাপে পাপী হওয়ার সাথে সাথে ধোকা দেওয়ার পাপেও পাপী হইবে। কেননা, মানুষ তাহাকে নামাযী মনে করিবে—অথচ সে বেনামাযী; কিন্তু কুফরী হইতে তো রক্ষা পাইবে।

দেখুন, শরীয়তে কেমন সুন্দর সুবিধা প্রদান করিতেছে। পাপীও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না। তবুও দুঃখের বিষয় মানুষ শরীয়তকে সংকীর্ণ বলিয়া অখ্যায়িত করিয়া থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র ওয়াস্তে আপনারা সর্বদা এই সুবিধাটি ভোগ করিবেন না এবং এইরূপ অবস্থায় ইমামতিও করিবেন না। অন্যথায় সমস্ত নামাযীর নামাযের বোঝা আপনার ঘাড়ে চাপিবে। ফলকথা, দোষের কাজ করিতেও বুদ্ধি-কৌশলের প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি যদি দুর্নামের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অযূ ভিন্নই নামাযে শরীক হইয়া পড়ে, তবে কুফরী হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে ব্যক্তির নামাযের নিয়ত না করা কর্তব্য। আজকাল অনেক মানুষ এমন আছেন যাহাদিগকে নামাযী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বিনা ওযূতে ঢুঁ মারিতেছে; কিংবা বিনা ওযরে নামাযের কোন কোন রুকন ত্যাগ করে (যেমন, খাড়া হইয়া নামায পড়া)। দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর লোক সমাজের বরেণ্য এবং নেতাও সাজিয়া বসেন।

॥ লীডারদের নামায ॥

যেমন, জনৈক নেতা যিনি প্রথমে তো বেনামাযীই ছিলেন, এখন কিছু দিন ধরিয়া তিনি নামাযী হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অবস্থা এই যে, একবার তিনি গাড়ী হইতে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া সোজা মোটরকারে যাইয়া উঠিলেন, নামাযের সময় হইয়াছিল, কাজেই তিনি মোটর গাড়ীতে বসিয়াই নামায আরম্ভ করিয়া দিলেন।

এই নেতা সাহেবেরই আর এক দিনের ঘটনা। এক দিন নামাযের সময় হইল, পানি ছিল না। তাইয়াম্মুমের প্রয়োজন হইল। তিনি তাইয়াম্মুমের নিয়ম জানিতেন না এবং কাহারও নিকট এই কারণে জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কেননা, লীডার ও সমাজের নায়ক হইয়া কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করা দোষের কাজ বলিয়া মনে করিলেন। লোকে বলিবে, চমৎকার লীডার তাইয়াম্মুমের নিয়মও জানেন না। অবশেষে নিজেই তাইয়াম্মুম আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং প্রথম কাজ তিনি এই করিলেন যে, মাটি লইয়া ঠিক তেমনিভাবে হাতে ঘষিতে আরম্ভ করিলেন যেমনিভাবে ওযূর মধ্যে পানি দ্বারা হাত ধৌত করা হয়। অথচ তাইয়াম্মুমের সম্বন্ধে শরীয়তের হুকুম এই যে,

মাটিতে হাত মারিয়া মাটি ঝাড়িয়া ফেলিয়া অতঃপর হাত মুছিতে হয়। কেননা শরীরে ধূলাবালি মাখাইতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে। কারণ,ইহাকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে বিকৃত ও বীভৎস করা হয়। মানুষের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়। সোব্‌হানাল্লাহ্‌, কেমন অনুগ্রহ! তোমার আকৃতিও বিকৃত করিতে চাহেন না। যাহা হউক, সেই লীডার সাহেব প্রথমে তো হাতের উপর মাটিকে পানির ন্যায় ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর মুখের ভিতরেও মাটি দিলেন, যেন তিনি মাটি দ্বারা কুল্লি করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সকলে হাসিয়া উঠিলএবং সকলেই তাঁহার অজ্ঞতা বুঝিতে পারিলেন। এমন হাস্যাস্পদ অবস্থা সৃষ্টি না করিয়া ; বরং প্রথমে চুপে চুপে কাহারও নিকট হইতে তাইয়াম্মুমের নিয়ম জানিয়া লওয়াই তো ভাল ছিল। তখন অজ্ঞতা প্রকাশ পাইলে এক জনের নিকট প্রকাশ পাইত। অথবা অপেক্ষা করিয়া অন্যান্য লোকদের তাইয়াম্মুমের প্রণালী দেখিয়াও লইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি নিজেই এজতেহাদ করিয়া কাজ সমাধা করিলেন। ইহাতে সকলেই জানিতে পারিল যে, লোকটি একেবারে জাহেল। এতদসত্ত্বেও তিনি মুসলমানদের নেতা ও লীডার বনিয়াছেন।

আর এক সাহেবের ঘটনা—তিনি সফরের অবস্থায় মাগরেবের নামাযের ইমামতি করিতেছিলেন। দুই রাকাআত পড়িয়াই সালাম ফিরাইয়া দিলেন। মুকতাদিগণ জিজ্ঞাসা করিলঃ "আপনি এরূপ করিলেন কেন?" তিনি বলিলেন ঃ "আমি মুসাফির কাজেই 'কছর' পড়িলাম।"

আর এক সাহেব সফরের অবস্থায় মুকিম ইমামের পাছে নামায পড়িতেছিলেন। ইমাম দ্বিতীয় রাকাআত শেষ করিয়া তৃতীয় রাকাআতের জন্য দাঁড়াইতে আরম্ভ করিলে ইনি সালাম ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে লোকে তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন ঃ "আমি মুসাফির, কাজেই আমি কছর পড়িলাম।"

ফলকথা, আজকাল অনেক লোক এরূপ নামাযীও আছেন যে, বাহিরে নামাযী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু জানি না—নামাযের মধ্যে কত প্রকারের বিশৃঙ্খলা করিয়া বসেন। প্রত্যেকেই নিজের মতানুযায়ী যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। মাস্‌আলা শিখিয়া লইতে লজ্জা বোধ করে। একমাত্র অহংকারই এ সমস্ত অনর্থের মূল। কোন এক জন মোল্লার নিকট কয়েকটি উর্দু কিতাব পড়িয়া লইলেও এত লজ্জিত হইতে হইত না। এই অভিযোগ কেবল সাধারণ লোকের বিরুদ্ধেই নহে ; বরং কিছু সংখ্যক মৌলবীও আছেন যাঁহারা হেকমত বিজ্ঞান নিয়া ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারাও এরূপই করিয়া থাকেন।

॥ মৌলবীর পরিচয় ॥

জনৈক মৌলবী সাহেব, যিনি আজকাল বড়বিখ্যাত লীডার হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে তিনি এক আরবী মাদ্রাসায় চাকুরী করিতেন। দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে তো

খুবই বিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ ছিলেন যে, সেই চাকুরীর সময়েই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর মাদ্রাসায় আসিলে দেখা গেল তাঁহার হাতে মেন্দী লাগান রহিয়াছে। মোটকথা, কিছু সংখ্যক মৌলবী জাহেলও হইয়া থাকে; বরং এরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোন কোন জাহেল মৌলবী নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। কেননা, আসল মৌলবী তাঁহারাই যাঁহারা আল্লাহ্ওয়ালা। আল্লাহ্ওয়ালা লোক কখনও শরীয়ত সম্বন্ধে জাহেল হইতে পারে না। কিন্তু আজকাল আরবীর দুই চারিটি কিতাব পড়িলেই তাহাকে মৌলবী বলা হয়। যদিও সে শুধু হেকমত মানতিকের এবং সাহিত্যের দুই চারিটি কিতাবই পড়িয়াছে মাত্র। দীনিয়াত সম্বন্ধে একটি সবকও পড়ে নাই। অথচ এই ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে মৌলবীই নহে।

যদি হেকমত, বিজ্ঞান পাঠ করিলেই মানুষ মৌলবী হইয়া যায়, তবে এরিষ্টটল এবং জালিনূস সর্বপেক্ষা বড় মৌলবী হওয়া উচিত। কেননা, ইহারা দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের ইমাম, অথচ তাহাদের একত্ববাদী হওয়া সম্বন্ধেও মতভেদ রহিয়াছে। আর যদি আরবী সাহিত্য পড়িলে আরবী ভাষায় কথাবার্তা বলিতে পারিলে এবং প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই মৌলবী হওয়া যায়, তবে আবু লাহাব এবং আবু জাহাল সবচেয়ে বড় মৌলবী হওয়া উচিত। কেননা, ইহারা আরবী ভাষাবিদ, মার্জিত ভাষী ও সুপণ্ডিত ছিল। অতএব, কেবল মাত্র বিজ্ঞান এবং সাহিত্য পাঠ করিয়া কেহ মৌলবী হইতে পারে না। কিন্তু আজকাল তাহাদিগকেও মৌলবী নামে বিখ্যাত করিয়া দেওয়া হয়। এই রোগটি পূর্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

যেমন, মোল্লা মাহ্মূদ জৌনপুরী সেই যুগে বড় আলেম বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অথচ সে ছিল একজন দার্শনিক মাত্র, শরীয়ত বিদ্যায় তাহার গভীর জ্ঞান ছিল না। কিন্তু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এমন কি, দিল্লীর বাদশাহ্ তাহাকে আহ্বান করিয়া খুবই সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বাদশাহের দরবারে পূর্ব হইতেই এক জন সান্নিধ্যপ্রাপ্ত মোল্লা ছিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এই ব্যক্তি দরবারে পাত্তা পাইলে আমার চাহিদা হ্রাস পাইবে। অতএব, তিনি এই ফিকিরে ছিলেন যে, কোন সুযোগ বাদশাহের কাছে মোল্লা মাহমূদের অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া দিতে পারিলে উদ্দেশ্য সফল হয়। দুনিয়াদার মৌলবীদের মধ্যে হিংসা প্রভৃতি রোগ বিরাজমান থাকে। যাহা হউক, এক দিন একটি জানাযা উপস্থিত হইলে সকলে মোল্লাকে জানাযার নামায পড়াইতে বলিল। তিনি মোল্লা মাহ্মূদকে বলিলেন: "আপনি থাকিতে আমি নামায পড়াইতে পারি না, আপনিই পড়াইয়া দিন। মোল্লা মাহ্মূদ অস্বীকার করিলেন, কিন্তু বারবার বলায় বাধ্য হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। উক্ত মোল্লা তাঁহার কানে কানে বলিয়া দিল, জনতা অধিক, কেরাআত একটু উচ্চৈঃস্বরে পড়িবেন। তিনি "আল্লাহু আকবার" বলিয়াই উচ্চ রবে আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্ পড়িতে

লাগিলেন। মুকতাদীরা সকলেই নামায ছাড়িয়া দিয়া হট্টগোল করিতে লাগিল। এই গণ্ডমূর্খ কোথা হইতে আসিয়াছে? জানাযার নামাযও পড়াইতে জানে না। মোটকথা, তাহাকে পাছে হটাইয়া দেওয়া হইল, এইরূপে সকলের মধ্যে তাহার মূর্খতা ছড়াইয়া পড়িল। যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম, কোন বেনামাযী যদি নামাযীদের মধ্যে আটক পড়িয়া যায়, তবে তাহার নামাযের নিয়ত করা উচিত নহে। কেননা, বেওযূতে নামায পড়িলে কাফের হইতে হয়।

।। বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়া ।।

এইরূপে ফেকাহ্‌ শাস্ত্রের আলেমগণ বলিয়াছেন: বিস্‌মিল্লাহ্‌ পড়িয়া হারাম মাল আদান-প্রদান করা বা ভক্ষণ করা কুফরী কাজ। এই প্রসঙ্গে আমার একটি মজার গল্প মনে পড়িল, জনৈক নাস্তিক তফ্‌সীরকার একটি তফ্‌সীরের কিতাব লিখিলেন, উক্ত কিতাবটি তাহাদের সম্প্রদায়ে খুব বিখ্যাত। কিন্তু আল্লাহ্‌র বান্দা উক্ত কিতাবের সূচনায় বিস্‌মিল্লাহ্‌ পর্যন্ত লেখে নাই। কেবল যেখান হইতে কোরআন আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে "বিস্‌মিল্লাহ্‌" লিখা হইয়াছে। তফ্‌সীরকারের ভূমিকার মধ্যে 'বিস্‌মিল্লাহ্‌' থাকে না। একথার জবাবে 'আল্‌বোরহান' পত্রিকার সম্পাদক খুব সুন্দর একটি কথা লিখিয়াছেন। তিনি কৌতুক কথার মত ইহার একটি চমৎকার কারণ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, আমাদের বন্ধুগণ প্রকৃতিবাদী। এই তাফ্‌সীর লেখকের ভূমিকা "বিস্‌মিল্লাহ্‌" ব্যতীত আরম্ভ করার বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন: ইয়োরোপীয় নাস্তিকদের নীতি অনুসরণই ইহার কারণ। কেহ বলিয়াছেন, মুসলমানদের বিরোধিতাই ইহার কারণ। কিন্তু আমি বলি, এই দুইটি কারণ হওয়া বিচিত্র নহে, তবে এতদসঙ্গে তৃতীয় একটি কারণ ইহাও আছে যে, তফসীরকার প্রথমেই জানিতেন, "এই কিতাবে আমি যাহাকিছু লিখিব সবই শরীয়তবিরোধী হইবে এবং হারাম কাজের প্রথমে বিসমিল্লাহ্‌ বলা কুফরী। কাজেই তফসীরকার নিজের ঈমান রক্ষার জন্য ভূমিকায় বিস্‌মিল্লাহ্‌ লিখেন নাই। খুব মজার কথা, যদিচ তফসীরকার নিজেও ইহা কল্পনা করিতে পারেন নাই।

ফলকথা, হারাম মাল খাওয়া ও হারাম মাল দান করার বেলায় "বিস্‌মিল্লাহ্‌" পড়িতে এবং সওয়াবের আশা করিতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে। এই মাস্‌আলাটি শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ হয়ত ঘাব্‌ড়াইয়া গিয়াছেন। মনে করিবেন, আমাদের অধিকাংশ মালই তো সন্দেহজনক হইয়া থাকে। উহা লেনদেন করিতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলিয়া যদি কাফের হইতে হয়, তবে সকলে বে-ঈমানই হইয়া পড়িবে দেখিতেছি। আমি বলিতেছি, আপনারা চিন্তিত হইবেন না। এই মাস্‌আলাটির উদ্দেশ্য এই যে, যে মাল নিশ্চিতরূপে হারাম উহাতে বিস্‌মিল্লাহ্‌ বলা নিষিদ্ধ। যেমন,

কেহ যদি ঘুষের টাকা গ্রহণের সময় বিস্মিল্লাহ্ বলে, সে ব্যক্তি নির্ঘাত কাফের হইয়া যাইবে। তবে যে মালে হারাম এবং হালাল উভয়ই মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে এবং হালাল অধিক উহা নিশ্চয়ই হারাম নহে ; বরং সন্দেহযুক্ত। ইহাতে বিস্মিল্লাহ্ বলা হারাম নহে। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, বিস্মিল্লাহ্ বলিলেই উহার সন্দিগ্ধতা ও ঘৃণেয়তা দুরীভূত হইবে না। যেমন, কোন কোন মূর্খলোক এরূপ মনে করিয়া থাকে। এইরূপে কেহ কেহ এরূপ মনে করে যে, ঘুষ কিংবা সুদের মাল হইতে কিয়দংশ খয়রাত করিয়া দিলে অবশিষ্ট মাল হালাল হইয়া যায়। ইহাও সম্পূর্ণ ভুল। আমি এই মাত্র বলিয়াছি, হারাম মাল দান-খয়রাত করাতে কাফের হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। ফলকথা, কোন হারাম কাজ কোন নিয়তের দ্বারা কিংবা বিস্মিল্লাহ্ বলার ফলে জায়েয হইয়া যায় না ; বরং এই জাতীয় কাজে খোদার নাম লইলে ঈমান বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। কেননা, ইহাতে খোদার নামের অপমান করা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তি পায়খানায় যাওয়ার সময় বিস্মিল্লাহ্ বলিল. ফকীহ্গণ বলিয়াছেন, ইহাতে কাফের হইয়া যাইবে। আর হাদীসে যে আসিয়াছে, "পায়খানায় যাওয়াকালে বিস্মিল্লাহ্ বলিও।" ইহার উদ্দেশ্য এই যে, পায়খানায় সীমার বাহিরে থাকিতে বিস্মিল্লাহ্ বলিও। এই অর্থ নহে যে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া বসিবার সময় বল। খুব স্মরণ রাখিবেন। আর ইহাতে হেকমত এই যে,হাদীসে বর্ণিত আছে, পায়খানার স্থানে নিকৃষ্ট প্রকৃতির শয়তানসমূহ থাকে। মানুষ উলঙ্গ হইলে সে তাহাদের গুপ্তস্থান দেখে। এই কারণে হুযূর (দঃ) স্বীয় উম্মতদের গুপ্তাঙ্গ শয়তানদের দৃষ্টি হইতে আবৃত রাখার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, পায়খানায় যাওয়ার প্রাক্কালে بِسْمِ اللهِ وَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ "আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করিতেছি,আর অপবিত্রতা ও অপবিত্র শয়তানদের দৃষ্টি হইতে আমি আল্লাহ্র আশ্রয় লইতেছি।" পড়িয়া লইবে। অতঃপর উহারা তোমার গুপ্তস্থান দেখিতেও পারিবে না এবং তোমাকে কোনরূপ কষ্টও দিতে পারিবে না।

এই কথাগুলি ওযূ ভিন্ন নামায পড়া এবং নিয়ত ছাড়া নামায পড়ার বর্ণনা প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে। তৎপুর্বে আসল বক্তব্য বিষয় ছিল, যে লাভে আল্লাহ্ তা'আলার অসন্তুষ্টি রহিয়াছে, তাহা লাভই নহে। দেখুন, কোন আশেকের নিকট যদি স্বর্ণ-রৌপ্য পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু মা'শুক তাহা দেখিতে না পায়, তবে আশেক কি উহাকে লাভের বস্তু বলিয়া মনে করিবে ? লাভের জিনিস উহাকে বলিতে হইবে যাহা মা'শুকের বা প্রিয়জনের পছন্দনীয় হয়। কবি বলেন ঃ

چوں در چشم شاهد نیاید زرت + زر وخاک یکساں نماید برت

"তোমার স্বর্ণ-রৌপ্য (প্রিয়জনের) দৃষ্টিগোচর না হইলে, তোমার স্বর্ণ এবং মাটি সম পর্যায়ভুক্ত দেখাইবে।"

॥ লাভজনক বস্তু ॥

এইরূপে মুসলমানদের জন্য লাভের বস্তু উহাই যাহাতে খোদা সন্তুষ্ট। আর যে বস্তুতে খোদা সন্তুষ্ট না হন। তাহা লাভের বস্তু নহে। তোমার কাছে যদি রাজত্ব থাকে খোদা তাহাতে সন্তুষ্ট না হন, তবে উহা কিছুই নহে। তোমরা খোদাকে সন্তুষ্ট রাখ, তাঁহার বিধানসমূহের অনুসরণ কর। তোমার রাজত্ব থাকুক কিংবা না থাকুক, আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভ করিতে যাইয়া ইহজগতে যদি তোমার ভাগ্যে রাজত্ব নাও জোটে, তবে পরজগতের রাজত্ব তোমারই হইবে। তাহা এত দৃঢ় ও শক্তিশালী হইবে যে, তোমার কোন শত্রু তাহা তোমা হইতে ছিনাইয়া নিতে পারিবে না। তবে হাঁ, যদি খোদাকে রাযী রাখিয়া তুমি দুনিয়ার মঙ্গলও লাভ কর,তবে উহা খোদার নেয়ামত। এইরূপে আভ্যন্তরীণ অবস্থা যদি কোন যেকেরকারী লাভ করিতে না পারে, কিন্তু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ হয়, তবে সে লাভের মধ্যেই আছে বলিতে হইবে। আর যদি কোন যেকেরকারী কিয়ৎপরিমাণ কাইফিয়ৎ ও হাল প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তাহার কার্যকলাপ আল্লাহ্‌র মরযীর বিপরীত হয়, তবে তাহার এই অবস্থা ও হালের কোনই মূল্য নাই।

[আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলার পথে ছালেকের অন্তরে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে বিভিন্ন অবস্থা সৃষ্টি হয়। যেমন, ছবর, শোক্‌র, ভয়, তাওয়াক্কুল ইত্যাদি। এই প্রাথমিক অবস্থাকে 'কাইফিয়ৎ' বলা হয়। অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ইহাদের যে কোনটি যখন অন্তরে স্থায়ী এবং বদ্ধমূল হয়, তখন ইহাকে বলে "হাল" বা স্থায়ী ভাব। —অনুবাদক]

হযরত খাজা ওবায়দুল্লাহ্ আহ্‌রার বলিয়াছেন :

بر آب روی خسے باشی - بر ھوا پری مگسے باشی - دل بدست آر کہ کسے باشی

এই উক্তিটি পদ্য নহে; বরং গদ্য। ইহার অর্থ এই যে, তুমি কামালিয়াৎ হাছিল করিয়া হাওয়ায় উড়িবার ক্ষমতা লাভ করিলে এমন কি বাহাদুরী হইল? একটি মাছির সমান হইলে মাত্র। কেননা, মাছিও হাওয়ায় উড়িতে পারে। আর যদি পানির উপর দিয়া হাঁটিবার ক্ষমতা লাভ করিলে, তবে একটি তৃণ বা কুটার সমান হইলে, সুতরাং এ সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা কোন গুণের মধ্যে গণ্য নহে, এখন গুণের মধ্যে শুধু রহিল এতটুকু دل بدست آر کہ کسے باشی উহার সার মর্ম এই যে মাহ্‌বুবকে সন্তুষ্ট কর, তখন তুমি মানুষে পরিণত হইবে।

এই স্থান হইতে তরীকত-পন্থীদের বুঝা উচিত, যে সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা ও অবস্থার জন্য তাহারা পাগল, তাহা কোন বস্তুই নহে; বরং তরীকতের আসল উদ্দেশ্য মাহ্‌বুবকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহ্ তা'তালার সন্তোষ লাভ করিতে পারিলে কাশ্‌ফ এবং কারামত হাছিল না হইলেও কোন ক্ষতি নাই। আর তাঁহার সন্তোষ

লাভ করিতে না পারিলে হাজার কাশ্ফ এবং কারামতেও কোন ফল নাই। বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মানিয়া চলাই তাঁহার সন্তোষ লাভ করার একমাত্র পথ। সুতরাং আল্লাহ্র বিধান মান্য করাকেই আসল উদ্দেশ্য মনে কর। এই কারণেই 'হাল' বা কাইফিয়ত লাভ করার চেষ্টা অপেক্ষা শরীয়ত অনুযায়ী আমল করিয়া আল্লাহ্র সন্তোষ লাভ করার প্রতিই আমি অধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়া থাকি। যেকেরকারীর উপর কোন 'হাল' বা কাইফিয়তের আবির্ভাব হইল কি না সেদিকে আমি আদৌ লক্ষ্য করি না ; বরং সে যথারীতি শরীয়ত অনুযায়ী আমল করার প্রতি গুরুত্ব দেয় কি না সেদিকেই আমার লক্ষ্য অধিক। সার কথা এই যে, যাহেরীই হউক বা বাতেনীই হউক কোন প্রকারের 'হাল' বা কাইফিয়ত লাভ করা তরীকতের উদ্দেশ্য নহে ; বরং তরীকতের আসল উদ্দেশ্য হইল, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভ করা। সুতরাং শুধু ইহারই জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য।

॥ তন্ত্র-মন্ত্র এবং ওযীফা আমল করা ॥

যাদু ও তন্ত্র-মন্ত্রের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমি বলিতেছিলাম, উপকার বা হিত সাধনের উদ্দেশ্যে করিলেই হারাম কাজ জায়েয হইয়া যায় না। অতএব, নিয়ত যতই ভাল হউক না কেন শয়তানী যাদু-মন্ত্রের আমল তো মূলের দিক দিয়াই গুনাহের কাজ। কোনরূপেই এবং কোন উদ্দেশ্যেই উহা জায়েয হইতে পারে না।

আবার কোরআন শরীফের আয়াত প্রভৃতি শরীয়ত সম্মত উচ্চাঙ্গের আমলও সকল অবস্থায়ই জায়েয নহে। যদি কেহ তদ্রূপ উচ্চাঙ্গের ওযীফা আমল করিতে ইচ্ছা করে, তবে প্রথমে দেখিতে হইবে তাহার উদ্দেশ্য কি ? কোন বেকার ব্যক্তি হালাল চাকুরী লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ মুক্ত হওয়ার নিয়তে অর্থাৎ, কোন হালাল কার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উক্ত ওযীফা আমল করিলে জায়েয হইবে। কিন্তু কোন বেগানা স্ত্রী লোককে বশ করিবার উদ্দেশ্যে ওযীফা আমল করা হারাম। বিবাহ ব্যতীত রক্ষিতার ন্যায় বশ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে তো হারাম হইবেই। বিবাহ করার উদ্দেশ্যে বশ করাও হারাম। কেননা, ঐ স্ত্রী লোকটিকে বিবাহ করা তাহার জন্য ওয়াজেব নহে। তবে যদি কাহারও বিবাহিতা স্ত্রী অবাধ্য হইয়া পড়ে—তাহাকে বশ করিবার উদ্দেশ্যে 'ওযীফা' আমল করা জায়েয হইবে। এইরূপে কোন স্ত্রী-লোকের স্বামী অত্যাচারী হইলেও তাহাকে বশ করার জন্য 'আমল' করা জায়েয। কিন্তু এই মাস্আলাটির কোন কোন অবস্থা খুবই সূক্ষ্ম। কেহ কেহ সকল অবস্থায়ই অত্যাচারী স্বামীকে বশ করার জন্য আমল করা জায়েয মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ কোন কোন অবস্থাকে হারাম বলিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, কোন স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে বশ করিবার নিমিত্ত ওযীফা আমল করিতে চাহিলে উহার বিবরণ

এইরূপ—স্বামী যদি স্ত্রীর হক আদায়ে ত্রুটি করে' তবে ঐ হক হাছিল করিবার জন্য ওযীফা আমল করায় দোষ নাই। কিন্তু হক্ আদায় করিলে শুধু স্বামীকে নিজের প্রতি প্রেমোন্মত্ত ও আসক্ত করার উদ্দেশ্যে ওযীফা আমল করা জায়েয নহে। এইরূপে কোন আমীর লোককে কেবল এই উদ্দেশ্যে বশ করার জন্য আমল করা জায়েয নহে যে, তিনি আমাকে শ' পঞ্চাশ টাকা দান করিবেন, কিন্তু যদি কোন আমীর লোকের নিকট আমি পঞ্চাশ টাকা পাওনা থাকি অথচ তিনি তাহা দেই-দিচ্ছি করিয়া দিতেছেন না। এমতাবস্থায় যদি আমি এই উদ্দেশ্যে ওযীফা পড়িতে থাকি যে, তিনি বশীভূত হইয়া আমার প্রাপ্য ঋণ পরিশোধ করিবেন, তবে তাহা জায়েয হইবে। কিন্তু শুধু এই উদ্দেশ্যে ওযীফা পাঠ করা যেন আমীর লোকটি আমার বশ হইয়া পড়েন এবং যখনই আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় আমাকে পঞ্চাশ টাকা দান করেন। এরূপ ওযীফা পাঠ সম্পূর্ণ হারাম। এই উদ্দেশ্যে আমলই পাঠ করা হউক কিংবা আত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগে বশ করা হউক উভয় প্রকারের বশীকরণই হারাম, কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ ইহাকে হারাম মনে করে না; বরং ইহাকে পীরের কারামত বা গুণ মনে করে এবং বলিয়া বেড়ায় যে, আমার পীর ছাহেব একটি দালান নির্মাণ করাইতেছিলেন। তাহাতে তিনি হাজার টাকার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। ইতিমধ্যে একজন ধনী লোক হুযুরের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাহার উপর সামান্য পরিমাণ আত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। লোকটি তৎক্ষণাৎ হুযুরের হাতে একখানি হাজার টাকার নোট প্রদান করিল। "বড়ই মোহিনী শক্তির অধিকারী বটেন।" স্মরণ রাখিবেন, মোহিনী শক্তির প্রভাবে মোহিত করিয়া যে পীর কাহারও নিকট হইতে টাকা আদায় করে, সে দস্যু, সে ডাকাত। মোহিনী শক্তি প্রয়োগে কাহারও নিকট হইতে টাকা আদায় করা, ভীতি প্রদর্শন ও ধমক প্রদানে কাড়িয়া লওয়ারই শামিল। কেননা, কাহারও উপর মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিলে সে ব্যক্তি মোহিত এবং অভিভূত হইয়া পড়ে। কাণ্ডজ্ঞান বলিতে কিছু থাকে না। একমাত্র মোহিনী শক্তির প্রভাবেই সে টাকা পকেট হইতে বাহির করিয়া দেয়, আন্তরিক সন্তোষের সহিত দান করে না। বস্তুতঃ সন্তুষ্ট চিত্তে দান করা ব্যতীত কোন মুসলমানের ধন-মাল গ্রহণ করা জায়েয নহে।

।। মোহিনী শক্তি ও মেস্‌মেরিযমের স্বরূপ ।।

এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত, মোহিনী শক্তি প্রয়োগ এবং মেসমেরিযম্ মূলতঃ একই বস্তু, শুধু এতটুকু পার্থক্য যে, যদি কোন বুযুর্গ লোক স্বীয় আত্মিক ক্ষমতা প্রয়োগে কার্য উদ্ধার করেন, তবে উহাকে "তাওয়াজ্জুহ্" বলা হয়, আর যদি কোন ভবঘুরে লোক আত্মিক শক্তি প্রয়োগে কার্যোদ্ধার করে, তবে উহাকে মেস্‌মেরিযম্

বলা হয়। কিন্তু মূল উভয়েরই এক। কেননা, উভয় ক্ষেত্রেই আত্মিক শক্তি এবং কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করা হয়। কেহ কেহ বুযুর্গদের 'তাওয়াজ্জুহ'কে তাঁহাদের প্রধান কামালিয়ৎ মনে করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কিছুই নহে। একজন মহাপাপী এবং ঘোর পাতকী ব্যক্তিও আত্মিক শক্তি প্রয়োগে উহার ক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারে। শুধু অভ্যাসের উপরই নির্ভর করে। কোন কোন মানুষ অভ্যাস এবং সাধনা ছাড়াই আত্মিক শক্তি প্রয়োগের জন্মগত ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে। ইহাতে কামালিয়তের কিছুই নাই। একজন বিধর্মী কাফের যে কাজ করিতে সক্ষম সে কাজে মুসলমান লোকের কামালিয়ৎ প্রকাশ পাইবে কেমন করিয়া? এই তত্ত্ব কথা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছে এমন একজন লোকই জীবনে আমি দেখিতে পাইয়াছি।

শাহ্জাহানপুরে একজন লোক ছিলেন। তিনি 'সেমা' (সঙ্গীত) ভালবাসিতেন। বড়ই খাঁটি লোক ছিলেন। তাঁহার আকীদাও ছিল ভাল, ত্রুটি বলিতে শুধু এটুকুই ছিল যে, সঙ্গীত ভালবাসিতেন। কিন্তু সঙ্গীত তাঁহার পেশা ছিল না। আল্লাহ্-ওয়ালা লোক ছিলেন। একবার তিনি আমাকে পত্র লিখিলেন, "আমার একজন শত্রু আমাকে বড়ই বিরক্ত করিত। এক দিন হঠাৎ আমি তাহাকে বদ-দোআ করিয়া ফেলিলাম—"ইয়া আল্লাহ্! এই লোকটিকে হালাক করিয়া দাও!" তৎক্ষণাৎ লোকটি হালাক হইয়া গেল।" কবি সত্যই বলিয়াছেন:

بس تجربه کردیم درین دیر مکافات + بادرد کشاں هر که در افتاد بر افتاد

"সত্যই প্রতিশোধের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। দরবেশদের সহিত শত্রুতায় যাহারা লিপ্ত হইয়াছে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।" বস্তুতঃ আল্লাহ্ওয়ালাগণের মনে দুঃখ দেওয়া মহাবিপদের কারণ। আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশোধ গ্রহণে স্পৃহা এক দিন তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যেমন হাদীসে কুদসীতেও আল্লাহ্ বলিয়াছেন:

مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ

"আমার ওলীর সহিত যে ব্যক্তি শত্রুতা পোষণ করে, আমার পক্ষ হইতে আমি তাহার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করি।" এখন বুঝিতেই পারেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা যাহার সম্বন্ধে এমন চরম ঘোষণা দান করেন তাহার পরিণতি কোথায়?

মাওলানা রূমী বলেন:

از خدا جوئیم توفیق ادب + بے ادب محروم ماند از فضل رب

بےادب تنها نه خود را داشت بد + بلکه آتش در همه آفاق زد

چوں خدا خواهد که پرده کس درد + میلش اندر طعنهٔ پاکاں برد

"আল্লাহ্র দরবারে আদবের 'তাওফীক' প্রার্থনা করিতেছি, বে-আদব আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। বে-আদব কেবল নিজের সর্বনাশই করে না;

বরং সমগ্র দিক-দিগন্তে আগুন লাগাইয়া দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে অপদস্ত ও পর্যুদস্ত করিতে চাহিলে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের তিরস্কার ও শত্রুতার প্রতি তাহার ঝোঁক চাপাইয়া দেয়।"

যাহা হউক, বুযুর্গ লোক আমাকে লিখিলেন, "আমি বদ-দোআ করিবার পর লোকটি মরিয়া গেল।" আমি বলিতেছি অন্য কাহারও এরূপ ঘটনা ঘটিলে, সে মুরিদগণের সম্মুখে বাহাদুরি দেখাইত—"দেখ আমার বদ-দোআর ফলে লোকটি হালাক হইয়া গেল। আমার বদ-দোআ কখনও ব্যর্থ হইতে পারে কি?" কিন্তু উক্ত বুযুর্গ লোকের অন্তরে এরূপ বাহাদুরীর পরিবর্তে এমন অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছিল যে, তিনি আমাকে লিখিলেন, আমি আশঙ্কা করিতেছি পাছে আমি খুনের অপরাধে অভিযুক্ত না হই। সোবহানাল্লাহ্! মনে খোদার ভয় থাকিলে অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। সেই চিঠিখানি পাঠ করিয়া আমি ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলাম এবং এই প্রশ্নটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার হৃদয় প্রশ্নকারীর প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কেননা, আমার জীবনে এই শ্রেণীর প্রশ্ন আমাকে কেহ করে নাই, প্রশ্নও আবার এমন বিষয়ে যাহা বাহ্যদৃষ্টিতে কারামতের সমপর্যায়ে মনে হইত।

তাঁহাকে আমি জবাবে লিখিলাম: "আপনার প্রশ্ন বাস্তবিক পক্ষে ঠিক ও প্রকৃত, কিন্তু বিষয়টি তফ্‌সীল সাপেক্ষ। বদ-দোআ করিবার কালে বদ-দোআকারীর মনে দ্বিবিধ অবস্থা বিরাজমান থাকিতে পারে। একটি অবস্থা এই যে, শুধু আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে কোন শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য কেবল মোটামুটি বা ভাষাভাষা প্রার্থনা জ্ঞাপন করা এবং তৎকালে নিজের মনের মধ্যে শত্রুকে হত্যা করার কোন আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা উদয় না করা। এমতাবস্থায় বদ-দোআর ফলে লোকটি মরিয়া গেলে বদ-দোআকারী খুনী বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, লোকটির মৃত্যুতে বদ-দোআকারীর বদ-দোআর কোন হাত নাই। বদ-দোআকারী কেবল আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে প্রার্থনা করিয়াছিল মাত্র। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ইচ্ছাক্রমে তাহাকে হালাক করিয়াছেন। তদুপরি মৃত ব্যক্তি বদ-দোআর পাত্র হইয়া থাকিলে বদ-দোআকারীর কোন পাপও হইবে না। তবে লোকটি বদ-দোআ পাওয়ার উপযোগী না হইয়া থাকিলে বদ-দোআকারী খুনের পাপে পাপী হইবে না বটে, কিন্তু অযথা বদ-দোআ করার পাপে অবশ্যই পাপী হইবে। এজন্য বদ-দোআকারীকে নিশ্চয়ই ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করিতে হইবে। অপর অবস্থাটি এই যে, খোদা তাআলার দরবারে প্রার্থনা করার সাথে সাথে নিজের অন্তরকেও শত্রুর ধ্বংসের প্রতি নিবিষ্ট করা এবং তাহাতে নিজের আত্মিক শক্তিও প্রয়োগ করা। এমতাবস্থায় বদ-দোআকারী যদি পূর্ব-অভিজ্ঞতা হইতে স্থির নিশ্চিত থাকে যে, তাহার বদ-দোআ বা আত্মিক শক্তি প্রয়োগ ফলপ্রদ নহে। যেমন কয়েকবার সে আত্মিক শক্তি প্রয়োগ ও বদ-দোআ করিয়া দেখিতে পাইয়াছে

যে, কোন ফল হয় নাই। এমতাবস্থায়ও বদ-দোআকারী খুনের পাপে পাপী হইবে না। অবশ্য মৃত লোকটি শরীয়ত অনুযায়ী কতলের যোগ্য না হইলে তাহাকে হালাক করার উদ্দেশ্যে বদ-দোআকারী খুন করিতে চাওয়ার পাপে পাপী হইবে, আর যদি তাহার বদ-দোআ বা আত্মিক শক্তি প্রয়োগ ফলপ্রদ হয় বলিয়া পূর্ব হইতে তাহার অভিজ্ঞতা থাকে, তবে তাহার বদ-দোআয় কেহ মরিলে, বদ-দোআকারী খুনী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। কেননা, তরবারির আঘাতে হত্যা করা আর আত্মিক শক্তি প্রয়োগে হত্যা করা সমান কথা, প্রভেদ কেবল এইটুকু যে, তরবারির হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যা, (قتل عمد) আর মোহমন্ত্রের প্রভাবে হত্যা উহার অনুরূপ হত্যা (شبه عمد)।

এখন দেখিতে হইবে যাহাকে আত্মিক শক্তি প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছে শরীয়ত অনুযায়ী সে ব্যক্তি হত্যার উপযোগী ছিল কি না। উপযোগী হইয়া থাকিলে তাহার উপর আত্মিক শক্তি প্রয়োগকারী অবশ্য হত্যাকারী বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু হত্যার পাপে পাপী হইবে না। কেননা,সে আত্মিক শক্তি যথাস্থানে প্রয়োগ করিয়াছে। আর মৃত লোকটি হত্যার উপযোগী না হইয়া থাকিলে মোহিনী শক্তি প্রয়োগকারী অবশ্য হত্যার পাপে পাপী হইবে। এমতাবস্থায় তাহার শাস্তি এই যে, তাহাকে হত্যার মূল্য তো দিতে হইবেই তদুপরি একটি গোলামও আযাদ করিতে হইবে। তদভাবে দুই মাস উপর্যোপরি রোযা রাখিতে হইবে এবং তওবা ও এস্তেগ্‌ফার করিতে হইবে। ইহাতে আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আত্মিক শক্তি প্রয়োগের প্রকৃত স্বরূপ কি।

স্মরণ রাখিবেন, আত্মিক শক্তি প্রয়োগে কাহাকেও হত্যা করা কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করা সকল অবস্থায় জায়েয নহে ; বরং উহার বিস্তারিত বিধান তাহাই যাহা এই মাত্র বর্ণনা করিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আজকাল ইহাকে কামালিয়ৎ মনে করা হয়। কেহই লক্ষ্য করিয়া দেখে না যে, কোন কোন সময় ইহাতে গুনাহ্‌ও হয়। মানুষ মনে করে—"আমি তো শুধু মনোনিবেশ (তাওয়াজ্জুহ্‌) করিয়াছিলাম, আমি হত্যা করিলাম কোথায় ?" খুব বুঝিয়া লও, আত্মিক শক্তি প্রয়োগে হত্যা করা এবং তরবারি দ্বারা হত্যা করা সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তি প্রয়োগ না করা উচিত। কেহ যদি আত্মিক শক্তি প্রয়োগে অভ্যস্ত নাও হয়,তাহার পক্ষেও এরূপ ক্ষেত্রে আত্মিক শক্তি প্রয়োগের সাহায্যে কার্য সিদ্ধির প্রয়াস পাওয়া উচিত নহে। কেননা, জন্মগত ভাবে কাহারও কাহারও আত্মিক শক্তি কার্যকরী হইয়া থাকে, যদিও সে উহা অবগত নহে। অতএব, এমনও হইতে পারে যে, আপনি নিজেকে কার্যকরী আত্মিক শক্তির অধিকারী বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আপনি আত্মিক শক্তির অধিকারী। এমতাবস্থায় যদি আপনি কাহাকেও ক্ষতি করার ইচ্ছা করিলেন অথচ সে উহার উপযোগী নহে এবং তাহার ক্ষতি হইয়াও গেল, তবে আপনি অবশ্যই পাপী হইবেন। তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্যে হত্যা করার বিধানও ইহাই বটে।

যেমন, কাঁচা ইট দ্বারা এক প্রকারের আমল করা হয়। যাহাকে হালাক করা উদ্দেশ্য তাহার জন্য একটি কাঁচা ইটের উপর আমল পড়া হয়। অতঃপর উহাকে কাফন ইত্যাদি পরাইয়া, উহার উপর জানাযার নামায পড়িয়া প্রবহমান নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পানির স্রোতে যতই ইটটি গলিতে থাকে ততই যাদুকৃত ব্যক্তি ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে। এমন কি, ইটটি গলিয়া যখন শেষ হইয়া যায়, তখন যাদুকৃত লোকটিও গলিয়া গলিয়া অবশেষে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহা বড় জঘণ্য আমল।

সুতরাং ভালরূপে বুঝিয়া লও যে, যদি সে ব্যক্তি কতলের উপযোগী না হয়, তবে নিশ্চয়ই তুমি হত্যার পাপী হইবে। কেহ কেহ বলে, আমি তো কোরআনের দ্বারা হত্যা করিয়াছি তবে পাপ হইবে কেন? আমি বলি, যদি একখানা ভারী কোরআন শরীফ কাহারও মাথায় এমন জোরে নিক্ষেপ কর যে, তাহার মাথা ফাটিয়া মরিয়া যায়, তবে কি তোমার পাপ হইবে না? নিশ্চয় হইবে।

॥ কোরআন হাদীসে অনুরূপ আমলের সীমা ॥

কোরআন হাদীস দ্বারা আমল করার মধ্যে প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যে উদ্দেশ্যে আমল করা হয় তাহা জায়েয কি না। দ্বিতীয়তঃ, আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমলের মধ্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি ভাল অর্থবোধক কি না। যদি কোরআন হাদীস অনুরূপ আমলের শব্দগুলি মন্দও না হয় ভালও না হয়, তথাপি তাহা জায়েয নহে। কোন কোন আমলকারী মোয়াক্কেলদের বিচিত্র বিচিত্র নাম বানাইয়া লইয়াছে। 'কিলকাঈল' 'দিরদাঈল' এবং এই ওযনে আরও বহু নাম। গযব এই যে, উক্ত আবিষ্কৃত শব্দগুলিকে আবার 'সূরা-ফীলের' আয়াতগুলির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকাইয়া দিয়াছে—

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ يَاكِلْكَائِيْلُ اَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِىْ تَضْلِيْلٍ يَادِرْدَائِيْلُ ❋

এইরূপে অনুমান করিয়া লউন। ইহা নিতান্ত বাজে, প্রথমতঃ, নামগুলি উদ্ভট। জানি না 'কিলকাঈল' ইহারা কোথা হইতে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। ইহারা এসমস্ত আমল অভ্যাস করিতে দিবা-রাত্র কিল্‌কিল্‌ই করিতে থাকে। আবার এই সমস্ত নামকে কোরআনের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া আরও বিচিত্র। জানি না, ইহারা এ সমস্ত মোয়াক্কেল কোথা হইতে স্থির করিয়া লইল। এ সমস্ত ইহাদের উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নহে। মনে হয়, এ সমস্ত নামকে উদ্দেশ্য করিয়াই আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন ঃ

إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ*

"উহা শুধু কতকগুলি নাম যাহা তোমার এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষগণ নিজেদের মনগড়া আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা এই সমুদয়ের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নাযিল করেন নাই।"

মোয়াক্কেল শব্দ লক্ষ্য করিয়া একটি মজার কাহিনী আমার মনে পড়িয়াছে। জনৈক উকিল সাহেব নিজ গৃহে মায়ের নিকট বসিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে বাহির হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে ডাক দিল। উকিল সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন: "কে?" সে ব্যক্তি ছিল একজন গ্রাম্য লোক, সে নিজের এক মোকদ্দমায় এই উকিল সাহেবকে উকিল নিযুক্ত করিয়াছিল। সে বলিল: "জী হাঁ, আমি আপনার মোয়াক্কেল।" উকিল সাহেব ঘরের বাহিরে যাইতেছিলেন। তৎক্ষণাৎ মা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "কোথায় যাও? এটা যে মোয়াক্কেল, তোমাকে মারিয়া ফেলিবে।" উকিল সাহেব তাঁহাকে বুঝাইলেন, "ইহা আমলিয়তের মোয়াক্কেল নহে; বরং এই ব্যক্তি তাহার মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আমাকে উকিল নিযুক্ত করিয়াছেন, উকিল নিযুক্তকারীকেও মোয়াক্কেল বলা হয়। মোটকথা, অনেক অনুরোধের পর মা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং বলিলেন, "যাও, খোদা হাফেজ।" এইরূপে বিচ্ছু-দংশনের একটি আমল আছে,—

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْ

পর্যন্ত পড়িয়া পানি পান করে। পরে حَرْ বলিয়া দষ্টস্থানে ফু দেয়। জানি না, এই অভিনব নিয়ম কোথা হইতে আবিষ্কৃত হইল। শৈশবে এইসব আমল আমিও লিখিয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু আমল কার্যকরী করার সুযোগ কখনও ঘটে নাই। শুধু এই বিচ্ছুর আমলটি জীবনে এক আধবার ভুলে চুকে হয়ত করিয়া থাকিব। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

অতএব, একথার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকিতে হইবে কোরআন হাদীসে অনুরূপ আমলিয়তের শব্দগুলি যেন উত্তম হয়, কোরআনের শব্দকে কখনও যেন বিকৃত করা না হয়। আমলিয়তের মধ্যে আরওএকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যে আমল দুনিয়ার হিতের জন্য করা হয়, তাহাতে কোন সওয়াব নাই ঐসমস্ত আমলে সওয়াবের বিশ্বাস রাখা বেদআত। কাজেই এই শ্রেণীর আমল মসজিদে বসিয়া পড়াও উচিত নহে এবং এই জাতীয় তাবীয-তুমার মসজিদে বসিয়া লেখাও উচিত নহে। কেননা, তাবীয লিখিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে তাহা ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য। ব্যবসায়ের কাজ মসজিদে বসিয়া করা উচিত নহে, ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ লিখিয়াছেন, যেই মুদার্রেস

কিংবা মোল্লা বেতন গ্রহণ করিয়া ছেলে-পেলেদিগকে তা'লীম দিয়া থাকেন, তাঁহার এই কার্য মসজিদে বসিয়া করা উচিত নহে। কেননা, পারিশ্রমিকের কাজ ক্রয়-বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত। এইরূপে যেই কাতেব পারিশ্রমিক গ্রহণে কেতাবৎ করিয়া থাকেন কিংবা যেই দরযী পারিশ্রমিক লইয়া সেলাইয়ের কাজ করেন, এসমস্ত লোকের মসজিদে বসিয়া নিজ নিজ কার্য করা জায়েয নহে। (কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ এ'তেকাফের অবস্থায় থাকিলে মসজিদে বসিয়া নিজ নিজ কার্য করিতে পারেন।) আর যদি কেহ নিজের জন্য কোন আমল করে, তাহা যদিও ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ নহে; কিন্তু দুনিয়ার কাজ, তাহাও মসজিদে বসিয়া করা উচিত নহে।

হযরত হাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহুর উক্তি হইতে আমি এই সূক্ষ্ম কথাটি অবগত হইয়াছি। এক ব্যক্তি তাঁহার খেদমতে আসিয়া আরয করিলেন, হুযূর আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, মসজিদের মধ্যে পায়খানা করিতেছি। হযরত হাজী ছাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন: "তুমি মসজিদে বসিয়া দুনিয়ার উদ্দেশ্যে কোন আমল বা ওযীফা পড়িয়া থাকিবে।" সে ব্যক্তি স্বীকার করিল। তখন তিনি বলিলেন: "দুনিয়া হাছিল করার জন্য মসজিদে বসিয়া ওযীফা পড়া উচিত নহে।"

অতএব, দেখুন, কোরআন হাদীসের সাহায্যে আমলিয়াত জায়েয হওয়ার জন্য এতগুলি শর্ত রহিয়াছে। এ সমস্ত মাস্‌আলা হয়ত আপনারা কখনও শুনেন নাই। এই কারণেই আমি বলি, কোন অভিজ্ঞ আলেম লোককে আঁকড়াইয়া ধর এবং তাঁহা হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া কাজ কর। ইহা একান্ত আবশ্যক। ইহা ব্যতীত কাজ চলিতে পারে না। ফলকথা, এ সমস্ত শর্তাধীনে তাবীয-তুমার, আমলিয়াত, বিভিন্ন প্রকারের যাদু আমল করা জায়েয। এ সমস্ত শর্ত সকল অবস্থায় হালাল যাদুর অন্তর্ভুক্ত নহে। যেমন, সাধারণ লোকেরা মনে করিয়া থাকে।

আমি বলিতেছিলাম, ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাদুর চর্চা অধিক। এই প্রসঙ্গে হালাল যাদু ও হারাম যাদুর বিভাগের বর্ণনা এত দীর্ঘ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়গুলি প্রয়োজনীয় ছিল। কাজেই এই বর্ণনা অনর্থক হয় নাই। এখন আমি আমার মূল বক্তব্যের দিকে ফিরিয়া আসিতেছি।

॥ যাদুর ক্রিয়া ॥

ইহুদি জাতির মধ্যে যাদুর চর্চা অধিক ছিল। তাহারা হারাম যাদুতে লিপ্ত ছিল। النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ-এর মধ্যে উহা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই আয়াতে স্ত্রী-যাদুকরদের উল্লেখ এই কারণে করা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকদের কৃত যাদু অধিক শক্তিশালী এবং ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে। ইহাতে আরও একটি দার্শনিক রহস্য রহিয়াছে, তাহা এই যে, যাদু এবং আমল প্রভৃতির ক্রিয়া সাধারণতঃ আত্মিক শক্তি প্রয়োগ এবং কল্পনা শক্তির

উপর নির্ভর করে। শব্দ আবৃত্তির বিশেষ অধিকার ইহাতে নাই। কিন্তু কোন বন্ধন বিভিন্ন কল্পনার মধ্যে শক্তি এবং একাগ্রতা জন্মে না বলিয়া কতকগুলি শব্দ উহার জন্য নির্ধারণ করিয়া লওয়া হয় এবং আমলকারীর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয় যে, এই শব্দগুলির মধ্যেই যাদুর ক্রিয়া নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতেই আমলকারীর এই ধারণা দৃঢ় হইয়া যায় যে, আমি এই শব্দগুলি উচ্চারণ করা মাত্র ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। তাহাতেই ক্রিয়া হইতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে উহা তাহার কল্পনারই ক্রিয়া, উচ্চারিত শব্দের ক্রিয়া নহে। শব্দের কোন ক্রিয়া নাই বলিয়া বিশ্বাস জন্মিলে আমলকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর হয়। আমলকারী যদি মনে করিতে থাকে যে, এ সমস্ত শব্দের কোনই ক্রিয়া নাই, তবে তাহার আমলেও কোন ফল হইবে না। কেননা, এরূপ ধারণা জন্মিবার পর তাহার কল্পনা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং সে ইতস্ততঃ করিতে থাকিবে—"ক্রিয়া হয় কি না হয়।" সুতরাং এ বিষয়ে আমলকারী অজ্ঞ থাকাই ক্রিয়ার জন্য হিতকর। কিন্তু যাদুর শব্দগুলির কোন নিজস্ব ক্রিয়া নাই; বরং ক্রিয়া শুধু কল্পনা ও আত্মিক শক্তির প্রভাবেই হইরা থাকে- ইহাই সত্য কথা।

আবার দেখুন, কোন কোন মানুষ প্রকৃতি এবং জন্মগতরূপেই মোহিনী শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে। তাহার নিজের কল্পনার মধ্যে একাগ্রতা অর্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টা এবং অধিক অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য অভ্যাসের দ্বারাও কতক লোক মোহিনী শক্তির অধিকারী হইয়া থাকে।

একবার একটি রহস্যময় আংটি ভারতবর্ষে অতিশয় বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল। উহার মধ্যে দৃষ্টি করিলে অনুপস্থিত এবং মৃতলোকের ছবি দেখা যাইত। উহাও নিছক কল্পনা শক্তিরই প্রভাব ছিল। এই কারণেই উহাতে এই শর্ত আরোপিত ছিল যে, অল্প বয়স্ক বালক কিংবা স্ত্রীলোক উক্ত আংটিতে দৃষ্টি করিলে ছবি দেখিতে পাইবে। এই শর্তটি আরোপ করার মধ্যে রহস্য এই যে, আপনি যদি কাহারো ছবি ধ্যান করেন এবং উক্ত ছবির কল্পনা মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে জমাইয়া লন, আর আংটির প্রতি দৃষ্টি-কারীর কল্পনার উপর আপনার কল্পনা শক্তির প্রভাব পতিত হয়, তবে আপনার মনে অঙ্কিত ছবিগুলিই তাহার দৃষ্টি পথে উদিত হইবে। আর যদি আপনি কাহারও ছবি কল্পনা না করেন; বরং মনে এই কল্পনা দৃঢ়ভাবে জমাইয়া লন যে, কোন ছবি তাহার দৃষ্টিগোচর না হউক, তবে একটি ছবিও কোন সময় তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে না।

কানপুর শহরে জনৈক মৌলবী সাহেব কিছু আমল অভ্যাস করিয়াছিলেন, উহার সাহায্যে তিনি অনুপস্থিত ও অদৃশ্য লোকের ছবি দেখাইয়া দিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল যে, যখনই কোন মানুষ আসিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিত, আমাকে অমুক ব্যক্তির ছবি দেখাইয়া দিন—তখনই তিনি তাহাকে বলিতেন: "যাও, অযু করিয়া হুজ্‌রার ভিতরে যাইয়া বস।" এদিকে তিনি ঘাড় নীচু করিয়া ধ্যান আরম্ভ করিতেন।

কিছুক্ষণ পরেই সেইলোকটি মেঘ অথবা আবছা ধোঁয়াটে কোন পদার্থ দেখিতে পাইত। অতঃপর উদ্দিষ্ট ব্যক্তির ছবি উহাতে তাহার দৃষ্টিগোচর হইত। ইহার স্বরূপ এই ছিল যে, মৌলবী সাহেব ধ্যানের সাহায্যে অপরের কল্পনার উপর নিজের ধ্যানের প্রভাব প্রয়োগ করিতেন। উহারই প্রভাবে তাহার কল্পনাকৃত বস্তুর মধ্যে সেই ছবির উদ্ভব হইত। একদিন সেই মৌলবী সাহেবের মজলিসে একজন তালেবে এলম উপবিষ্ট ছিল। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার নিকট অনুরোধ জানাইল—"আমাকে অমুক বুযুর্গ লোকের ছবি দেখাইয়া দিন।" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার অভ্যাস অনুযায়ী সে দিকে মনোনিবেশ করিলেন, উক্ত তালেবে এলেমটি তখন চুপি চুপি এই আয়াতটি পড়িতে আরম্ভ করিল:০ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا "আপনি বলুন, সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয়, মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বস্তু।" মৌলবী সাহেব কল্পনা শক্তি প্রয়োগের সাথে সাথে আগন্তুক লোকটির কল্পনায় সম্মুখে কিছু প্রাথমিক বিষয় দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ করিয়াছিল! কিন্তু তালেবে এলেমটি এই আয়াতটি পাঠ করা মাত্র সব কিছুই অন্তর্ধান হইয়া গেল। এখন মৌলবী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন: 'কিছু দেখিতে পাইলে?" সে বলিল: সামান্য কিছু দেখিতে পাইতেছিলাম—তাহাও এখন আর দেখিতে পাইতেছি না। কাম্য ছবি কোথা হইতে দেখিতে পাইব। মোটকথা, মৌলবী সাহেব খুবই শক্তি প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু আর কিছু দেখা গেল না। মৌলবী সাহেব লজ্জিত হইয়া বসিয়া রহিলেন।

এস্থলে আসল ব্যাপারটি ছিল এই যে, উক্ত তালেবে এলমটি মৌলবী সাহেবের কল্পনার বিপরীত এক কল্পনা নিজের মধ্যে দৃঢ় ভাবে জমাইয়া লইয়াছিল, ফলে উভয় কল্পনার মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া কোনই ক্রিয়া হয় নাই। সুতরাং আমি বলি, এসমস্ত যাদু এবং আমলিয়তের ক্রিয়া নিছক কল্পনা শক্তির প্রভাবেই হইয়া থাকে। কাজেই তাহারা কোন নাবালেগ ছেলে কিংবা স্ত্রী-লোকের উপর আমল করিয়া থাকে। কেননা, ইহাদের বিবেক-বুদ্ধি সামান্য। তাহাদিগকে যাহাকিছু বুঝাইয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই ধ্যানেই দৃঢ় ভাবে জমিয়া যায়। সেই ধ্যান বা কল্পনা অনুসারেই আকৃতিসমূহ তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বুদ্ধিমানের উপর ক্রিয়া কম হয়। কেননা, তাহাদের মনে খুঁত খুঁত করিতে থাকে—আমল-কারীর কথানুযায়ী ক্রিয়া হয়—কি না হয়। এই কারণেই স্বল্প বুদ্ধি যেকেরকারীর উপর 'হাল' এবং 'অবস্থা' অধিক আবির্ভূত হইয়া থাকে, কেননা, স্বল্প বুদ্ধি লোকের একাগ্রতা অধিক। আর একাগ্রতা মনের উপরই 'হাল' এবং কাইফিয়ত অধিক আবির্ভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান যেকেরকারীর হৃদয়ে 'হাল' ও 'কাইফিয়ত' কম হয়। কেননা, তাহার মস্তিষ্ক সকল অবস্থায়ই ক্রিয়াশীল থাকে। অতএব, যে সমস্ত

যেকেরকারীর হৃদয়ে হাল বা কাইফিয়তের আবির্ভাব হয় না, তাহাদের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই ; বরং তাহাদের এই মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকা উচিত যে, তাহাদের বুদ্ধি আছে কাজেই তাহাদের হৃদয়ে 'হালের' আবির্ভাব হইতেছে না।

॥ কাশ্‌ফের বিপদ ॥

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত লোক কাশ্‌ফের বেশী ভক্ত ও বিশ্বাসী তাহাদের সহিত সময় সময় শয়তান বিদ্রূপও করিয়া থাকে। কোন কোন বুযুর্গ লোক লিখিয়াছেন, মানুষের ধ্যান ও কল্পনার উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা যথেষ্ট রহিয়াছে। শয়তান যেকেরকারীকে কাল্পনিক আসমান দেখাইয়া থাকে। তথায় সে নূর, তাজাল্লী, ফেরেশ্‌তা—সবকিছুই দেখিতে পায়, যে সমস্ত যাকের কাশ্‌ফে বিশ্বাসী তাহারা ইহাকে প্রকৃত আসমান এবং সত্যিকারের ফেরেশ্‌তা মনে করিয়া থাকে। এই কারণেই তত্ত্ববিদগণ লিখিয়াছেন, কাশ্‌ফের পথ বড়ই বিপদ সঙ্কুল, সে পথে শয়তানের ধোঁকা দেওয়া বড়ই সহজ হয়। এই মর্মেই আরেফ শীরাযী বলিয়াছেন :

در ره عشق وسوسهٔ اهرمن بسے ست + هشدار و گوش را به پیام سروش دار

"এশ্‌কের পথে শয়তানের কু-মন্ত্রণার আশঙ্কা অনেক। সাবধানতা অবলম্বন কর এবং জিব্‌রায়ীলের নির্দেশের প্রতি কান সজাগ রাখ।"

কেহ কেহ হাফেয শীরাযীকে মাতাল বলিয়া থাকেন। কিন্তু মনে হয় তাহাদের চক্ষু নাই। হাফেযের বাণীসমূহে মা'রেফতের মাস্‌আলা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। এমন নহে যে, তাঁহার প্রতি আমার নিছক উন্নত ধারণার বশবর্তী হইয়া তাঁহার উক্তিসমূহ হইতে বাছিয়া বাছিয়া এই মাস্‌আলাগুলি বাহির করিয়া লইয়াছি ; বরং তাঁহার বাণী বাস্তবিকই তাসাউফের মাস্‌আলাতে পরিপূর্ণ। অন্যথায় কেহ অপর কাহারও বাণী হইতে এ সমস্ত মাস্‌আলা বাহির করিয়া দেখান, আমি আমার ধারণা পরিবর্তন করিতে রাযী আছি। আসল কথা এই যে, ভিতরে কিছু না থাকিলে কেহ এ সমস্ত মাস্‌আলা বাহির করিতেও সক্ষম হয় না। যাহা হউক, হাফেয রাহ্‌মাতুল্লাহ্ বলেন : "এই পথে শয়তানের কু-মন্ত্রণা অনেক। সুতরাং তরীকত-পন্থীর কর্তব্য, সাবধান থাকিয়া سروش -এর পয়গামের প্রতি কান সজাগ রাখা।" سروش বলিতে এখানে 'হাতেফ' অর্থাৎ, গায়েবী আওয়ায উদ্দেশ্য নহে,। কেহ কেহ হয়ত এরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকিবে এবং মনে মনে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকিবে। কেননা, ইহা হইতে "কাশ্‌ফের" উপর নির্ভর করার শিক্ষাই তো পাওয়া যাইতেছে না। বরং এখানে سروش-এর অর্থ জিব্‌রায়ীল (আঃ) এবং পয়গামের অর্থ 'ওহী' যাহা তাঁহার মাধ্যমে নাযিল হইত। অতএব, বয়েতের মতলব এই যে, ওহীর অনুসরণ করা উচিত।

তাহা হইলে আর শয়তানের কু-মন্ত্রণা কার্যকরী হইবে না। ফলকথা, কাশ্ফের মধ্যে এই বিপদ রহিয়াছে। আর যাহার কাশ্ফ হয়-ই না শয়তান তাহাকে কি ধোকা দিবে ?

যখন একথা বুঝিতে পারিলেন যে, যাদু প্রভৃতি আমলিয়াত নির্ভর করে কল্পনা শক্তির উপর, তবে এখন জানিয়া লউন যে, মেয়েলোকের কল্পনা শক্তি পুরুষ অপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। কেননা, প্রথমতঃ স্ত্রীলোকেরা স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্না, স্বল্প বুদ্ধিলোককে যাহাকিছু শিখাইয়া দেওয়া হয়, উহারই ধ্যানে এবং কল্পনায় সে সত্বর দৃঢ় হইয়া যায়। বিপরীত দিকের কল্পনাই সে করে না। দ্বিতীয়তঃ, মেয়েলোকের অভিজ্ঞতাও পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম, সুতরাং তাহাদের ধ্যান এবং কল্পনা কখনও ব্যাহত হয় না।

॥ স্ত্রী-শিক্ষার পদ্ধতি ॥

কিন্তু আজকাল নব্য শিক্ষিত শ্রেণীতে স্ত্রী-জাতির জ্ঞান ব্যাপক করার এবং তাহাদিগকে বিভিন্ন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। আমি স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী নহি। কিন্তু আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী তাহাদিগকে যে শিক্ষা প্রদান করিতেছে এই শিক্ষার আমি অবশ্যই বিরোধী। বলুন ত, স্ত্রীজাতিকে ভূগোল এবং ইতিহাস শিক্ষা দেওয়ার সার্থকতা কি ? আমি একবার বলিয়াছিলাম, মেয়েরা এখন পর্যন্ত জানে নাই যে, আমাদের শহরে মহল্লা কয়টি ? এবং এই জিলায় শহর কয়টি ? কোন্ রাস্তা কোন্ দিক হইতে কোন্ দিকে গিয়াছে ? এই কারণেই এখন পর্যন্ত তাহারা ঘরে আবদ্ধ থাকা পছন্দ করিতেছে, কিন্তু এখন তাহাদিগকে সারা দুনিয়ার নক্শা এবং রাস্তা শিখান হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, তাহাদিগকে উধাও হওয়ার রাস্তা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। অতএব, বাস্তবিকই আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, স্ত্রী-জাতিকে ভূগোল শিক্ষা দেওয়ার সার্থকতা কি ? তাহাদের কামালিয়তই (গুণবত্তা) তো এই যে, তাহারা যেন নিজের শহর এবং ঘর ভিন্ন আর কিছুই জানিতে না পারে। স্ত্রী-শিক্ষার জন্য দ্বীনী মাসায়েল অপেক্ষা আর কিছুই অধিক হিতকর নহে। ইতিহাস পড়াইতে ইচ্ছা করিলে কেবল বুযুর্গ লোকের কাহিনী ও অবস্থা পড়ান উচিত। তাহাতে তাহাদের স্বভাব-চরিত্রের উপর ভাল প্রভাব পড়িবে। কিন্তু আজকাল স্ত্রীজাতিকে সারা দুনিয়ার কিস্সা কাহিনী পড়ান হয়, ইহার পরিণাম ফল নিতান্ত খারাপ হইয়া দাঁড়ায়।

কোরআন শরীফে পুণ্যবতী স্ত্রী-লোকের ইহাও একটি গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে সে যেন নিরীহ হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ❋

"যাহারা অনবহিতা মুসলমান সতী রমণীদের কুৎসা রটনা করে তাহাদের প্রতি দুনিয়াতেও লা'নৎ এবং আখেরাতেও লা'নৎ।" غافلات শব্দের অর্থ তাহারা 'চতুর' নহে, দুনিয়ার উত্থান-পতন সম্বন্ধে অবগত নহে। অতএব, বন্ধুগণ! মনে রাখিবেন স্ত্রীজাতির গুণবত্তা ইহাই যে, তাহারা যেন নিজের শহর এবং ঘর ব্যতীত দুনিয়ার সবকিছু হইতে অনবহিতা থাকে। এই গুণটি স্ত্রীজাতির জন্মগত ও স্বভাবগত, কিন্তু মানুষ ইহাকে বিকৃত করিয়া ফেলে।

একজন লোক আমার নিকট কোন এক বুযুর্গ লোকের কাহিনী বর্ণনা করিতেছিল। উক্ত বুযুর্গ লোক একবার গরুর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন পুরুষ, আর গাড়োয়ান ছিল অত্যন্ত কুৎসিত ও বদাকার। পথিমধ্যে গাড়োয়ানের বাড়ী আসিয়া পড়িলে সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিল, ডাক শুনিতেই স্ত্রী আসিয়া হাজির হইল। হঠাৎ তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই মনে হইল যেন চাঁদ উঠিয়াছে, সে খুবই সুন্দরী ছিল। বুযুর্গ লোকটি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই স্ত্রীলোকটি তো এমন সুন্দরী এবং সুশ্রী, আর তাহার স্বামী কুৎসিত ও বদাকার, সে তাহার স্বামীকে কখনও শ্রদ্ধা করে কি? বুযুর্গ লোকটি নিজের সৌন্দর্যের জন্য গর্ব অনুভব করিতেন। মনে মনে ভাবিলেন, দেখি স্ত্রীলোকটি আমার দিকেও দৃষ্টি করে কি না। কিন্তু সেই আল্লাহ্‌র বাঁদী একবারও দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল না যে, গাড়ীতে কে আছে, কে নাই। তাহার সমস্ত মনোযোগ ছিল নিজের স্বামীর দিকে। সে তাহারই দিকে হাসিয়া হাসিয়া কথা বলিতেছিল। অবশেষে গরুর গাড়ী অগ্রসর হইয়া চলিল। স্ত্রীলোকটি তাহার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। বুযুর্গ লোকটি বলিতেন, স্ত্রীলোকটির এই গুণ দেখিয়া আমার মনে খুবই আনন্দ হইল। সতী রমণী এরূপই হওয়া উচিত যে, এমন কুৎসিত কদাকার স্বামী লইয়াই সন্তুষ্ট, অপরের দিকে ফিরিয়াও তাকায় না।

অতএব, আমি বলি, স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই গুণটি জন্মগত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু আমরাই উহাকে বিকৃত করিয়া ফেলি। দুঃখের বিষয় এমন মহামূল্য রত্নের হেফাযৎ করা হয় না। স্ত্রীজাতিকে যদি শিক্ষা দিতে চাও, তবে সর্বপ্রথম নিজ গৃহে নভেল এবং বিভৎস কিস্‌সা কাহিনীর বইয়ের সমাগম বন্ধ কর। এই নভেল বইগুলির বদৌলতে অনেক সম্মানী ঘরে বড় বড় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীজাতিকে লেখা শিখাইও না। যদি আবশ্যক পরিমাণ শিখাইতে চাও, তবে এবিষয়ে যথেষ্ট সাবধান থাকিবে, তাহারা যেন বেগানা পুরুষের নামে কখনও চিঠিপত্র না লেখে। কোন কোন স্ত্রীলোক নিজের ভগিনীপতি, চাচাত ভাই এবং মামাত ভাইয়ের নিকট চিঠিপত্র লিখিয়া থাকে। তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। আবার কোন কোন স্ত্রীলোক মহল্লার অপরাপর স্ত্রীলোকদের চিঠিপত্র লিখিয়া দেয়।

এইরূপে কোন কোন ক্ষেত্রে লেখিকার সহিত পুরুষটির সম্পর্ক হইয়া যায়। ইহাতে অনেক অনর্থের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোকদিগকে খুব সতর্ক করিয়া দিন, সমস্ত মহল্লার চিঠিপত্র যেন না লিখে। আরও একটি বিষয় সাবধান করিয়া দিবেন, যেন নিজের পরম আত্মীয়দের নিকট চিঠি লিখিলেও কার্ড কিংবা লেফাফার উপর ঠিকানা নিজের হাতে না লেখে; ঘরের কোন পুরুষ লোক দ্বারা যেন ঠিকানা লিখাইয়া লয়।

কোন এক স্থানে এমন একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যে, একজন স্ত্রীলোক নিজ হাতে লেফাফার উপর ঠিকানা লিখিয়াছিল। উহাতে কাটাকাটি হওয়ায় কিংবা হস্তাক্ষর সুন্দর না হওয়ায় সে তাহা ধুইয়া ফেলিল। ইহাতে সিল মোহরটি সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইল। ফলে ডাক বিভাগ তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়ের করিয়া দিল। তখন বড়ই সঙ্কট উপস্থিত হইল। পর্দানশীন স্ত্রীলোককে আদালতে পাঠাইতে হয়। অবশেষে তাহার একজন নিকটাত্মীয় ব্যাপারটি নিজের ঘাড়ে লইয়া আদালতে যাইয়া স্বীকার করিল যে, এই চিঠি আমি লিখিয়াছি এবং ঠিকানা আমারই হাতের লেখা। সে মনে করিল, মোকদ্দমা দায়ের হইলে আমার উপর হউক। জেল হয় আমারই হউক। তথাপি পর্দানশীন স্ত্রীলোকের অপমান না হউক।

এই কারণেই আমি একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি—স্ত্রীলোকেরা যেন ঠিকানা কখনও নিজের হাতে না লেখে। অতএব, স্ত্রীলোককে শিক্ষা প্রদানের আগ্রহ যদি কাহারও এতই বেশী হয়, তবে এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাঁহার কর্তব্য।

যাহা হউক, স্ত্রীজাতির অভিজ্ঞতা যেহেতু সাধারণতঃ ব্যাপক ও বিস্তৃত হয় না; কাজেই তাহাদের কল্পনা শক্তি বিশুদ্ধ এবং পূর্ণ হইয়া থাকে। আর যাদুর নির্ভর যেহেতু কল্পনার উপরই ঘটে; সুতরাং স্ত্রীলোকের যাদু অধিক শক্তিশালী হইয়া থাকে, এই কারণেই খাছ করিয়া স্ত্রী-যাদুকরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :

النّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ

ইহুদী সম্প্রদায় হারাম যাদুর আমলে নিমগ্ন ছিল। তাহাদের মেয়েরাও যাদু বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। যেমন, লবীদের কন্যারা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যাদু করিয়াছিল। মূর্খ ইহুদীরাই যাদুর চর্চা করিত, কিন্তু তাহাদের আলেমগণের উচিত ছিল ইহাকে হারাম এবং কুফরী বলিয়া আখ্যায়িত করা, আর জনসাধারণকে উহা আমল করিতে নিষেধ করা। তৎপরিবর্তে তাহারা বরং ইহাকে হারূত মারূতের বিদ্যা বলিয়া একটি আসমানী এলমরূপে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল। ইহা নিয়মের কথা—আলেমের স্বভাব পরিবর্তিত হইলে তাহার অধঃপতন অনেক দূরে চলিয়া যায়। কেননা, সে তখন প্রত্যেক শরীয়ত বিরোধী কার্যকে আল্লাহ্ ও রাসূল পর্যন্ত পৌঁছাইয়া ছাড়ে। যেমন, আজকালও মানুষ বলিয়া থাকে, "ধর্ম তো আলেমদের হাতে, যে দিকে ইচ্ছা ঘুরাইয়া দিতে পারে। যাহা ইচ্ছা হারাম এবং যাহা

ইচ্ছা হালাল করিতে পারে। ইহা যেন আলেমদেরই ক্ষমতার অধীন।" আমি বলিতেছি—সর্বসাধারণ এরূপ উক্তি করিলে তাহাদের কোনই কসুর নাই। বাস্তবিকই কোন কোন আলেম এইরূপ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইয়াহুদী আলেমদের অবস্থা এইরূপ ছিল। তাহারা যাদুকে হারূত মারূতের এল্‌ম বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল এবং তৎসম্বন্ধে যোহ্‌রা নাম্নী একজন স্ত্রীলোক ঘটিত এক বিচিত্র কাহিনী রচনা করিয়া লইয়াছিল। মনে হয়, ইয়াহুদীরা যেন বিচিত্রতার পূজক ছিল। মানুষের তাক লাগাইবার জন্য বিচিত্র বিচিত্র কাহিনী-সমূহ রচনা করিয়া লইত যেন মজলিস জমিয়া উঠে।

বস্তুতঃ আজকাল আমাদের ওয়ায়েযগণের রুচিও তদ্রূপই হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা এমন বিচিত্র ঢং অবলম্বন করে যে,ওয়াযকে মুখরোচক করার জন্য এমন কেস্‌সা কাহিনী বর্ণনা করে যাহাকে সাধারণ জ্ঞান সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে রাযী হয় না। আজকাল সাধারণ লোকেরাও বিচিত্র রং ঢং-এর অধিক ভক্ত। কাজেই এই শ্রেণীর ওয়ায়েযগণ সর্বসাধারণের নিকট যথেষ্ট কদর এবং মর্যাদা লাভ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, ওয়াযের মধ্যে নূতন নূতন এমন কিছু থাকা চাই যাহা পূর্বে কখনও শুনা যায় নাই। পুরাতন কথা বার বার আওড়াইলে মজা পাওয়া যায় না।" আমি বলিতেছি, ইহা ভুল কথা। পুরাতন কথা যতবারই আওড়ান হউক না কেন ইহাতেই প্রকৃত মজা। কিন্তু এই স্বাদ তাঁহারাই উপভোগ করিতে পারিবেন যাঁহাদের বিবেক-বুদ্ধি প্রকৃতিস্থ আছে, যাঁহারা সত্যকে সত্যরূপে পাইতে চাহেন, বৈচিত্র-পূজক নহেন, আর যাহাদের প্রকৃতি ও স্বভাব অসুস্থ তাহারা তো আক্কেল গুড়ুমকারী ভোজবাজীতে স্বাদ পাইবে। পুরাতন ও সনাতন বিষয়ে তাহারা কি স্বাদ পাইবে ?

দেখুন, ক্বোরআনের বর্ণনা ভঙ্গীও ঠিক এইরূপই। কোন কোন বিষয়বস্তুকে ক্বোরআনে বার বার বর্ণনা করা হইয়াছে। মূসা (আঃ)-এর ঘটনা ক্বোরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তাহা নূতন প্রণালীতে ও নূতন ভঙ্গীতে বর্ণিত হইয়াছে। ওয়াযের পদ্ধতিও ঠিক এইরূপই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, পুরাতন কথাই বিভিন্ন ভঙ্গীতে বর্ণনা করা এবং স্থান ও সময়োচিত বিষয় বস্তু অবলম্বন করা উচিত। পুরাতন কথাসমূহে সেই স্বাদই রহিয়াছে—যাহা কবি বলিতেছেন :

هر چند پیر وخسته وبس نا تواں شدم + هر گه نظر بروئے تو کردم جواں شدم

"যদিও আমি বার্ধক্য ও জরাগ্রস্ত এবং অত্যধিক দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি। তথাপি তোমার মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করা মাত্র যৌবন প্রাপ্ত হই।" বস্তুতঃ পুরাতন কথাগুলির পুনরাবৃত্তিতে হৃদয়ে নূতন নূতন জ্যোতি এবং সজীবতা উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে বিচিত্র কেস্‌সা কাহিনী শ্রবণে হৃদয়ে কালিমা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সত্যিকারের ওয়ায তো তাহাই যাহাতে কোন বেদআত সংযোজিত না হয়। এসমস্ত নূতন নূতন ও বিচিত্র কাহিনীগুলিকে বেদ্আত ছাড়া আর কি বলা যায়?

॥ ধর্ম-কর্মে সীমাহীন বাড়াবাড়ি ॥

হালাল রুযী অন্বেষণ সম্বন্ধে ওয়ায়েযগণ একটি কেস্সা বর্ণনা করিয়া থাকেন। একব্যক্তি হালাল রুযীর প্রত্যাশী ছিল। লোকে তাহাকে বলিল, আজকাল হালাল রুযী একজন লোকের কাছেই আছে, তিনি বসরা শহরে বাস করেন। তিনি ব্যতীত আর কাহারও রুযী নিশ্চিতরূপে হালাল নহে। সুতরাং সে বসরা গমন পূর্বক সেই বুযুর্গ লোকটির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল: "আমি একমাত্র হালাল রুযীর অন্বেষণে আপনার নিকট আসিয়াছি। আমি শুনিতে পাইয়াছি যে, আপনার রুযী সম্পূর্ণ হালাল। তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। উক্ত বুযুর্গ লোক ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন: "আমার রুযী এ যাবৎ নিঃসন্দেহে হালালই ছিল, কিন্তু এখন আর রহিল না। কেননা, আমার গরু এক ব্যক্তির ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার ক্ষেতের মাটি আমার গরুর পায়ে লাগিয়া আমার ক্ষেতের মাটির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এখন আমার মনে সন্দেহ জন্মিয়া গিয়াছে।"

এসমস্ত কাহিনী শরীয়ত বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, যতটুকু মাটি গরুর পায়ে লাগিতে পারে উহা কোন মূল্যবান পদার্থ নহে যাহার কারণে সন্দেহ জন্মিতে পারে। ইহা ধর্ম-কর্মে সীমাহীন গোড়ামি ছাড়া আর কিছুই নহে। ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ লিখিয়াছেন, যদি কেহ গমের একটি বীজ লইয়া ঘোষণা করিতে থাকে এই গম বীজটি কাহার? তবে তৎকালীন শাসনকর্তার উচিত তাহাকে বেত্রাঘাতের শাস্তি প্রদান করা। কেননা, একটি গমের বীজ মূল্যবান পদার্থ নহে যাহার মালিক অন্বেষণের জন্য ঘোষণা করিয়া ফিরিতে হইবে। অতএব, এই ব্যক্তি শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিতেছে। ফলকথা, উপরোক্ত কাহিনী শরীয়ত বিরোধী। কিন্তু ওয়ায়েযগণ উহাকে বড় জোরে শোরে বর্ণনা করিয়া থাকেন। শ্রোতাগণও উহা শুনিয়া সোবহা-নাল্লাহ্ পড়িতে থাকে এবং মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এসমস্ত কাহিনীর ফল এই দাঁড়ায় যে, মানুষ মনে করিতে আরম্ভ করে, হালাল রুযী বড়ই কঠিন বস্তু। আমাদের ভাগ্যে তাহা সম্ভব নহে। এই কারণে তাহারা হালাল রুযী অন্বেষণে হতাশ হইয়া পড়ে।

হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহ্মান ছাহেবের একজন খাদেম ছিল। তিনি তাহার জন্য খাদ্যবস্তু পাঠাইয়া দিতেন। একবার সে নিবেদন করিয়া বসিল, "হযরত! আমার জন্য যে খাদ্য প্রেরণ করিয়া থাকেন আপনি কি যাচাই করিয়া দেখেন তাহা হারাম, না হালাল?" শাহ্ ছাহেব বলিলেন: অনাহারে মরিয়া যাইবে। ভারি তো

হালাল খানেওয়ালা আসিয়াছে! যা, খাইয়া ফেল। একজন মুসলমান যখন আমাকে হাদিয়া দিয়াছেন এবং তাহার আয় আমদানীর হাল অবস্থা আমার জানা নাই, তখন একজন মুসলমানের আমদানী হারাম হইতে পারে বলিয়া আমার খারাপ ধারণা করার কি প্রয়োজন?

জনৈক শাহ সাহেব আসিয়া একদিন হযরত মাওলানা গঙ্গুহী রাহেমাহুল্লাহুর বাড়ীতে মেহমান হইলেন। তিনি হালাল রুযী খাওয়ার দাবী করিতেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হারাম হালাল সম্বন্ধে খুব অনুসন্ধান করিতেন। হযরতের বাড়ী হইতে অতিথির জন্য খাদ্যবস্তু আসিলে উক্ত শাহ্ সাহেব তাহা ফেরত দিলেন এবং বলিলেন, আমি খাঁটি হালাল খাদ্য খাইয়া থাকি, সন্দেহজনক খাদ্য খাই না। আমি জানি না যে, এই খাদ্য হালাল কি না। এতটুকু বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি মনে মনে আশা করিতেছিলেন যে, "হযরত গঙ্গুহী (রঃ) স্বয়ং আসিয়া এই খাদ্যের তথ্য বর্ণনা করিবেন এবং বলিবেন, এই খাদ্য এমন আয়ের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে যাহাতে কোন প্রকার সন্দেহ নাই, তখন আমি খাইব।" কিন্তু হযরত গঙ্গুহী (রঃ) সেই ধাতের লোক ছিলেন না। তিনি খাদেমকে বলিয়া দিলেন, খাদ্যদ্রব্য ঘরে রাখিয়া দিয়া শাহ্ সাহেবকে বলিয়া দাও খানকাহর নিকট যে বন্য ডুমুরের গাছ দণ্ডায়মান রহিয়াছে উহার ফল সম্পূর্ণরূপে হালাল। উহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি যেন উহা হইতে ফল ছিঁড়িয়া খান।

উপযুক্ত চিকিৎসা করা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তি যদি সত্যিকারের হালাল রুযীর প্রত্যাশী হইতেন, তবেঁ ঠিক তাহাই করিতেন। কিন্তু তাঁহার তো উদ্দেশ্য ছিল শুধু শুধু গৃহস্বামীকে হয়রান করা এবং নিজের নাম বিস্তার করা। বস্তুতঃ তিনি অশিক্ষিত জনসাধারণকে এইভাবে যথেষ্ট হয়রান করিতেন। বেচারা মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকে খোশামোদ করিত এবং বহু খোঁজাখুঁজি করিয়া তাঁহার জন্য হালাল খাদ্য সংগ্রহ করিত। কিন্তু হযরত গঙ্গুহীর বাড়ী হইতে যখন পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গেল, তখন তিনি বেশ অসন্তুষ্ট হইলেন এবং পরক্ষণেই তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

অতএব, বন্ধুগণ! ইহা পরহেযগারী নহে; বরং পরহেযগারীর মহামারী। ইত্যাকার গোঁড়ামি করিতে শরীয়ত নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, একেবারে দিল দরিয়া হইয়া বসিবেন, হারাম হালালের কোন পরোয়াই করিবেন না; বরং শরীয়তের বিধান এই যে, যদি আপনি অনুসন্ধান ব্যতীত এমনিই জানিতে পারেন যে, অমুকের আয় আমদানী সম্পূর্ণ হারাম, তবে তাহার বাড়ীতে কখনও খাইবেন না। আর যদি জানিতে পারেন যে, তাহার আমদানীর কতকাংশ হারাম এবং কতকাংশ হালাল, তবে তাহার ঘরের খাদ্য সন্দেহজনক, শরীয়তের বিধান হইল খাওয়া জায়েয, কিন্তু তাহা না খাওয়াই পরহেযগারী। আর যদি কোন ব্যক্তির

আমদানীর অবস্থা সম্বন্ধে আপনার কিছুই জানা না থাকে, তবে তাহার আমদানীর সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করার কোন প্রয়োজন নাই, আপনি উহাকে হালালই মনে করুন। কিন্তু আজকাল যাহারা শরীয়ত বিধান সম্বন্ধে খুব গোঁড়ামি করে, জন-সাধারণের নিকট তাহাদেরই কদর বেশী। ইহাতে রহস্য এই যে, ধর্মকর্মের গোঁড়ামিতে সুখ্যাতি বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মধ্যম পন্থায় চলিলে কোনই খ্যাতি লাভ হয় না। যাহা নিত্য নূতন তাহাতেই প্রসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

।। জনসাধারণের বিশ্বাস ।।

'গড়হী' নামক স্থানে এক শাহ্‌ সাহেব আসিলেন। তাঁহার অভ্যাস ছিল তাঁহাকে কেহ দাওয়াত করিতে আসিলে তিনি প্রথমে 'মুরাকাবা' করিতেন। কোন কোন সময় মুরাকাবা করিয়া বলিয়া দিতেন, তোমার আমদানী হালাল নহে, অতএব আমি তোমার দাওয়াত গ্রহণ করিতে পারি না। আবার কোন কোন দাওয়াত-কারীকে মুরাকাবা করিয়া বলিয়া দিতেন, হাঁ, তোমার রুযী হালাল, তোমার দাওয়াত মঞ্জুর করিলাম। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি খুব ছড়াইয়া পড়িল। সকলে মনে করিল বাস্তবিকই শাহ্‌ সাহেব বড় বুযুর্গ লোক, হারাম রুযী কখনও খান না, মুরাকাবা করিয়া আগেই তিনি জানিয়া লন—দাওয়াতকারীর আমদানী কিরূপ। কিন্তু কতকলোক বুদ্ধিমানও ছিল, তাহারা মনে মনে বলিল, শাহ্‌ সাহেবের মুরাকাবার পরীক্ষা করা উচিত। কেননা, সম্ভবতঃ তিনি শুধু দাওয়াতকারীর বাহ্যিক লক্ষণ ও বেশ-ভূষা হইতে বুঝিয়া থাকেন যে, ইনি আমীর লোক এবং আমীর লোকদের আয় আমদানীতে এমনিই কিছু গোলমাল থাকে, আর অমুক ব্যক্তি শ্রমিক এবং দুঃস্থ, সাধারণতঃ গরীব লোকের আমদানী অধিকাংশই শ্রমার্জিত, ইহাতে সন্দেহের কারণ খুবই কম, কাজেই তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

অবশেষে তাহারা এক পতিতা নারীর নিকট যাইয়া বলিল, তোমার নিকট সদ্য আমদানীর কোন টাকা থাকিলে তুই একদিনের জন্য আমাদিগকে হাওলাত দাও। পতিতা তাহাদিগকে সদ্য আমদানী হইতে একটি টাকা দিল, তাহারা সেই টাকাটি একজন গরীব শ্রমিককে দিয়া বলিল, ইহা দ্বারা তুমি শাহ্‌ সাহেবকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াও। সে টাকাটি গ্রহণ করিল এবং শাহ্‌ সাহেবের নিকট যাইয়া বলিল ঃ "হুযুর! আজ আমার বাড়ীতে দাওয়াত কবুল করুন।" শাহ্‌ সাহেব নিজের অভ্যাস অনুযায়ী মুরাকাবা করিয়া বলিলেন : সোবহানাল্লাহ্‌! তোমার উপার্জিত টাকায় বড়ই নূর দেখা যাইতেছে, সম্পূর্ণ হালাল, তোমার দাওয়াত মঞ্জুর।" ইহাতে লোকে বুঝিয়া গেল, শাহ্‌ সাহেবের মুরাকাবা ঢং ছাড়া আর কিছুই নহে। শাহ্‌ সাহেব উক্ত গরীব লোকের বাড়ীতে যাইয়া যখন আহার সমাধা করিলেন, তখন ষড়যন্ত্রকারীরা বলিল, শাহ্‌ সাহেব! পুনরায়

একটু মুরাকাবা করিয়া দেখুন ত, যে খাদ্য খাইলেন তাহা হালাল না হারাম? তিনি পুনরায় মুরাকাবা করিয়া পূর্ববৎ বলিলেন, মা-শা-আল্লাহ্ এই খাদ্যের মধ্যে খুবই নূর দেখা যাইতেছে। যদ্দরুন অন্তর আলোকিত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত লোকেরা জুতা লইয়া শাহ্ সাহেবকে খুব মেরামত করিল এবং বলিল: ভণ্ড কোথাকার, বস্, তোমার মুরাকাবার অবস্থা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি মানুষকে ধোকা দিয়া বেড়াইতেছ এবং অযথা হয়রান করিতেছ। যে খাদ্য তুমি এখন খাইয়াছ, ইহা একজন পতিতা নারীর উপার্জিত অর্থে প্রস্তুত হইয়াছে, যাহা খাইয়া তুমি অন্তরে নূরের ফোয়ারা দেখিতে পাইতেছ।

বাস্তবিকই একেবারে উপযুক্ত পরীক্ষা লওয়া হইয়াছে। এরূপ পরীক্ষাকারীর সংখ্যা অতি বিরল। অধিকাংশ লোকই ঐ সমস্ত ধোকাবাজদের ধোকায়ই পতিত হয়। এই কারণেই তত্ত্ববিদগণ বলিয়াছেন, জনসাধারণ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা করিতেছে দেখিয়া কাহারও ভক্ত হইয়া পড়া উচিত নহে। সাধারণ লোক প্রত্যেকেরই ভক্ত হইয়া থাকে। স্বয়ং পীর সাহেবের পক্ষেও, সাধারণ লোক তাঁহার প্রশংসা করিতেছে দেখিয়া, নিজের বুযুর্গীতে বিশ্বাসী হওয়া উচিত নহে। যে পর্যন্ত না কোন দিব্য চক্ষুবিশিষ্ট বুযুর্গ লোক সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, তোমার অবস্থা ভাল। এতদসম্বন্ধে কবি 'সায়েব' বলেন:

بنمائے صاحب نظرے گوہر خود را + عیسے نتواں گشت بتعریف خرے چند

("বুযুর্গ বলিয়া পরিচিত হইতে হইলে) কোন দিব্য চক্ষুবিশিষ্ট মহামানবকে নিজের গুণরূপ রত্ন দেখাও, কয়েকটি গাধার প্রশংসায় ঈসা হইতে পারা যায় না।"

॥ ওয়ায়েযগণের রুচি ॥

আজকাল আমাদের অবস্থা এই হইয়াছে যে, কয়েকজন সাধারণ লোক আসিয়া আমাদের হাত-পা চুম্বন আরম্ভ করিলেই আমরা নিজের বুযুর্গীতে বিশ্বাসী হইয়া পড়ি এবং মনে করি, বাস্তবিকই আমি একটা কিছু হইয়াছি। কাজেই এ সমস্ত লোক আমার হাত-পা চুম্বন করিতেছে। জনসাধারণের আকীদা তো সেই একরূপই। তাহাদের এ'তেকাদ বা ভক্তির অবস্থা এই যে, গঙ্গুহ শহরে একজন ওয়ায়েয আসিল, সে ش এবং ق-এর উচ্চারণও শুদ্ধরূপে করিতে পারিত না, جہنم 'জাহান্নাম'কে جہندم 'জাহানদাম বলিত, কিন্তু মানুষ তাহাকে এমন অন্ধ-ভাবে ভক্তি করিত যে, তাহাদের কেহ কেহ ইহাও বলিত, "এই ওয়ায়েয বিরাট আলেম, মৌলবী রশিদকে (রশীদ-আহমদ-গঙ্গুহীকে) বার বৎসর পড়াইতে পারে।" হাঁ সত্যই তো বলিয়াছে, হযরত মাওলানা তো বার বৎসর পরেও এই ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিতেন না, অর্থাৎ, জাহান্নামকে জাহান্দাম বলা। মোটকথা, সাধারণ লোকের অবস্থা এইরূপ—যে ব্যক্তি ওয়াযের মধ্যে আজেবাজে কেস্সা বর্ণনা করিয়া ওয়াযে জৌলুশ সৃষ্টি

করে, তাহারা এরূপ ওয়াযেরই ভক্ত হইয়া পড়ে। চাই এলম্‌ তাহার আদৌ থাকুক বা না থাকুক।

কানপুর শহরে এক ওয়ায়েয আসিলেন, মিম্বরের উপর বসিতেই তিনি দাবী করিলেন, আজ আমি এমন ওয়ায করিব যাহা ইতিপূর্বে কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। তাহা এই যে, আল্লাহ্‌তা'আলা অন্তর্যামী নহেন। এই বাক্যটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দিক হইতে শ্রোতৃবৃন্দ لاحول ولا قوة الا بالله পড়িতে আরম্ভ করিল। অতঃপর বক্তা কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেনঃ বন্ধুগণ! এই কথা শ্রবণ করিয়া আপনারা আমাকে মনে মনে কাফের এবং নাস্তিক বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহার তত্ত্ব অবগত হওয়ার পর আপনারা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, আমার কথা সত্য। আসল কথা এই যে, অদৃশ্য এবং অজ্ঞাত বস্তুকে গায়েব বলা হয়। আপনারা জানেন, খোদার নিকট কোন বস্তুই অদৃশ্য এবং অজ্ঞাত নহে। তাহা হইলে খোদা তা'আলা অন্তর্যামী হইলেন কি করিয়া? তিনি যাহাকিছু অবগত আছেন, সব কিছুই তাঁহার সম্মুখে বিরাজমান। এই সূক্ষ্ম তত্ত্বটি বর্ণনা করিয়া নিজের দাবী সত্য প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে হয়ত খুবই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তিনি কোরআনের একটি শব্দকে অর্থহীন এবং অকর্মণ্য করিয়া দিলেন। কোরআন শরীফে যখন খোদার একটি গুণ "আলেমুল গায়েব" উল্লেখ রহিয়াছে, তখন ইহাকে অস্বীকার করা কেমন করিয়া জায়েয হইতে পারে? তাহার বলা উচিত ছিল, "আলেমুল গায়েব" বলিয়া খোদার যে একটি গুণ আছে তাহা সৃষ্ট জীবের পরিলক্ষিতে বটে। অর্থাৎ, যে বস্তু সৃষ্ট জীবের নিকট অদৃশ্য এবং অজ্ঞাত খোদা তা'আলা তাহাও জ্ঞাত আছেন, আর আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তার প্রতি লক্ষ্য করিলে এলম মাত্র এক প্রকার অর্থাৎ "এলমে হুযূরী।"

ফলকথা, আজকাল ওয়ায়েযগণের রুচি ঠিক সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যেমন ছিল ইহুদীদের রুচি। এমন কথা ওয়াযের মধ্যে বর্ণনা করে যাহা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ তাক লাগিয়া যায়। এইরূপে আজ কালকার ওয়ায়েযগণ হাসান হোসাইনের (রাঃ) শাহাদতনামা খুব পাঠ করিয়া থাকে, যেন সেই করুণ কাহিনী শুনিয়া শ্রোতারা খুব ক্রন্দন করে। এদিকে আদৌ লক্ষ্য করে না যে, যাহাকিছু বর্ণনা করিতেছে ইহার রেওয়ায়ৎ শুদ্ধ না অশুদ্ধ। যাহা মনে আসে বলিয়া যায়, কেননা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শুধু শ্রোতাদিগকে কাঁদান ছাড়া আর কিছুই নহে।

কোন এক বক্তা قل هو الله সূরার তফ্‌সীরে শাহাদতনামা বর্ণনা করিয়াছিলেন। আপনারা শুনিয়া হয়ত অবাক হইয়া থাকিবেন যে, قل هو الله সূরার তফ্‌সীরের সঙ্গে শাহাদতনামার কি সম্পর্ক ছিল? শুনুন, তিনি এই উপায়ে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন যে, "ইহা সেই সূরা যাহা রাসূলুল্লাহ্‌ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হইয়াছিল, যাঁহার দৌহীত্রদ্বয় কারবালা ময়দানে তাঁহারই উম্মতের হাতে শহীদ হইয়াছিলেন। বস্ এই প্রসঙ্গে সমগ্র কেস্সাটি বর্ণনা করিয়া ফেলেন।" ইহা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কতক লোক বলিয়া উঠিলেন, সাবাস! কেমন সুন্দর যোগ-সম্পর্ক! আমি বলি, ইহা যোগ-সম্পর্ক নহে; বরং খাঁটি পাগলামি; সুতরাং তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি জব্ত করার যোগ্য। কিন্তু জবতের অর্থ এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা নহে; বরং ইহার প্রসিদ্ধ অর্থ জব্দ করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ উহার প্রচার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দিয়া উহাকে "ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে" ফেলিয়া দেওয়ার যোগ্য। আচ্ছা ইহারই নাম যদি যোগ-সূত্র হয়, তবে قل هو الله কেন, প্রত্যেক সূরার তফসীরেই তো শাহাদতনামা; বরং হাজার হাজার ঘটনা ঢুকাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। অতএব, মনে হয়, আজ-কালকার ওয়ায়েযগণের যেই রুচি দেখা যাইতেছে সেকালের ইহুদীগণের রুচিও এইরূপই ছিল। ইহুদীরাও শ্রোতৃবর্গের আনন্দ লাভের জন্য অভিনব ও বিচিত্র কেস্সা কাহিনী রচনা করিয়া লইত।

।। হারূত-মারূত ।।

হারূত-মারূত এবং যোহ্রা ঘটিত কাহিনীও এই শ্রেণীর কেস্সা কাহিনীগুলিরই অন্তর্গত। আজকালও অনেকে ইহাকে ছহীহ্ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কেননা, আশ্চর্যের বিষয়! অনেক তফ্সীরকার এই কাহিনীটিকে তফ্সীরের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু ভাল-মন্দ যাচাইকারী মুহাদ্দেসগণ এই কাহিনীটিকে মওযু (জাল) বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কাহিনীটি এইরূপ বর্ণনা করা হয়:

এক সময়ে আদম-সন্তানগণ নানাবিধ নাফরমানী এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ফেরেশ্তাগণ বিদ্রূপ করিতে লাগিল, ইহারা সেই আদম সন্তান যাহাদিগকে খলীফা বানান হইয়াছে। এখন তাহারা গুনাহের কাজ করিয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করিতেছে। আর আমরা এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমানী করি না। সর্বদা তাঁহার এবাদতই করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন: "মানুষের মধ্যেই কাম প্রবৃত্তি প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি তোমাদের মধ্যেও সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়, তবে তোমরাও গুনাহের কাজ করিতে আরম্ভ করিবে।" ফেরেশ্তারা বলিল: "আমরা কস্মিনকালেও গুনাহ্ করিব না; বরং তখনও আমরা আপনার এবাদতই করিতে থাকিব।" আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন: "আচ্ছা তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে এমন দুইজনকে মনোনীত করিয়া লও যাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক 'আবেদ'। অবশেষে তাহারা হারূত-মারূত নামক দুই ফেরেশ্তাকে মনোনীত করিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের দুইজনের মধ্যেই কামশক্তি সৃষ্টি করিয়া দিলেন এবং পৃথিবীতে পাঠাইয়া তাহাদিগকে

বলিয়া দিলেন, "মানুষের পারস্পরিক মোকদ্দমা ও ঝগড়া-ফাসাদের মীমাংসা করিতে থাক। খোদার সংগে কোন ব্যাপারে কাহাকেও শরীক করিও না, শরাব পান করিও না, যিনা করিও না, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করিও না।" তদনুযায়ী তাঁহারা সারাদিন ব্যাপীয় মোকদ্দমার মীমাংসা করিত এবং সন্ধ্যাকালে ইসমে আ'যম পড়িয়া আস্‌মানে চলিয়া যাইত।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। একদিন যোহ্‌রা নাম্নী এক অতি সুন্দরী ও সুশ্রী স্ত্রীলোকের মোকদ্দমা তাহাদের দরবারে উপস্থাপিত হইল। সেই স্ত্রীলোকটির প্রতি তাহারা উভয়ে মোহিত হইয়া পড়িল এবং মোকদ্দমার রায় তাহারই অনুকূলে প্রদান করিল। অতঃপর তাহাকে নির্জনে ডাকিয়া নিয়া নিজেদের কামলিপ্সা জ্ঞাপন করিল। সে বলিল: একটি শর্তে আমি আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূরণে সম্মতি দান করিতে পারি। হয়ত আপনারা শরাব পান করুন, নতুবা আমার স্বামীকে হত্যা করুন। অথবা আপনাদের সম্মুখস্থ এই মূর্তিকে পূজা করুন; কিংবা আমাকে 'ইস্‌মে আ'যম' শিখাইয়া দিন, যাহার সাহায্যে আপনারা আসমানে আরোহণ করিয়া থাকেন।" প্রথমতঃ তাহারা সবগুলি শর্তই অস্বীকার করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাম শক্তির তাড়না সহ্য করিতে না পারিয়া শরাব পান করিতে স্বীকৃত হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল, ইহা সর্বাপেক্ষা লঘু পাপ। ইহা হইতে পরে তওবা করিয়া লইলেই চলিবে।

যাহা হউক—শরাব পান কয়িয়া তাহারা উক্ত রমণীর সহিত যিনা করিল এবং মাতলামির অবস্থায় তাহার স্বামীকেও হত্যা করিল। মূর্তির সম্মুখে সেজ্‌দাও করিল এবং জ্ঞানহারা অবস্থায় স্ত্রীলোকটিকে ইস্‌মে আ'যমও শিখাইয়া দিল। ফলে স্ত্রী-লোকটি ইস্‌মে আ'যম পড়িয়া আস্‌মানের উপর আরোহণ করিলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাহাকে নক্ষত্রের আকারে রূপান্তরিত করিয়া দিলেন। ইহাই যোহ্‌রা নামক নক্ষত্র।

ফেরেশ্‌তাদ্বয় যখন মাতলামি কাটিয়া বিবেকবুদ্ধি ফিরিয়া পাইলেন, তখন নিজেদের দুষ্কৃতির কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যাকালে আস্‌মানে আরোহণ করিতে গেলে তাহাদিগকে বারণ করা হইল। বলিয়া দেওয়া হইল, "পাপের শাস্তি তোমাদিগকে ভোগ করিতেই হইবে। এখন বাছিয়া লও দুনিয়ার শাস্তিই ভোগ করিবে না আখেরাতের শাস্তি ভোগ করিবে।" দুনিয়ার শাস্তিকে অপেক্ষাকৃত সহজ মনে করিয়া তাহারা তাহাই বাছিয়া লইল। অবশেষে তাহাদিগকে বাবেল নামক স্থানের একটি কূপের মধ্যে মাথা নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। তথায় অবিরত তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করা হইতেছে। এই ফেরেশ্‌তাদ্বয় যাদুও শিখাইত। যাদু শিখাইবার জন্য তাহাদের প্রতি আদেশ ছিল। পরবর্তী কালে যাদুর ধারা তাহাদিগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

এই গল্পটি শ্রবণ করিলে, যিনি হাদীসের সহিত সামান্য পরিমাণ সম্পর্কও রাখেন, তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিবেন—ইহা স্বরচিত। ইহার বর্ণনা-ভঙ্গী হইতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কখনও রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস হইতে পারে না। নিশ্চয়ই ইহা ইহুদীদের রচিত গল্পসমূহের অন্যতম। দ্বিতীয়তঃ, শরীয়তের দৃষ্টি ভঙ্গীতে ইহার প্রতি বহু প্রশ্নের উদ্ভব হইতেছে।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, ফেরেশ্তাকুল আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে কখনও এমন নির্ভীক ভাবে কথোপকথন করিতে পারেন না। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন বলিলেন: "তোমাদের মধ্যে কাম-শক্তি সৃষ্টি করিয়া দিলে তোমরাও মানব জাতির ন্যায় গুনাহের কাজ আরম্ভ করিয়া দিবে।" তখন ফেরেশ্তারা তাঁহার উক্তি খণ্ডন করিয়া দিয়া বলিল, "না, আমরা কাম-শক্তির অধিকারী থাকিয়াও গুনাহের কাজ করিতে পারি না।" আল্লাহ্ তা'আলার উক্তিকে ফেরেশ্তারা এমন বে-আদবের মত কখনও খণ্ডন করিতে পারেন না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যেই যিনার দরুন এই ফেরেশ্তাদ্বয় দণ্ডিত হইল সেই অপরাধে স্ত্রীলোকটিকে কেন দণ্ডিত করা হইল না? অধিকন্তু সে ইস্মে আ'যম পড়িয়া আসমানের উপর কেমন করিয়া চলিয়া গেল এবং এত নৈকট্য কেমন করিয়া প্রাপ্ত হইল?

এই প্রকারের বহু প্রশ্ন হইতে পারে, এখন তাহা বর্ণনা করার সময় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কোন কোন তফসীরকার এই ঘটনাটিকে তফসীরের কিতাবে ঢুকাইয়া দিয়াছেন; সুতরাং অনেকে ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, এই কারণেই প্রত্যেক কিতাবই পাঠ করার যোগ্য হয় না। পড়িবার জন্য কিতাব মনোনয়ন করার পূর্বে কোন একজন বিজ্ঞ আলেমকে কিতাবটি দেখাইবেন। তিনি যদি কিতাবটি দেখিয়া বলেন যে, "হাঁ, পাঠ করার যোগ্য।" তৎপর উহা পাঠ করা উচিত। আমার কথার অর্থ এই নহে যে, যে সমস্ত কিতাবে এই শ্রেণীর কেস্সা কাহিনী বর্ণিত আছে তাহা নির্ভর-যোগ্য নহে; কিন্তু ইহা আমি অবশ্যই বলিতেছি যে, নির্ভর যোগ্য কিতাবেরও প্রত্যেক অংশই নির্ভর-যোগ্য নহে, ইহাও হইতে পারে যে, একটি কিতাব সমষ্টিগত ভাবে খুবই নির্ভরযোগ্য কিন্তু তাহাতে কোন কোন কথা নির্ভরের বা বিশ্বাসের অযোগ্যও আছে। ২।১টি বিষয় নির্ভরের অযোগ্য হইলে সমগ্র কিতাবটিকে অবিশ্বাস্য বলা যাইতে পারে না। কিন্তু কিতাবটির কোন্ কথা নির্ভর যোগ্য এবং কোন্ কথা বিশ্বাস্য নহে তাহা একমাত্র পারদর্শী আলেম লোকই যাচাই করিতে পারেন। যাহা হউক, এই কেস্সাটি নিছক ভিত্তিহীন।

শুধু হারূত-মারূতের ঘটনার প্রকৃত বিবরণ এই যে, এক সময়ে দুনিয়াতে বিশেষ করিয়া বাবেল নামক স্থানে অত্যধিক যাদুর চর্চা হইয়া পড়িয়াছিল।

এমন কি, যাদুর বিস্ময়কর ক্রিয়া দেখিয়া মূর্খ লোকদের মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামদের মু'জেযাহ্' এবং যাদুর মধ্যে প্রভেদ করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা, যাদুর প্রভাবেও অনেক অলৌকিক এবং অস্বাভাবিক কার্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, অথচ মুজেযাহ্ ও যাদুর মধ্যে প্রকাশ্য প্রভেদ রহিয়াছে।

একটি প্রভেদ এই যে, যাদুক্রিয়ার মধ্যে স্বাভাবিক ও প্রকৃতগত কারণসমূহের গুপ্ত ক্রিয়া থাকে এবং বেশীর ভাগ উহা কল্পনা শক্তির উপরই নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে মুজেযার মধ্যে স্বাভাবিক কারণের কোনই দখল বা অধিকার নাই। শুধু আল্লাহ্‌তা'আলার হুকুমে, কোন উপকরণ ব্যতীত অস্বাভাবিক এবং অলৌকিক কার্যসমূহ প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয়তঃ, মুজেযার অধিকারী নবী (আঃ)-এর স্বভাব চরিত্র, চাল-চলন ও কার্য কলাপের মধ্যে এবং যাদুকরের অবস্থার মধ্যে আসমান জমিনের প্রভেদ বিদ্যমান। নবীর সংসর্গের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বৎ ও মা'রেফাৎ এবং আখেরাতের প্রতি আগ্রহ আর দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা জন্মে। তাঁহাদের নিকট উঠা-বসা করিলে অন্তরে নূর উৎপন্ন হয়। আর যাদুকরের সংসর্গে থাকিলে উহার বিপরীত ক্রিয়া হইয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র সুস্থ বুদ্ধি ও সুস্থ স্বভাব লোকই এই প্রভেদ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না। সাধারণ লোকের মতে মুযেজাহ্ নুবুওতের একমাত্র প্রমাণ। আর বাহ্যতঃ মু'জেযা ও যাদু একই রকম দেখা যায়। এই খানে এই জটিলতা দুর করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা 'বাবেল' অঞ্চলে হারূত-মারূত নামক দুইজন ফেরেশ্‌তা অবতারণ করেন। তাহারা জনসাধারণকে সেহের, অর্থাৎ যাদুর তত্ত্বকথা সম্বন্ধে অবহিত করিবেন এবং বলিয়া দিবেন এই যাদু ক্রিয়ার মধ্যে অমুক অমুক উপকরণের প্রভাব ও অধিকার রহিয়াছে। সুতরাং যাদুর অলৌকিক ক্রিয়া হইতে বুঝা যায় না যে, যাদু ও যাদুকর আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় বলিয়াই তাহাদের দ্বারা এরূপ অলৌকিক কার্য সম্পন্ন হইতেছে। যাদুর মধ্যে যে সমস্ত উপকরণের প্রভাব রহিয়াছে, উহার সাহায্যে যাদুকরেরা যেরূপ অলৌকিক কার্য প্রকাশ করিতে পারে, তাহা অপর কাহারও হস্তগত হইলে তাহারাও তদ্রূপ অস্বাভাবিক কার্য করিতে পারিবে।

এস্থলে কেহ এই প্রশ্ন করিতে পারেন না যে, যাদু-বিদ্যা হারাম ও কুফরী; উহা তা'লীম দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্‌তা কেন নাযেল করিলেন? তদুত্তরে বলা যাইবে, সেহের বা যাদুর আমল করা অবশ্যই হারাম এবং কুফরী। কিন্তু উহা শুধু জানিয়া রাখা এবং শরীয়ত-সম্মত কারণে শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল না করিলে হারাম নহে।

দেখুন, শূকর এবং কুকুরের মাংস খাওয়া হারাম। কিন্তু উহাদের মাংসের ব্যক্তিগত গুণাগুণ জানিয়া লওয়া এবং তাহা সর্বসাধারণে জানাইয়া দেওয়া হারাম নহে।

কেননা, গুণাগুণ জানা এবং অপরকে জানাইয়া দেওয়াকে গোশ্‌ত খাওয়া বলা যাইতে পারে না। এইরূপে শরাব পান করা হারাম; কিন্তু চিকিৎসা গ্রন্থে শরাবের গুণাগুণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পড়া এবং পড়ান কখনও হারাম নহে। কেননা, ইহাকে শরাব পান করা বলা যাইতে পারে না। অনুরূপ ভাবে কুফরীমূলক বাক্য ইচ্ছা-পূর্বক মুখে উচ্চারণ করা কুফরী, কিন্তু কেহ যদি জানিয়া লইতে চায় যে, কুফরী বাক্যগুলি কি কি? কোন্‌ কোন্‌ কলেমা উচ্চারণ করিলে ঈমান বিনষ্ট হয়। তাহা জানিয়া লইতে পারিলে উহা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ঈমান নিরাপদ রাখা সম্ভব হইবে, এই উদ্দেশ্যে কলেমায়ে কুফর শিক্ষা করা কুফরী নহে; বরং জায়েয।

ফেকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণ কুফরী কালাম সম্বন্ধে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতে ঐ সমস্ত কালামের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে ঈমান বিনষ্ট হয়। ঐ সমস্ত "কলেমায়ে কুফর" জানিয়া লওয়া এবং পাঠ করাকে কেহ হারাম বলেন নাই, কেননা, কুফরীর কালাম উক্তি করাই কুফরী নহে।

এইরূপে দর্শন শাস্ত্রের অনেক মাসআলা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু মানুষকে ঐ সমস্ত বিষয়ের তত্ত্ব জানাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। সংগে সংগে ঐ সমস্ত কুফরীমূলক মতবাদের খণ্ডনও করিয়া দেওয়া হয়। ইহার উদ্দেশ্য শুধু এই যে, ভ্রান্ত মতবাদের দার্শনিক স্বরূপ এবং উহার অসারতা জানিয়া লওয়ার পর কেহই আর তাহাদের যুক্তিপ্রমাণে প্রভাবান্বিত হইবে না। প্রয়োজনের সময় তাহাদের প্রদত্ত যুক্তি প্রমাণের উত্তর দিতে পারা যাইবে। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন আর কাহারও মনে জাগিবে না যে, যাদু শিখাইবার জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা কেন করা হইল?

আরও একটি প্রশ্ন থাকিয়া যায় যে, যাদু শিখাইবার জন্য ফেরেশ্‌তা কেন নাযিল করা হইল? আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বারা এই কার্য কেন সমাধা করা হইল না। ইহার উত্তর এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরামকে শুধু হেদায়তের জন্য প্রেরণ করা হয়। আর যাদুর তা'লীম দেওয়ার মধ্যে এরূপ সম্ভাবনাও থাকে যে, কেহ যাদু শিক্ষা করিয়া উহার আমল করণে লিপ্ত ও মগ্ন হইয়া যায়। অতএব, এইরূপে আম্বিয়ায়ে কেরাম পথভ্রষ্টতার গৌণ কারণ হইয়া পড়েন। ইহা তাঁহাদের খাঁটি ও নিখুঁত হেদায়তী অবস্থার বিপরীত। সুতরাং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁহাদিগকে পথভ্রষ্টতার গৌণ কারণ করাও পছন্দ করেন না। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের দ্বারা শরীয়তের বিধান পৌঁছান এবং সৃষ্টিগত কাজ উভয়ই লওয়া হয়। সৃষ্টির নিয়মানুসারে তাঁহারা মুসলমানের যেরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন কাফেরদেরও তদ্রূপই করিয়া থাকেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে, গর্ভাধারের মধ্যে নুৎফার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছেন। অতএব, তাঁহারা গর্ভাধারে মুসলমান এবং কাফের সকলের

আকৃতিই নির্মাণ করিয়া থাকেন এবং ক্রমবর্ধনের কালে উভয়েরই হেফাযত করিয়া থাকেন, এইরূপে প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে তাহার হেফাযতের জন্য কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা দুষ্ট জিন এবং অনিষ্টকর জীব-জন্তু হইতে তাহার হেফাযৎ করিয়া থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত হেফাযৎ তাহার তক্‌দীরে থাকে। এইরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরেশ্‌তারা মানুষকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন—তাহারা মুসলমানই হউক কিংবা কাফেরই হউক। এইরূপে মানুষের ক্ষেতি-কৃষি এবং ফল-ফুলের বাগানের ক্রমোন্নতির জন্য কিছু সংখ্যক ফেরেশ্‌তা নিযুক্ত। তাহারা কাফের মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই বাগান এবং ক্ষেতের ক্রমবর্ধন করিয়া থাকেন। মোট কথা, সৃষ্টি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত যাবতীয় কাজে আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে কাফের এবং মুসলমান উভয়ই সমান। ফেরেশ্‌তারা উভয়ের হেফাযতই সমভাবে করিয়া থাকেন, অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমান এবং কাফেরকে এইরূপে সমভাবে সাহায্য করা জায়েয নহে, কিন্তু তাহা আমাদের জন্য, ফেরেশ্‌তাদের জন্য নহে। কেননা, সাহায্য ও হেফাযতের কাজ ফেরেশ্‌তাদের উপর সোপর্দ করা হইয়াছে, আমাদের উপর সোপর্দ করা হয় নাই। তাঁহারা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আদিষ্ট রহিয়াছেন। বাতেনী শাসনজগতের কুতুবগণেরও এই অবস্থা সৃষ্টিগত। সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক ব্যাপার তাহাদের দায়িত্বেও প্রদান করা হয় যাহার ফলে কোন কোন সময় তাঁহারা কোন বিধর্মী রাজার সাহায্য করিয়া থাকেন। উহার ফল এই দাঁড়ায় যে, মুসলিম রাজ্য পরাজিত এবং কাফের রাজ্য জয়ী হইয়া যায়।

॥ মজ্‌যুব এবং তরীকত পন্থীর প্রভেদ ॥

উক্ত কুতুবগণ খোদার ধ্যানে আত্মহারা বা 'মজ্‌যুব' হইয়া থাকেন। কাজেই সৃষ্টির খেদমতে তাঁহার নিকট জাতি ধর্মের ভেদ-বিচার নাই, কিন্তু তরীকতপন্থী দরবেশগণ এরূপ করিতে পারিবেন না। কেননা, তাঁহারা শরীয়তের বিধানাবলীর অধীন। শরীয়ত অনুযায়ী মুসলমানের বিরোধিতায় কাফেরের সাহায্য এবং সংরক্ষণ করা জায়েয নহে, সম্পূর্ণরূপে হারাম। পক্ষান্তরে মজযুবগণ শরীয়ত বিধানের আওতায় থাকেন না কিন্তু মর্যাদার পরিপ্রেক্ষিতে তরীকতপন্থী দরবেশগণই শ্রেষ্ঠ। মজযুবগণকে সিপাহী ও কোতোয়ালের সহিত তুলনা করা যায়। যাহাদের উপর শহরের শৃঙ্খলা রক্ষা করার ভার ন্যস্ত থাকে। শহরের যাবতীয় অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা অবহিত হইতে থাকেন। আর তরীকতপন্থী সালেকগণের দৃষ্টান্ত এইরূপ যেমন বাদশার মাহ্‌বুব। তাঁহারা শহরের কোনই খোঁজখবর রাখেন না, কি হইতেছে, কি না হইতেছে তৎপ্রতি তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। অবশ্য বাদশাহের মেযাজ ও তবীঅৎ সম্বন্ধে তাঁহারা এত ওয়াকিফহাল থাকেন যে, সিপাহী কোতোয়াল উহার বাতাসও পায় না।

সুলতান মাহ্মূদ তাঁহার ক্রীতদাস 'আয়াযকে' খুব স্নেহ করিতেন, অথচ রাজ্য সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান কখনও উজীরের সমান ছিল না ; বরং রাজ্য শাসন বা শৃঙ্খলা বিধানের ব্যাপারে রাজ্যের হাজার হাজার লোক 'আয়ায' অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ছিল। এই কারণেই মানুষ অবাক হইয়া যাইত—"আয়াযকে সুলতান এত অধিক ভাল জানেন কেন ?" কিন্তু আয়াযের মধ্যে এমন একটি গুণ ছিল যাহার বাতাসও উযীরকে স্পর্শ করে নাই। তাহা এই যে, সুলতানের মেযাজ তবীয়ৎ সম্বন্ধে আয়ায সর্বাপেক্ষা অধিক অবহিত ছিল। রাজ্যের বা শহরের অবস্থা সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই জানিত না। কিন্তু মাহ্মূদের মেযাজ ও স্বভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহার চেয়ে অধিক ওয়াকেফহাল আর কেহই ছিল না। এই কারণেই কোন কোন সময় সুলতান মাহ্মূদের সহিত এক মাত্র আয়াযই কথাবার্তা বলিতে পারিত। আর কাহারও সাধ্য ছিল না।

এইরূপে তরীকতপন্থী আউলিয়া-ই কেরাম আল্লাহ্ তা'আলার মেযাজ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ জ্ঞান রাখেন। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার পথ তাঁহারা জানেন। আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের রাস্তা তাঁহারা দেখাইতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, অমুক মোকদ্দমার ফলাফল কি হইবে ? অমুক ব্যাপার সম্বন্ধে কি হইবে ? তখন তাঁহারা এই জবাব দিয়া থাকেন :

ما قصۂ سکندر و دارا نه خوانده ایم + از ما بجز حکایت مہر و وفا مپرس

"আমরা সেকান্দর ও দারা বাদশাহ্র কিস্সা পাঠ করি নাই। মহব্বৎ এবং ভক্তির কিস্সা ভিন্ন অন্য কিছুই আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিও না।" তাঁহাদের কাশ্ফও হয় না, তাঁহারা খাবের তা'বীরও জানেন না। আমলিয়ৎ এবং তা'বীয-তুমারের ব্যবসাও করেন না। তাঁহারা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভের পন্থা এবং আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভের রাস্তা দেখাইয়া দিতে পারেন এবং তাহা প্রচার করিবার ও শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারা সর্বক্ষণ প্রস্তুত রহিয়াছেন। তাঁহাদের নিকট খাবের তা'বীর জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন :

نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم + چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم

"আমি রজনীও নহি, রজনী পূজকও নহি যে, স্বপ্নের ফলাফল বলিব। আমি যেহেতু সূর্যের গোলাম কাজেই সবকিছু সূর্যালোক দ্বারা বলিয়া থাকি।"

এই কারণেই সাধারণ লোক সালেকীন অর্থাৎ তরীকৎপন্থী ওলীআল্লাহ্দের কম ভক্ত হইয়া থাকে। কেননা, তাঁহাদের দরবারে বাহ্যিক উপকরণ কিছুই নাই। কাশফও নাই, কারামতও নাই। দিবা-রাত্র এল্হামের আলোচনাও নাই, 'হা'-'হু' রবের ধ্বনিও নাই। হৈ হুল্লোড়ও নাই। পক্ষান্তরে মজ্যুবগণের দরবারে এ সমস্ত বাহ্যিক উপকরণ যথেষ্ট রহিয়াছে। তবে সালেকীনদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বৎ এবং

মা'রেফাতের এক গুপ্ত ভাণ্ডার আছে যাহা জ্ঞান-চক্ষুধারী লোক দেখিতে পারেন। সাধারণ লোকের দৃষ্টি সেখান পর্যন্ত কমই পৌঁছিয়া থাকে। এইরূপে কামেল লোকের মধ্যে স্বতন্ত্র কোন অবস্থার উদ্ভব হয় না; বরং তাঁহাদের মধ্যে এক অতি নমনীয় মিষ্ট গুণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন, ফিরনীর মধ্যে এক অতি সুস্বাদু মিষ্টতা থাকে—কোন গ্রাম্য অমার্জিত রুচির লোক উহার স্বাদ গ্রহণ করিলে উহাকে একেবারে পান্‌সে বলিয়া অবজ্ঞা করিবে। আর মজ্‌যুব লোকের মধ্যে যে মিষ্টতা উৎপন্ন হয়, তাহা গুড়ের মত। গ্রাম্য লোকেরা উহাকে খুবই মিষ্ট মনে করে। কিন্তু মার্জিত স্বভাব ও সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন লোক উহার একটি চাকাও খাইতে পারেন না।

ফিরনীর উল্লেখে আমার একটি ঘটনা মনে পড়িয়াছে। দেওবন্দ শহরে জনৈক আমীর লোকের বাড়ীতে কোন এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যর্দা, পোলাউ এবং ফিরনী পাকান হইয়াছিল। গ্রাম অঞ্চল হইতে তাঁহার প্রজাবৃন্দের মধ্যে চর্মকারও আসিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকেও এই খাদ্যই দেওয়াইলেন। গ্রাম্য ইতর লোকের রুচির সম্মুখে এ সমস্ত উচ্চস্তরের সুস্বাদু খাদ্যের স্বাদ কোথায় পাইবে? নাক সিঁটকাইয়া ও ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কোনরূপে পোলাউ এবং কোরমা খাইল। কিন্তু যখন ফিরনীর পালা আসিল, আর তাহারা বরদাশ্‌ত করিতে পারিল না। একজন বলিয়াই উঠিল, নিজের সাথীকে জিজ্ঞাসাই করিল, "থুথুর মত এটা কি রে?"

দেখুন, এমন সুস্বাদু খাদ্য যাহা মন ও মস্তিষ্কে পর্যন্ত আনন্দ দান করিয়া থাকে; কিন্তু সেই চর্মকারের নিকট এমন আদর পাইল যে, সে উহাকে একেবারে থুথুর সদৃশ বলিয়া ফেলিল। এইরূপে যাহারা গ্রাম্য স্বভাবের হয়, তাহাদের নিকট আউলিয়া-ই কেরামের সূক্ষ্ম অবস্থা ও হা'লসমূহের কোনই কদর হয় না। যদি একটু লাফালাফি ফালাফালি, একটু হু-হক্ ধ্বনি এবং একটু কাশ্‌ফ্‌ ও কারামত হয়, তবে তাহাদের নিকট বুযুর্গী বলিয়া বিবেচিত হয়।

॥ কামেলদের কামালত ॥

হযরত জুনাইদ বাগ্‌দাদীর (রঃ) দরবারে এক ব্যক্তি আসিয়া দশ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করিল। দশ বৎসর পরে সে বলিল "হুযুর! আমি এতকাল ধরিয়া দরবারে রহিয়াছি, কিন্তু আমি আপনার কোন কারামত দেখিলাম না।" বাস্তবিকই এই লোকটি একেবারে বোকা ছিল। কাজেই এত দীর্ঘকালের মধ্যে হযরত রাহেমাহুল্লাহুর কোন কামালত দেখিতে পায় নাই। অন্যথায় তাঁহার কামালিয়াতের সম্মুখে কারামতের অস্তিত্ব কি?—হযরত জুনাইদ (রঃ) উত্তেজিত কণ্ঠে জবাব দিলেনঃ 'কি বলিলে তুমি? এই দশ বৎসর কাল মধ্যে তুমি জুনাইদ দ্বারা সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ হইতে দেখিয়াছ কি?' সে বলিলঃ "হযরত! আপনার কোন কাজ সুন্নতের খেলাফ

তো দেখিতে পাই নাই।" তিনি বলিলেনঃ দশ বৎসরের মধ্যে জুনাইদের দ্বারা সুন্নতের খেলাফ কোন কাজ হয় নাই।' ইহার চেয়ে অধিক জুনাইদের কারামত তুমি আর কি দেখিতে চাও?' ইহাতে লোকটির জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া গেল, বাস্তবিকই ইহা এত বড় কারামত যে, যাহার সম্মুখে বাহ্যিক কারামত উহার বাঁদী-দাসীর তুল্য। হযরত জুনাইদ(রাঃ)-এর এরূপ দাবী করার কারণ এই যে, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ আল্লাহ্‌র নেয়ামত প্রচাররূপে কিংবা তরীকত পন্থীর সংশোধনের নিয়তে নিজের কোন কোন কামালত সময়ে সময়ে বর্ণনা করিয়া থাকেন, যেন তাহাতে শায়েখের অবস্থা অবগত হইয়া তাহাদের ভক্তি বৃদ্ধি পায়। কেননা, তরীকতের মধ্যে শায়খের প্রতি নির্ভর এবং শ্রদ্ধার একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। এ পথের সফলতা ইহারই উপর নির্ভরশীল।

এই ঘটনাটি হইতে আপনারা বুঝিয়া থাকিবেন, কামেল লোকের কামাল কতই গূঢ় থাকে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিশক্তি সে পর্যন্ত পৌঁছিতেই পারে না। আবার আম্বিয়া-ই-কেরামের কামাল আউলিয়াদের কামাল অপেক্ষা আরও গূঢ়।" এই কারণেই আম্বিয়াঃ-ই-কেরাম সম্বন্ধে কাফেরেরা বলিত, "আমাদের ও তাঁহাদের মধ্যে কি প্রভেদ আছে? ইহারাও তো মানুষই, রীতিমত পানাহার করিতেছে। হাটে বাজারে চলাফেরা করে, আমরাও তো সেরূপ মানুষই। আর মজ্‌যুবগণের বাহ্যিক কারামতের ফলে মুসলমানদের ন্যায় কাফের লোকেরাও তাহাদিগকে খুব শ্রদ্ধা করিয়াছে। কেননা, মজ্‌যুবগণের অবস্থা প্রকাশ্যভাবেই অন্যান্য লোক হইতে পৃথক দেখা যায়। অতএব, তরীকতপন্থী আউলিয়া-ই কেরামের অবস্থা কতকটা আম্বিয়ায়ে কেরামের অবস্থার ন্যায়। আর মজ্‌যুবগণ ফেরেশতাদের সহিত অধিক সামঞ্জস্য রাখেন। এই কারণেই সৃষ্টিগত ও প্রাকৃতিক কার্য মজ্‌যুবগণের উপর অধিক ন্যস্ত থাকে। আর শরীয়তের বিধানাধীন কার্যের এন্তেযাম আউলিয়া-ই কেরামের উপর হইয়া থাকে।

ফলকথা, সৃষ্টি ও প্রকৃতিগত কার্যসমূহের অধিকাংশই ফেরেশ্‌তারাই করিয়া থাকেন। এই কারণেই যাদুর তা'লীমের ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করা হইয়াছে। কেননা, যাদুর ফলে মানুষ পথভ্রষ্ট হইলে, যদিও ফেরেশ্‌তাগণই উহার গৌণ কারণ তথাপি ইহা তাঁহাদের অবস্থা ও শানের বিপরীত হইবে না। কেননা, তাঁহারা তো ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কাজও করিয়া ফেলেন। যেমন, যুদ্ধের বেলায় কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা মুসলিম সেনাবাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী কাফেরদেরও হেফাযত করিয়া থাকেন, যদ্দরুন কাফেরেরা মুসলমানদের উপর জয়ী হইয়া যায়। পক্ষান্তরে হযরত আম্বিয়া-ই-কেরাম পথভ্রষ্টতার গৌণ এবং দূরবর্তী কারণও হইতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদের সংরক্ষণের এত কড়া ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, শয়তান কখনও কোন নবীর আকৃতি ধারণ পূর্বক আত্ম প্রকাশ করিতে পারে না।

অথচ জিন জাতির বিভিন্ন প্রকারের রূপ ধারণের ক্ষমতা রহিয়াছে। কিন্তু কোন জিনই কোন নবীর রূপ ধারণ করিতে পারে না। কেননা, ইহাতে ধর্মের কার্য বাধা প্রাপ্ত হইয়া যাইত। জাগ্রত অবস্থায় তো দূরেরই কথা কাহারও নিদ্রিত অবস্থায়ও শয়তান নবীর রূপ ধারণ পূর্বক স্বপ্নে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না, বরং শয়তান অন্য কোন ব্যক্তির রূপ ধরিয়া কাহারও সম্মুখে আসিয়া যে দাবী করিত "আমি নবী," তাহার এই সাধ্যও নাই। অবশ্য সে স্বপ্নে কাহারও দৃষ্টিগোচর হইয়া এমন দাবী করিতে পারে যে 'আমি খোদা।" কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার শান এই :

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

"তিনি যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত করেন। অর্থাৎ, পথভ্রষ্টতাও তাঁহর সৃষ্ট, যদিও তিনি তাহাতে রাযী নহেন; কিন্তু যখন কেহ ভুল পথে চলিতে ইচ্ছা করে, তখন পথভ্রষ্টতার অবস্থা তিনি তাহার মধ্যে সৃষ্টি করিয়া দেন ইহাতে জটিলতা কিছুই নাই। কেননা, পথভ্রষ্ট হওয়া দুষণীয় হইলেও উহা সৃষ্টি করা এবং উহার সৃষ্টিকর্তা হওয়া দোষের নহে। কুৎসিত হওয়া দোষ বটে, কিন্তু কুৎসিত আকৃতিসমূহ সৃষ্টি করা দোষ নহে; বরং তাহাতে সৃষ্টিকর্তার পূর্ণ সৃষ্টি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি সর্বপ্রকারের আকৃতি সৃষ্টি করিতে পারেন। মানুষ পাপ করে, কুফরী করে, ইহা মানুষের দোষ বলিয়া গণ্য হয়। কেননা, তাহার নাফরমানী ও পাপকার্য করার কোন যুক্তি নাই। পক্ষান্তরে খোদা তা'আলা যে নাফরমানী ও কুফরী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতি কোন দোষ আসে না। কেননা, সৃষ্টির মধ্যে হাজার হাজার হেকমত ও যুক্তি (মুছলেহাত) রহিয়াছে।

তন্মধ্যে একটি যুক্তি এই যে, খোদা যদি পাপ ও কুফরী সৃষ্টি না করিতেন, তবে কোন মানুষ তাহা অবলম্বন করিতে পারিত না; বরং সকল মানুষ ঈমান এবং নেক কাজ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইত। এমতাবস্থায় মানুষকে পরীক্ষা করা সম্ভব হইত না। অতএব, পাপ ও কুফরী সৃষ্টি করার একটি কারণ এই যে, ইহা দ্বারা তিনি মানবকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন—কে স্বেচ্ছায় ঈমান এবং নেক কার্য অবলম্বন করে, আর কে গুণাহ্ এবং কুফরী অবলম্বন করে। মানুষ যে প্রকারের কার্যই করিবার সঙ্কল্প করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাই সৃষ্টি করিয়া দেন। আর একটি হেকমত কেবল সুফিয়া-ই-কেরাম বুঝিতে পারিয়াছেন। তাহা এই যে, ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলার বিভিন্ন প্রকারের গুণবাচক নাম প্রকাশ পায়। ঈমান এবং নেক কাজ হইতে তাঁহার هادى হেদায়তকারী, এবং কুফরী ও অসৎকার্যসমূহ হইতে مضل

পথভ্রষ্টকারী নামের প্রকাশ হয়। 'হাদী' এবং 'মুযেল্ল্' এই দুই প্রকারের গুণবাচক নামই আল্লাহ্ তা'আলার রহিয়াছে। এখন আপনারা অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, কুফরী এবং মন্দ কার্যের সৃষ্টিকর্তা হওয়া দুষণীয় নহে।

বন্ধুগণ! সূর্যের কৃতিত্ব এই যে, সে চন্দ্রকেও আলো প্রদান করে এবং আয়নাকেও প্রদান করে। আর আবর্জনা স্তূপেও সূর্যের আলো পৌঁছিয়া থাকে কিন্তু ইহাতে ময়লা স্তূপ হইতে কিংবা উহার দুর্গন্ধ যাইয়া সূর্যের গায়ে লাগে না। সে পূর্ববৎ পরিষ্কার এবং পবিত্রই থাকে। অপবিত্রতা আবর্জনা এবং ময়লার অস্তিত্ব পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়, সূর্য পর্যন্ত উহার কোন ক্রিয়া পৌঁছে না। এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরী এবং পাপ কার্যের অস্তিত্ব দান করিয়াছেন, কিন্তু উহার অপবিত্রতা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তায় কোনই ক্রিয়া করিতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার মহা গুণ এবং অনুপম কৃতিত্ব এই যে, যেখানে তিনি ঈমান এবং নেক কাজ সৃষ্টি করিয়াছেন সেখানে তিনি কুফর এবং মন্দ কাজও সৃষ্টি করিয়াছেন। মাওলানা রূমী (রঃ) নিজের বয়েতে এই কথাটিই বলিতেছেন :

کفر ہم نسبت بخالق حکمت ست + ور بما نسبت کنی کفر آفت ست

"সৃষ্টিকর্তার সহিত সম্পর্কিত হইলে কুফরীও হেকমত বলিয়া গণ্য হয়। আর আমাদের সহিত কুফরীর সম্পর্ক স্থাপিত হইলে মহা বিপদ।" আরেফ শিরাযী বলেন :

در کارخانۂ عشق از کفر نا گزیر ست + آتش کرا بسوزد گر بو لہب نباشد

"এশ্কের কারখানায় কুফরী অনিবার্য, 'আবু লাহাব' না হইলে অগ্নি কাহাকে দগ্ধ করিত?"

ইহার অর্থ এই যে, আবু লাহাব অর্থাৎ, খোদাদ্রোহী কাফের না হইলে আল্লাহ্ তা'আলার 'ক্রোধ-গুণের প্রকাশ কাহার উপর হইত? আর 'এশ্কের কারখানা' বলিতে এখানে দুনিয়া উদ্দেশ্য। কেননা, এই একমাত্র এশ্কের উদ্দেশ্যেই এই দুনিয়াকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। নিম্নের কথাটি একথার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে :

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِاُعْرَفَ *

অর্থাৎ, আমি গুপ্ত-ভাণ্ডাররূপে ছিলাম, অতঃপর আমি পরিচিত হওয়া ভাল মনে করিলাম। অতএব, আমি পরিচিত হওয়ার জন্যই সৃষ্টকে সৃষ্টি করিয়াছি। কেহ কেহ ইহার অর্থ এরূপ বুঝেন যে, "এশ্কের মধ্যে সময় সময় কুফরী করারও প্রয়োজন হয়।" এই কারণেই কোন কোন আশেক শরীয়তবিরোধী কুফরী কালামও মুখে উচ্চারণ করিয়া ফেলেন এবং অনেক নিষিদ্ধ কাজও করিয়া ফেলেন। অতএব, এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা মহা ভুল। যাঁহারা এই ভুল অর্থ গ্রহণ করেন তরিকা-ই মারেফাতের সহিত তাঁহাদের কোনই সম্পর্ক নাই। এই বয়েতটির সঠিক অর্থ তাহাই

যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। অর্থাৎ, এখানে এশ্‌কের কারখানা বলিতে ইহজগৎ বুঝান হইয়াছে। সারমর্ম এই যে, ইহজগৎ যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহের প্রকাশ ক্ষেত্র। খোদার অপর গুণ কাহ্হার এবং মুযেল্লও রহিয়াছে, সুতরাং ইহজগতে কুফরী প্রকাশ পাওয়ারও প্রয়োজন আছে। অন্যথায় আল্লাহ্ তা'আলার গুণবাচক নামসমূহে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইবে না। "সুফীয়া-ই কেরাম" আল্লাহ্ তা'আলার কুফরী সৃষ্টি করার এই হেকমত বুঝিতে পারিয়াছেন। আরও একটি হেকমত যাহেরী এল্‌মের আলেমগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাহা এই যে, اَلْاَشْيَاءُ تُعْرَفُ بِاَضْدَادِهَا "প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ উহার বিপরীত বস্তুর অনুধাবনে খুব স্পষ্টরূপে বুঝা যায়।" অতএব, আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে কুফরী ও মন্দ কার্যসমূহ এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন উহার প্রতি লক্ষ্য করিলে সৃষ্টির সম্মুখে ঈমান ও নেক কাজের প্রকৃত স্বরূপ পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হইয়া পড়ে।"

দেখুন, যে ব্যক্তি কখনও অন্ধ দেখে নাই, শত চক্ষুবিশিষ্ট লোকের হাকীকত সে ব্যক্তি ভালরূপে বুঝিতে পারিবে না। এইরূপে যদি কেহ তম্‌সা ও অন্ধকার না দেখিয়া থাকে, সে আলোর মূল্য বুঝিতে পারে না। ইহা তো সুফিয়ায়ে কেরাম এবং যাহেরী ওলামায়ে কেরামের বর্ণিত হেকমত। ইহা ছাড়া আরও অনেক হেকমত থাকিতে পারে যাহা আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত আছেন। ফলকথা, ইহাতে সাব্যস্ত হইল যে, সৃষ্টির ও প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে কুফরী এবং নাফরমানী সৃষ্টি করারও প্রয়োজন আছে।

।। যাদুর নানাবিধ ক্রিয়া ।।

অতএব, বুঝিতে পারিলেন যে, সৃষ্টির নিয়মানুসারে ইহলোকে যাদুর তা'লীম দেওয়ায় কোন ক্ষতি বা দোষ নাই। কাজেই একাজের জন্য ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহারা আসিয়া পৃথিবীতে যাদুর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন এবং নেক্‌কার বন্দাগণ ফেরেশ্‌তা হইতে যাদু শিখিয়া যাদুর যাবতীয় গোমর ফাঁক করিয়া দিলেন। ফলে যাদুকরদের সমস্ত বাহাদুরী ধুলায় মিশিয়া গেল। আর মানুষ যে মু'জেযা ও যাদুর মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝিতে পারিতেছে না তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল। যাদু শিক্ষা দিয়া উক্ত ফেরেশ্‌তাদ্বয় খুব সম্ভব আসমানে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা কোন কূয়ার মধ্যেও আবদ্ধ হন নাই, কোন গর্তের মধ্যেও আবদ্ধ হন নাই।

এখন আয়াতটির অনুবাদ শ্রবণ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ *

অর্থাৎ, (ইহুদীরা এত নির্বোধ যে, আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে না) আর তাহারা এমন পদার্থের অনুসরণ করিয়াছে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বকালে

দুষ্ট জিনের দল যাহার চর্চা করিত। (অর্থাৎ, ইহুদীরা যাদুর অনুসরণ করিত যাহা দুষ্ট জিন সম্প্রদায়ে পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে) আর (কতক নির্বোধ ইহুদী হযরত সুলায়মান আলাইহিস্ সালামকে যাদুকর বলিয়া থাকে, নাউযুবিল্লাহ্। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। কেননা যাদু আমলের দিক হইতে কিংবা এ'তেকাদের দিক হইতে কুফরী। কিন্তু সোলায়মান (আঃ) নাউযুবিল্লাহ কখনও কুফরী করেন নাই। কিন্তু (তবে) দুষ্ট জিন সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে কুফরী (মূলক কথা ও কার্য অর্থাৎ, যাদুর আমল) করিত এবং অবস্থা এই ছিল যে, (নিজেরা তো আমল করিতই আবার অন্যান্য) মানুষকেও যাদুর তা'লীম দিত। (ফলতঃ সেই জিন হইতেই পুরুষানুক্রমে এই যাদুর চর্চা চলিয়া আসিতেছে, তাহারই অনুসরণ ইহুদীরা করিতেছে।) আর (এইরূপে) তাহারা ঐ যাদুরও (অনুসরণ করিয়া থাকে) যাহা বাবেল নামক শহরে হারূত মারূত নামক দুই জন ফেরেশ্‌তার উপর নাযেল করা হইয়াছিল আর তাঁহারা (সাবধানতার জন্য) প্রথমে একথা বলিয়া না লওয়া পর্যন্ত কাহাকেও যাদুর তা'লীম দিতেন না যে, "আমাদের অস্তিত্বও মানুষের জন্য এক প্রকারের পরীক্ষা এবং আয্‌মায়েশ, (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা দেখিতে চান আমাদের মুখে যাদু সম্বন্ধে সবকিছু অবগত হইয়া কে উহাতে লিপ্ত হয় আর কে উহা হইতে নিবৃত্ত থাকে। অতএব, তুমি (একথা জানিয়া শুনিয়া) পাছে কাফের না হইয়া যাও। (অর্থাৎ, যাদুর মধ্যে জড়াইয়া না পড়।) তথাপি (কোন কোন) মানুষ সেই দুই জন (ফেরেশ্‌তা) হইতে এমন যাদু শিক্ষা করিয়া লইত যদ্দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিত, (সম্মুখের দিকে মুসলমানদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন যে, তাহারা যেন যাদুকরদিগকে ভয় না করে। কেননা, ইহা সুনিশ্চিত যে, যাদুকরেরা যাদুর দ্বারা কাহারও (বিন্দুমাত্র) ক্ষতি আল্লাহ্ তা'আলারইচ্ছা ব্যতীত করিতে পারে না। অতএব তোমাদের খোদার উপর নির্ভর করা উচিত, যদি কাহারও উপর যাদুর ক্রিয়া হইয়া পড়ে, তবে সে যেন মনে করে, আমার জন্য খোদার ইচ্ছা ইহাই ছিল। যাদুকর কিছু করে নাই; বরং এই দুঃখ আমার বন্ধুর তরফ হইতে আসিয়াছে, বন্ধুর তরফ হইতে যাহাকিছুই আসে সবকিছুই ভাল।

এখন আমি আমার বক্তব্যের দিকে ফিরিয়া আসিতেছি। এপর্যন্ত যাহাকিছু বর্ণনা করিলাম, তাহা ছিল শুধু ভূমিকা, কিন্তু ভূমিকাটি আশার অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। (অতঃপর হযরত থানবী জিজ্ঞাসা করিলেন: "সময় কত? উত্তর আসিল "এগারটা বাজিয়াছে। তিনি বলিলেন: খুবই দেরী হইয়া গেল এখন আমি উদ্দিষ্ট বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব, যেন বিশেষ বিলম্ব না হয়। (ইহাতে) চতুর্দিক হইতে রব উঠিল, হযরত সংক্ষেপ করিবেন না, যতক্ষণ ইচ্ছা বর্ণনা করিতে থাকুন। তিনি বলিলেন: সংক্ষেপ করিব বলিতে আমার উদ্দেশ্য সামনের বক্তব্যটি পাছের ভূমিকা

অপেক্ষা তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত হইবে। এরূপ উদ্দেশ্য নহে যে, মূলেই সংক্ষিপ্ত হইবে।

آسمان نسبت بہ عرش آمد فرود + گرچہ بس عالی ست پیش خاک تود

"আসমান আরশ এবং কুরসী অপেক্ষা ছোট তথাপি তাহা জমিন অপেক্ষা বড়।"

॥ প্রশংসনীয় এল্‌ম ॥

যাহা হউক, আমার উদ্দেশ্য এই যে, এখন আমি দ্বীনী-এল্‌মের কেন্দ্র একটি মাদ্রাসায় ওয়ায করিতেছি। কাজেই এল্‌ম সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া আবশ্যক, যাহাতে তালেবে এলমদের ফায়দা হয়, এতদ্ভিন্ন ওলামা এবং জনসাধারণ এলম সম্পর্কে যে সমস্ত ভুল ধারণা পোষণ করিতেছেন, উহা প্রকাশ করিয়া সংশোধনের পদ্ধতি বলিয়া দেওয়াও আমার ইচ্ছা। সম্মুখের আয়াতগুলিতে আমার বক্তব্য বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ *

যদিও এস্থলে ইহুদীদের অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, "তাহারা এমন বিষয়ের শিক্ষা লাভ করে, যাহা তাহাদের জন্য ক্ষতিকর।" কিন্তু নিয়ম হইল কোন আয়াতের নাযেল হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট হইলেও তাহাতে উহার হুকুম নির্দিষ্ট হয় না ; বরং আয়াতের শব্দগুলির ব্যাপকতাই ধর্তব্য হয়। অতএব, এস্থলে যে হুকুম বর্ণিত হইয়াছে তাহা ব্যাপক। অর্থাৎ সকলকেই এতদ্বারা বলা হইতেছে-যে বিদ্যা ক্ষতিকর তাহা শিক্ষা করা উচিত নহে। ইহাতে বুঝা যায় যে, সকল বিদ্যাই প্রশংসনীয় নহে ; বরং কোন কোন বিদ্যা ক্ষতিকরও আছে। যাহা শিক্ষা করার জন্য এই আয়াতে তিরস্কার করা হইয়াছে। ক্ষতিকর বিদ্যা আবার দুই প্রকার। কোন কোনটি মূলতঃ আর কতক বিদ্যা আনুষঙ্গিক কারণে ক্ষতিকর। স্বয়ং ক্ষতিকর বিদ্যা তাহাই যাহা মূলতঃ নিষিদ্ধ এবং না-জায়েয। কেননা, ইহাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি শরীয়ত বিরোধী। যেমন, যাদুবিদ্যা, জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রভৃতি।

কেহ কেহ মনে মনে সন্দেহ করিতে পারেন—পূর্বে তো যাদু শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা গ্রহণ করা উভয়ই জায়েয বলিয়াছিলেন, এখন আবার উহাকে নাজায়েয বলিতেছেন ? এই সন্দেহের উত্তরে আমি বলিতেছি, পূর্বে যাদু শিক্ষা দেওয়া এবং শিক্ষা করাকে আমি জায়েয বলি নাই ; বরং যাদু বিদ্যার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হওয়া এবং অপরকে জানাইয়া দেওয়া জায়েয বলিয়াছিলাম আর তাহাতে এই শর্ত আছে যে, ধর্মীয় প্রয়োজনের কারণে উহার স্বরূপ জানিয়া লইতে বা শিখাইতে পারেন। সে-কালে যখন মু'জেযা ও যাদুর মধ্যে মানুষ প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহের মধ্যে পতিত হইয়াছিল, তখন যাদুর প্রকৃত স্বরূপ জানিয়া

লওয়া এবং শিক্ষা দেওয়া জায়েয ছিল, তাহাও আবার ঐসমস্ত লোকের জন্য জায়েয ছিল, যাহাদের এই আত্মবিশ্বাস ছিল যে, যাদু শিক্ষা করিয়া তাহারা উহার আমল করনে লিপ্ত হইয়া পড়িবে না। একালে যাদুর স্বরূপ জানার কোন প্রয়োজন নাই, অধিকন্তু অনর্থ ঘটিবার আশঙ্কা প্রবল। এই কারণেই যাদুর স্বরূপ জানা এবং অপরকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করা হইবে। তবে যাদুকে যাদুরূপে এবং উদ্দেশ্য করিয়া শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া আমি জায়েয বলি নাই। খুব বুঝিয়া লউন।

আর আনুষঙ্গিক কারণে ক্ষতিকর ঐসমস্ত বিদ্যা যাহা মূলতঃ অবৈধ নহে, কিন্তু কোন বাহ্যিক কারণে উহাকে নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। যেমন, 'মুনাযারা' বা তর্কবিদ্যা মূলতঃ জায়েয, কিন্তু কেহ কেহ উহার তা'লীম এইরূপে দিয়া থাকেন যাহা ধর্মের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং এই নিয়মে শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণ করা নিষিদ্ধ বলা যাইবে। যেমন, কোন কোন জায়গায় ছাত্রদিগকে এরূপ মুনাযারা শিক্ষা দেওয়া হয় যে, একদলকে খৃষ্টান মানিয়া লওয়া হয়, আর একদলকে মুসলমান। অতঃপর যে দলটি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইয়া খৃষ্টান ধর্মের মতামত ব্যক্ত করিতেছে তাহারা এমনভাবে কথাবার্তা বলে, যেন সত্যিকারের খৃষ্টান। যেমন তাহারা তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বলে, "আপনাদের কোরআনে এইরূপ লিখিত আছে। ইহাতে আমাদের ধর্মেরই পোষকতা হইতেছে। আর আমাদের ইঞ্জিল কিতাবে এইরূপ বর্ণিত আছে।" আমার এই উক্তিটির প্রমাণ এই যে, এক মাদ্রাসার মুহ্তামিম ছাহেব আমাকে তালেবে এল্মদের 'মুনাযারা' দেখাইয়াছিলেন। তথায় আমি এই পদ্ধতি দেখিতে পাইয়াছি। আল্লাহর কসম—সেই তালেবে এল্মদের উক্তরূপ কথাবার্তায় আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছিল। তাহারা মুনাযারা সমাপ্ত করিলে মুহ্তামিম ছাহেব বলিলেন: "ইহাতে কোন বিষয় সংশোধনযোগ্য থাকিলে সংশোধন করিয়া দিন।" আমি বলিলাম: تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهم "সমস্ত দেহভরা ক্ষত, পট্টি কোথায় কোথায় লাগাইব?"

॥ মুনাযারা বা বিতর্কের কুফল ॥

আপনার এই মুনাযারা শিক্ষা পদ্ধতি তোআপাদ-মস্তকবিকৃত হইয়া রহিয়াছে, আমি কোন্ বিষয়ের সংশোধন করিব। আপনার এই তর্ক পদ্ধতির একটি অনিষ্টকারিতা এই যে, মুসলমান হইতে খৃষ্টান হইয়া গেল।

দ্বিতীয় অনিষ্টকারিতা এই যে, প্রত্যেক দলেরই লক্ষ্য হইতেছে নিজের কথা উঁচু করিয়া ধরা এবং অপরের কথাকে নীচু প্রমাণিত করা। এই প্রণালীর তর্ক সকল অবস্থায়েই নিষিদ্ধ। বিশেষ করিয়া উক্ত তর্কপদ্ধতি তো জঘন্য। কেননা,

এক দল ইসলামের দিকটাকে দুর্বল করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে ঈমান বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, আজকাল মানুষের স্বভাব ও জ্ঞান-বুদ্ধি সুস্থ নহে, নিয়ত ঠিক নহে। এমন লোক অতি বিরল যাহারা এই প্রণালীর মুনাযারায় নিয়ত দৃঢ়ভাবে ঠিক রাখিতে সক্ষম হয়। ইহাও সম্ভব যে, কোন সময়ে কেহ নিজের মতের পক্ষপাতিত্ব করিতে গিয়া আত্ম স্বার্থের খাতিরে ইসলামের পক্ষকে দুর্বল প্রতিপন্ন করিতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য এই—লোকে বলিবে, "অমুকের বক্তৃতায় যুক্তিপ্রমাণগুলি বড়ই তীক্ষ্ণ ছিল।" ইহার পরিণতি যাহা দাঁড়াইবে তাহা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় অনিষ্টকারিতা এই যে, এই শ্রেণীর তর্ক-সভায় অনেক সময় সাধারণ লোকও জুটিয়া পড়ে। তাহাতে বড় আশঙ্কা এই থাকে যে, ইহাদের মধ্য হইতে কাহারও অন্তরে বাতিল পক্ষের যুক্তি প্রমাণ বসিয়া যাইতে পারে। ফলে, সত্য পক্ষ হইতে উহার উত্তরে যাহাকিছু বলা হইবে, তাহা সে ব্যক্তির বোধগম্য না হইতে পারে, অথবা ইস্‌লামের পক্ষ হইতে যে তালেবে-এলমটি উত্তর দিতেছে তাহার বর্ণনা-ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক না হইতে পারে। এমতাবস্থায় উক্ত সাধারণ লোকটির ঈমান বরবাদ হইয়া যাইবে। সুতরাং আপনার এই প্রণালীর মুনাযারা তা'লীম সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়ার যোগ্য; বরং আপনার 'মুনাযারা'র জন্য তালীমেরই প্রয়োজন নাই। স্বভাব ও প্রকৃতি সুস্থ থাকিলে মানুষ প্রত্যেক মিথ্যা মতবাদের খণ্ডন খুব সহজেই করিতে পারে।

এলাহাবাদে একজন আমীর লোক ছিলেন। তিনি লেখাপড়া মোটেই শিখেন নাই, নিজের দস্তখতটুকুও করিতে পারিতেন না। শুধু একটি সীলমোহর প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। দস্তখতের প্রয়োজন হইলে উহা দ্বারা মোহর মারিয়া দিতেন। একবার তিনি কোন বাহনে আরোহণ পূর্বক কোথাও যাইতেছিলেন। পথে একজন খৃষ্টান দণ্ডায়মান ছিল। সে আপন ধর্মের সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছিল। নিজ ধর্মের সত্যতায় সে একটি দলিল ইহাও বর্ণনা করিল যে, "পৃথিবীতে খৃষ্টানের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ইঞ্জীল কিতাবের অনুবাদ বহু ভাষায় করা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট আমরা অধিক প্রিয়। কাজেই আমাদের এত আধিক্য ও উন্নতি।" উক্ত আমীর লোকটি নিজের বাহন থামাইয়া পাদরীকে বলিলেন; ইহা তো সত্যতার কোন প্রমাণ নহে। আমার সঙ্গে আস, ষ্টেশনে যাইয়া আমি তোমাকে দেখাইয়া দিতেছি, রেল গাড়ীতে ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট একটিই থাকে এবং থার্ড ক্লাশ বগী থাকে অনেক। অতএব, ইহাই প্রমাণিত হয় যে, আমরা মুসলিম জাতি ফার্ষ্ট ক্লাশ। আর তোমরা খৃষ্টান জাতি থার্ড ক্লাশ। এই উত্তরটি শ্রবণ করিয়া পাদরী হতভম্ব হইয়া পড়িল। আর কোন উত্তরই সে দিতে পারিল না।

অতএব, দেখুন, একজন নিরক্ষর লোক পাদরীকে নিরুত্তর করিয়া দিলেন। এই কারণেই আমি বলি মুনাযারা বা তর্ক-বিদ্যা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অবশ্য প্রকৃতি সুস্থ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ হইয়া যায়। আরও দেখুন, আজকাল যে ধরণের 'মুনাযারা, করা হয়, প্রাচীন ওলামায়ে কেরামের তর্ক-প্রণালী এইরূপ ছিল না। কোরআনের স্থানে স্থানে কাফেরদের সহিত মুনাযারা করা হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রণালী বড় সুন্দর। আজকালের মত গালিগালাজ নাই। বহু হাদীস শরীফে ছাহাবায়ে কেরামের মুনাযারার কথা উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহাদের দস্তুর এই ছিল যে,একজন তাঁহার বক্তব্যটিকে দৃঢ়ভাবে পুনঃ পুনঃ আওড়াইতে থাকিতেন। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে একজন বলিয়া ফেলিতেন, বস, বিষয়টি আমার নিকট পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, দলিল-প্রমাণ খণ্ডনের প্রতি বাড়াবাড়ি ছিল না। কোরআনের প্রণালীও ইহাই।

আজকালকার মুনাযারায় আর একটি ক্ষতি ইহাও আছে যে, তর্ককারীরা প্রতিপক্ষের উত্তরে আম্বিয়া-ই কেরামের অবমাননা করিতে আরম্ভ করে। যেমন, কোন এক তর্কসভায় খৃষ্টান পক্ষ বলিল : "হযরত ঈসা (আঃ) মুসলমানদের পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (দঃ) অপেক্ষা অধিক সংসার বিরাগী ছিলেন। ঈসা (আঃ) একটি বিবাহও করেন নাই। সারা জীবনটি তিনি সংসার বিরাগের অবস্থাতেই অতিবাহিত করিয়া দিয়াছেন। আর মুসলমানদের পয়গম্বর (দঃ) একের স্থলে নয় বিবাহ পর্যন্ত করিয়াছেন।" ইহার উত্তরে মুসলমানের পক্ষ হইতে একজন বলিলেন : "প্রথমে তুমি প্রমাণ করিয়া দাও যে, হযরত ঈসার (আঃ) পুরুষত্ব শক্তি ছিল।" দেখুন, সত্য জবাব ছাড়িয়া ইনি এমন জবাব দিলেন, যাহাতে نعوذ بالله ঈসা (আঃ)-এর উপর পুরুষত্বহীনতার অপরাধ চাপাইয়া দেওয়া হইল। অথচ আম্বিয়ায়ে কেরাম আভ্যন্তরীণ পূর্ণতা গুণে যেমন গুণান্বিত থাকেন, তদ্রূপ বাহ্যিক ও দৈহিক গুণাবলীও তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান থাকে। তাঁহাদের পুরুষত্ব শক্তিও সাধারণ মানুষের চেয়ে অধিক থাকে।

সঠিক উত্তর এস্থলে এই ছিল যে, সংসার বিরাগী হওয়া বিবাহ না করাতেই সীমাবদ্ধ নহে। অন্যথায় ইহা অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) ভিন্ন আর কোন পয়গম্বরই বিরাগী ছিলেন না। কেননা, হযরত মূসা, ইব্রাহীম, দাউদ এবং সুলায়মান আলাইহিস্সালাম তাঁহারা সকলেই পরিবার-পোষ্যবর্গবিশিষ্ট ছিলেন; অধিকন্তু হযরত সুলায়মান আলাইহিস্সালামের তো তিন শত এবং কোন কোন রেওয়ায়তে এক হাজার বিবী ছিলেন।

সত্য কথা এই যে, বিরাগ দ্বিবিধ (১) যাবতীয় সম্পর্ক কর্তনপূর্বক একাগ্র ও একনিষ্ঠ হইয়া যাওয়া। (২) আর সর্বপ্রকারের সম্পর্কের সহিত জড়িত থাকিয়া বিরাগী

থাকা। অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, বাড়ী-ঘর সবকিছুই থাকিবে—কিন্তু অন্তর ইহার কোন কিছুর সহিতই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে না; বরং আন্তরিক সম্পর্ক একমাত্র খোদার সহিতই থাকিবে। অপরাপরের সহিত কেবল হক এবং দায়িত্ব পালনের সম্পর্ক থাকিবে। অতএব, ঈসা আলাইহিস্সালামের বিরাগ প্রথম প্রকারের ছিল। আর অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরাগ দ্বিতীয় প্রকারের ছিল। আজকাল এই রোগটি ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে যে, হুযূরে আক্রাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফযীলৎ এবং শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রমাণ করা হয়, যাহাতে অপরাপর আম্বিয়ায়ে কেরামের অবমাননা হইয়া পড়ে।

যেমন, এই যুগে সীরাতুন্নবী সম্বন্ধে একটি গ্রন্থ অত্যধিক চালু হইয়া পড়িয়াছে। মানুষ উহার প্রতি খুবই অনুরক্ত। কিন্তু উহার অবস্থা এই যে, এক স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ফযীলৎ বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, "হুযূরের মধ্যে যে সমস্ত পূর্ণতা গুণ বিরাজমান ছিল তাহা অন্য কোন নবীর মধ্যেও ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যে দয়া এবং রহমের মাদ্দা ছিল না। কেননা, তিনি তাঁহার উম্মতের জন্য এরূপ বদ-দো'আ করিয়াছিলেন: رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا "হে প্রভু! ভূ-পৃষ্ঠের উপর কাফেরদের মধ্য হইতে গৃহে অবস্থান করার উপযোগী এক জন্য লোকও রাখিবেন না।"

আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর মধ্যে তাহ্যীব-তামাদ্দুন এবং প্রজা শাসনের জ্ঞান ছিল না। اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ 'দেখুন, এই দুরাচার হযরত নূহ (আঃ)কে দয়া ও রহম হইতে এবং ঈসা (আঃ)কে "তাহযীব-তামাদ্দুন এবং প্রজার শাসনের জ্ঞান হইতে শূন্য বলিয়া ফেলিয়াছে, অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল। সূরা-নূহে নূহ (আঃ-এর ধর্ম-প্রচার সম্বন্ধে যাহাকিছু বর্ণিত হইয়াছে তাহাই তাঁহার দয়া এবং রহ্মত গুণের প্রকৃষ্ট-প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন:

قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِىْ اِلَّا فِرَارًا *

নূহ (আঃ) নিবেদন করিলেন: হে আমার প্রভু! আমি আমার সম্প্রদায়কে সত্য ধর্মের প্রতি দিবা-রাত্রি আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু আমার আহ্বানের ফলে তাহাদের ধর্ম বিমুখতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।' অতঃপর বলিয়াছেন:

ثُمَّ اِنِّىْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ اِنِّىْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا *

"তথাপি আমি বিভিন্ন উপায়ে উপদেশ দিতে রহিয়াছি। অর্থাৎ, আমি তাহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে সত্য ধর্মের দিকে ডাকিয়াছি। ইহার অর্থ সাধারণ ভাবে আমি তাহাদিগকে ধর্মের প্রতি আহ্বান করিয়াছি ও উপদেশ দিয়াছি। অতঃপর

আমি তাহাদিগকে বিশেষ ভাবে প্রকাশ্যেও বুঝাইয়াছি এবং একেবারে গোপনেও বুঝাইয়াছি। অর্থাৎ, যত প্রকারে কৃতকার্য হওয়ার আশা করা যাইতে পারে সকল প্রকারেই বুঝাইয়াছি।

এখন দেখুন, নূহ্ (আঃ)-এর মধ্যে যদি দয়া এবং রহম না থাকিত, তবে এত চিন্তা করিয়া এত পন্থা অবলম্বনের কি প্রয়োজন ছিল? আবার এইরূপ বিভিন্ন পন্থা তিনি কেবল দুই এক দিন কিংবা দুই এক মাস পর্যন্তই জারী রাখেন নাই; বরং সাড়ে নয় শত বৎসর পর্যন্ত এরূপে বুঝাইতে রহিয়াছেন। এদিকে সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সম্ভবতঃ মাত্র আশি জন লোক ঈমান আনিয়াছিল। অবশিষ্ট সকলেই অবাধ্য থাকিয়া নানা উপায়ে নূহ (আঃ)কে কষ্ট দিত ও উত্যক্ত করিত। কিন্তু তবুও তিনি নিরাশ হন নাই। অবিরত ধর্মের প্রতি আহ্বান করিতেই থাকেন। এমন কি, যখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর সাহায্যে তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, এখন আপনি ক্ষান্ত হউন, আর একটি প্রাণীও ঈমান আনিবে না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া পড়িলেন নিম্নের আয়াতটিতে তাহা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ রহিয়াছে

وَاُوْحِیَ اِلٰی نُوْحٍ اَنَّهٗ لَنْ یُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ❋

"এবং আল্লাহ্‌তা'আলা নূহ (আঃ)-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করিলেন যে, আপনার সম্প্রদায়ের যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাঁহাদের ব্যতীত এখন আর কেহই কদাচ ঈমান আনিবে না। অতএব, তাহারা যাহাকিছু করিতেছে তাহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না।" যখন তিনি ওহীর সাহায্যে জানিতে পারিলেন যে, এখন আর কাহারও ভাগ্যে ঈমান নাই তখন তিনি কাফেরদের ধ্বংসের জন্য বদ-দোআ করিলেন, ইহার কারণ এবং যুক্তি তিনি নিজেই ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন।

اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ❋

"নিশ্চয়, যদি আপনি তাহাদিগকে ভূ-পৃষ্ঠের উপর অবস্থান করিতে দেন, তবে ইহারা আপনার মূমেন বন্দাগণকেও বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিবে। আর ভবিষ্যতে ইহাদের ঔরষ হইতে কেবল নাফরমান এবং কাফের সন্তানই ভূমিষ্ঠ হইবে।" ইহাতে বুঝা যায়, নূহ (আঃ) ওহী ইত্যাদির সাহায্যে ইহাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের মধ্যেও কেহ ঈমান আনয়ন করিবে না।

এখন বলুন, এমতাবস্থায় তাঁহার বদ-দোআকে দয়া বিরোধী কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? বরং ইহা মুসলমানদের জন্য প্রকৃত দয়াই ছিল। অন্যথায়

কাফেরেরা জীবিত থাকিলে তাহাদের সন্তানরাও কাফেরই হইত এবং পৃথিবীতে মুসলমানদের টিকিয়া থাকা কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। আবার নূহ (আঃ)কে আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٭

"আপনি সেই দুরাচারদের সম্বন্ধে আমার নিকট সুপারিশ স্বরূপ কিছুই বলিবেন না। কেননা, ইহাদের সকলকেই ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে বুঝা যায়, নূহ (আঃ)-এর মধ্যে অতিমাত্রায় দয়া এবং রহ্মত ছিল, যদি তাঁহাকে নিষেধ না করা হইত, তবে তিনি সুপারিশ ইত্যাদি করিতেন। যেমন তিনি নিজের ছেলে সম্বন্ধে কিছু বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিয়াই ফেলিয়াছিলেন : হে প্রভু! আপনার প্রতিশ্রুতি ছিল, "তোমার পরিবারবর্গকে মুক্তি দিব, আমার ছেলেও তো আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত। সে কেন ধ্বংস হইল? তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল, "সে তোমার পরিজনের অন্তর্ভুক্ত নহে। কেননা, তাঁহার কার্য-কলাপ ভাল ছিল না।"

আর হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে হাদীসে আছেঃ "তিনি শেষ যুগে নাযিল হইবেন, মুসলমানদের রাজ-কার্যের শৃঙ্খলা বিধান করিবেন এবং জিযিয়া কর বন্ধ করিয়া দিবেন।" রাজ্য শাসনের জ্ঞান না থাকিলে, যে অবস্থায় শেষ যুগে মুসলমানদের রাজ-দণ্ড অতি দুর্বল হইয়া পড়িবে, তখন উহার শৃঙ্খলা বিধান কেমন করিয়া করিবেন?

ফলকথা, পয়গম্বরগণের (আঃ) মধ্যে যাবতীয় গুণ সমাবিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে কোন গুণ দ্বারা কোন প্রকার কার্য না লওয়া স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু কোন গুণ হইতে তাঁহাদিগকে একেবারে শূন্য বা রিক্ত বলিয়া ফেলা সম্পূর্ণ ভুল। যেই গুণের দ্বারা কাজ আদায় করিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে আদেশ করেন, উহারই দ্বারা তাঁহারা কাজ লইয়া থাকেন। আর যেই গুণের সাহায্যে কাজ লইবার আদেশ করা হয় না, উহা দ্বারা কোনই কাজ লন না। তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ :

زنده کنی عطائے تو ور بکشی فدائے تو + دل شده مبتلائے تو هرچه کنی رضائے تو

"যদি জীবন দান কর, তাহা তোমার কৃপা আর যদি প্রাণ সংহার কর, তবে তোমার জন্যই তাহা উৎসর্গিত। অন্তর তোমাতেই মগ্ন, যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক তাহাই করিতে পার। মাওলানা বলেন :

گر بعلم آئیم ما ایوان اوست + ور بجهل آئیم ما زندان اوست

گر بخواب آئیم مستان وئیم + ور به بیداری بدستان وئیم

من چو کلکم در میان اصبعین + نیستم در صف طاعت بین بین

بنگر اے دل گر تو اجلال کیستی + در میان اصبعین کیستی

رشته در گردنم افگنده دوست + می برد هرجا که خاطر خواه اوست

"যদি জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য করি, তবে আমরা তাঁহারই প্রাসাদ, আর যদি অজ্ঞতার প্রতি তাকাই, তবে আমরা তাঁহার কারাগার। যদি নিদ্রার প্রতি লক্ষ্য করি, তবে আমরা তাঁহারই পাগল, জাগ্রতাবস্থার প্রতি তাকাইলে আমরা তাঁহার করতলগত। আমরা তাঁহার অঙ্গুলিদ্বয়ের মধ্যস্থলে কলমের মত। কিন্তু এবাদতের সারিতে মধ্যস্থলে নই। হে মন! নজর করিয়া দেখ; তুমি কাহার সম্মান করিতেছ? কাহার অঙ্গুলিদ্বয়ের মাঝখানে রহিয়াছ? বন্ধু আমার গলদেশে রশি লাগাইয়াছে, যেখানে তাহার মন চায় টানিয়া নিতেছে।"

আম্বিয়ায়ে কেরামের কোন কার্যই আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ছাড়া নহে। যাঁহার প্রতি যে নির্দেশ হয় তাহাই পালন করিয়া থাকেন। এই কারণেই তাঁহাদের অবস্থা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিভিন্ন অবস্থার প্রত্যেকটিই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রিয় ও পছন্দনীয়। কেননা, তাহাতেই তাঁহার সন্তোষ। জনৈক আল্লাহ্ওয়ালা বলেন:

بگوش گل چه سخن گفتهٔ که خندان ست ـ بعندلیب چه فرمودهٔ که نالان ست

"ফুলের কানে কানে কি কথা বলিয়াছ যে, তাহা হাসিতেছে, আর বুলবুলের প্রতি কি নির্দেশ প্রদান করিয়াছ যে, উহা ক্রন্দন করিতেছে।"

হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফযীলত তাহাই আমাদের বর্ণনা করা উচিত যাহা হাদীস শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। ফযীলতের জন্য তাহা কি কম? ইহা হইতে একথার যুক্তি বোধগম্য হয় যে, হুযুর নিজের ফযীলত, নিজে কেন বর্ণনা করিয়াছেন? কারণ এই যে, হুযুর যদি তাহা বর্ণনা না করিতেন, তবে উম্মতেরা নিজের তরফ হইতে মনগড়া গুণাবলী বর্ণনা করিত। কেননা, তাহাদের ভক্তি ও মহব্বৎ মাহ্বুবের নানাবিধ ফযীলত বর্ণনা করার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করিত। অথচ আমাদের উল্লেখিত ফযীলতসমূহের মধ্যে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি অবমাননা ও অসম্মানের আশঙ্কা থাকিত। যেমন, আমরা আজকাল স্বচক্ষেই দেখিতে পাইতেছি। এই কারণেই হুযূর (দঃ) নিজের সত্য ও প্রকৃত গুণাবলী নিজেই বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন যেন মহব্বৎ ও এশ্কের আতিশয্যে কেহ তাঁহার গুণাবলী উল্লেখ করিতে চাহিলে সে উক্ত সত্য ও প্রকৃত গুণাবলী বর্ণনা করিয়া নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারে এবং সেই গুণাবলী বর্ণনার মধ্যে যেন অপর কোন নবীর (আঃ) প্রতি অবমাননা ও অপমানের মিশ্রণ না ঘটে।

মোটকথা, আজকাল যে পদ্ধতিতে মুনাযারা অর্থাৎ, তর্কের তা'লীম দেওয়া হয় তাহা পরিত্যাগ করার যোগ্য। যেমন, উপরোক্ত ব্যক্তি نعوذ بالله হযরত ঈসা (আঃ)কে পুরুষত্বহীন প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। এই তো গেল সভ্য শ্রেণীর লোকদের মুনাযারার কথা। অশিক্ষিত গোঁয়ার লোকদের 'মুনাযারা' আরও জঘণ্য।

রূড়কী শহরে জনৈক খৃষ্টান বলিতেছিল—হযরত ঈসা (আঃ) খোদার বেটা। জনৈক গোঁয়ার লোক বলিয়া উঠিল, খোদার আরও কোন বেটা আছে কি না ? পাদরী বলিল ঃ "না"। গোঁয়ার লোকটি বলিল ঃ বস্, এত দীর্ঘ সময়ে তোমার খোদার মাত্র একটি পুত্র জন্মিল ? আমি বিবাহ করিয়াছি এতদিন হইল, মাত্র এই সময়ে আমার এগারটি পুত্র জন্মিয়াছে। ভবিষ্যতে আরও জন্মিবার আশা আছে। অতএব, তোমার খোদার চেয়ে আমিই তো ভাল আছি।

এই গোঁয়ার লোকটির উত্তর যদিও মূলতঃ একটি যুক্তি সঙ্গত কথা। বাস্তবিকই যদি খোদার পুত্র হওয়াই সম্ভব, তবে কেবলমাত্রএকজনপুত্র হওয়ার কারণ কি ? অথচ তাঁহার সৃষ্ট মানবের মধ্যে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্ট মানুষের বহু সন্তান হইয়া থাকে। কিন্তু লোকটির এই উত্তরের ধরণ অতিশয় বেমানান। মোদ্দাকথা, যে সমস্ত বিদ্যা অনিষ্টকর তাহা শিক্ষা করা হারাম। وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ আয়াতটি হইতে এই মাস্‌আলাটি আবিষ্কৃত হইতেছে।

।। অনিষ্টকর ও হিতকর বিদ্যা ।।

এই আয়াতটি হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, যখন কতক বিদ্যা অনিষ্টকর ; সুতরাং অবশ্যই কতক বিদ্যা হিতকর এবং উপকারীও রহিয়াছে।

অতএব, ইহা হইতে দুইটি বিধান পাওয়া যাইতেছে। (১) অনিষ্টকর বিদ্যা হইতে দূরে সরিয়া থাকা কর্তব্য। (২) হিতকর ও উপকারী বিদ্যা শিক্ষা করা কর্তব্য। এখন দেখিতে হইবে—অনিষ্টকর কোন্ বিদ্যা এবং হিতকর কোন্ বিদ্যা। ইহার উত্তর এই আয়াতটির মধ্যেই রহিয়াছে ঃ

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ *

"তাহারা অবশ্যই জানিতে পারিয়াছিল যে, যাহাকিছু তাহারা শিক্ষা করিতেছে আখেরাতে ইহার জন্য কোন প্রাপ্য নাই।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, যে বিদ্যা আখেরাতে কাজে আসিবে না তাহাই ক্ষতিকর বিদ্যা। সুতরাং ইহার বিপরীত পক্ষে সেই বিদ্যাই হিতকর যাহা আখেরাতের কাজে লাগিবে। সমষ্টিগতভাবে এই উভয় দিক লক্ষ্য করাতে দুই প্রকারের ভুল বুঝা যায়। (১) ওলামা সম্প্রদায়ের ভুল। (২) সর্বসাধারণ শ্রেণীর লোকের ভুল। আলেমদের ভুল এই যে, তাঁহাদের মধ্যে কতক লোক তাহাদেরসারা জীবনটি অহিতকর বিদ্যা-অন্বেষণে কাটাইয়া দেন। অর্থাৎ, তাঁহারা শুধু দর্শন, বিজ্ঞান, তর্ক শাস্ত্রের অধ্যয়নেই নিমগ্ন থাকেন। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান শাস্ত্র আখেরাতের কাজে লাগার বিদ্যা নহে। অবশ্য দ্বীনী এলম বুঝা এবং যুক্তি প্রমাণ আনয়ন সহজ হওয়ার জন্য যদি সাহায্যকারী হিসাবে দর্শন, বিজ্ঞান ও তর্ক শাস্ত্রাদি শিক্ষা করা হয়, তবে তাহা আরবী ব্যাকরণ

ও ভাষালঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রের সমতুল্য সহায়ক বিদ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে। এসমস্ত বিদ্যা দ্বারা দ্বীনী-এল্‌মে সাহায্য গ্রহণ করা হইলে পরোক্ষ ভাবে উক্ত বিদ্যাসমূহের সওয়াবও পাওয়া যাইবে। কিন্তু সহায়ক বিদ্যা চর্চায় সারা জীবন অতিবাহিত করিয়া দেওয়া বোকামি। ইহার দৃষ্টান্ত ঠিক তদ্রূপ যেমন কোন ব্যক্তি সারা জীবন শুধু অস্ত্রপাতি ঘষা-মাজা ও পরিষ্কার করার মধ্যেই কাটাইয়া দিল। উহাকে এক দিনের জন্যও কাজে লাগাইল না। এরূপ ব্যক্তিকে সকলেই বেওকুফ বলিবে।

আবার কেহ কেহ বিজ্ঞান শাস্ত্র অবশ্য পড়ে না ; কিন্তু উহাকে দ্বীনী এলমের উপর প্রাধান্য দান করিয়া থাকে, ইহাও মহা ভুল। ইহার এক অনিষ্টকারিতা এই যে, এমতাবস্থায় মৃত্যু ঘটিলে বৈজ্ঞানিকদের দলেই তাহার 'হাশর' হইবে। দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, বিজ্ঞান ও যুক্তি-তর্ক তাহার বিবেক-বুদ্ধির উপর জাঁকিয়া বসে। ফলে সে কোরআন এবং হাদীসকেও বিজ্ঞানের ধারায়ই বুঝিতে চায় এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাহাই চালাইতে চায়। এই কারণে কোরআন ও হাদীসের প্রভাব তাহার স্বভাবের উপর বিস্তৃত হয় না।

হযরত মাওলানা গঙ্গুহী কুদ্দেসা সিররুহুর নিকট একজন বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ছাত্র হাদীস পড়িতে আসে। এক দিন সবকের মধ্যে এই হাদীসটি আসিল,

لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَّلَا صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ *

"পবিত্রতা ভিন্ন অর্থাৎ, বিনা ওযূর নামায আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেন না এবং হারামের মাল হইতে দান করা হইলে তাহাও কবূল করেন না।" হযরত মাওলানা বলিলেন : "এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, ওযূ ভিন্ন নামায ফাসেদ।" দার্শনিক ছাত্রটি প্রশ্ন করিয়া বসিল, ইহাতে তো কেবল কবুল না হওয়াই বুঝা যাইতেছে, একথা তো বুঝা যাইতেছে না যে,বিনা ওযূতে নামায পড়িলে তাহা শুদ্ধও হইবে না। ইহাও তো সম্ভব যে, ওযূ ভিন্নও নামায শুদ্ধ হয় কিন্তু কবুল হয় না। সুতরাং কেহ বিনা ওযূতে নামায পড়িয়া পরে ওযূ করিয়া ফেলিলে, উক্ত নামায কবূলও হইতে পারে। এই যুক্তি শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। অতএব, দেখুন জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাস্ত্র পাঠ করিলে এই ক্ষতি হয় যে, হাদীস শরীফ বুঝিবার রুচি তাহার হাছিল হয় না।

নামাযের পর ওযূ করা প্রসঙ্গে আমার একটি গল্প মনে পড়িল। কোন একজন আফিমসেবী ব্যক্তির লোটা কিঞ্চিৎ ভাঙ্গা ছিল। সে পায়খানায় গেলে যদি মল ত্যাগে কিছু বিলম্ব হইত—সাধারণতঃ আফিমসেবীদের কোষ্ঠ কাঠিন্য দোষ থাকেই—এতটুকু সময়ের মধ্যে তাহার লোটার পানি সমস্তই পড়িয়া যাইত। একদিন উক্ত আফিমখোর মনে মনে বলিল, প্রত্যেক দিনই লোটা পানিশূন্য হইয়া যায়, আজ আমি ইহার ব্যবস্থা করিব। তিনি কি করিলেন ? পায়খানায় যাইয়া

প্রথমেই শৌচকর্ম সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন। তিনি এই ভাবিয়া মনে মনে খুব আনন্দ অনুভব করিলেন যে, আমি বেশ উপায় অবলম্বন করিয়াছি। আজ আর লোটা পানিশূন্য হইতে পারে নাই। কিন্তু তিনি সেদিকে লক্ষ্যই করিলেন না যে, যে উদ্দেশ্যে পানি আনা হইয়াছে এখনও উহার কোন পাত্তাই নাই। মোটকথা, তখন হইতে সর্বদা সে এরূপ করিত যে, প্রথমে শৌচকার্য সমাধা করিত এবং পরে পায়খানা করিত।

মাওলানা মোহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব বড়ই রসিক লোক ছিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম : "এই আফিমখোর লোকটি বড়ই বোকা ছিল। প্রথমে আবদস্ত করিয়া পরে পায়খানা করিত।" তিনি বলিলেন : "না, তুমি বুঝ নাই। সে ব্যক্তি তো পূর্বদিনের পায়খানার জন্য শৌচ কার্য করিত। অতএব, শৌচকর্ম পায়খানার পরেই হইল। অবশ্য তাহার প্রথম দিনের শৌচকার্য নিরর্থক এবং বেকার হইয়াছে। যাহা হউক, ইহা তো একটি কৌতুক করিলাম। মোটকথা, উক্ত বৈজ্ঞানিক ছাত্রটির ওযূও ইহারই সমতুল্য ছিল।

এই ছাত্রটিই আর একদিন আর একটি প্রশ্ন করিয়াছিল, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক বেহেশ্‌তী লোকই নিজ নিজ স্তরে সন্তুষ্ট থাকিবে নিম্নস্তরের বেহেশ্‌তীদের মনে উচ্চশ্রেণীর বেহেশ্‌তীদের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হইবে না। কেননা, বেহেশ্‌তের মধ্যে দুঃখ কষ্টের নাম গন্ধও নাই। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থাকে অপরের চেয়ে ভাল মনে করিবে। ইহা শুনিয়া বৈজ্ঞানিক ছেলেটি বলিয়া উঠিল, ইহাতে তো বুঝা যায় যে, সকল বেহেশ্‌তবাসীই গণ্ড মূর্খতার মধ্যে নিমগ্ন থাকিবে।

ফলকথা, হাদীস শরীফ অধ্যয়ন কালেও সেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষাই তাহাদের স্মরণ পটে উদিত হয়। "জাহ্‌লে মুরাক্কাব এবং জাহ্‌লে বসীত্" অর্থাৎ, গণ্ড-মূর্খতা ও নিরেট মূর্খতার মধ্যেই পতিত থাকে। এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন : "নিজের অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকা এক কথা আর অবস্থা না জানা অন্য কথা। ইহাদের একটি অপরটির সহিত জড়িত নহে। এমন হওয়া বিচিত্র নহে যে, আমি জানিতে পারিব, আমার শ্রেণী অমুক ব্যক্তির শ্রেণী অপেক্ষা নিম্নে, কিন্তু তবুও আমি সন্তুষ্ট থাকিব। মনে করুন, মাশকালাইর ডাল কোন এক ব্যক্তির খুবই প্রিয় খাদ্য। ইহার সম্মুখে সে মুরগীর মাংসকে কোনই গুরুত্ব দেয় না। প্রত্যেক লোকেরই পছন্দ এবং রুচি স্বতন্ত্র হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় বলিতে পারেন, এই ব্যক্তি মাশকলাইর ডালে তেমনি তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে, যেমন আর এক ব্যক্তি মুরগীর মাংসে তৃপ্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে এমন মনে করার কোন কারণ নাই যে, সে ব্যক্তি ডাল এবং মুরগীর মাংসের প্রভেদই জানে না। উভয় বস্তুর পার্থক্য প্রত্যেকেই

জানে। এইরূপে বেহেশ্তবাসীরাও নিজ নিজ শ্রেণীকেই পছন্দ করিবে এবং নিজ নিজ শ্রেণীতেই সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত থাকিবে যদিও নিম্নশ্রেণীর বেহেশ্তীরা ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের স্তর অমুক বেহেশ্তী অপেক্ষা নিম্নে। অতএব, গণ্ড-মূর্খতা কোথায় হইল? এই কারণেই আমি বলি, জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিদ্যাকে দ্বীনী এল্মের পূর্বে শিক্ষা করা বিশেষ ক্ষতিকর।

॥ আলেমদের ভুল ॥

কিন্তু কেহ কেহ দর্শন বিজ্ঞানের এত ভক্ত যে, প্রথমে তাহাই অধ্যয়ন করে; বরং কেহ কেহ তো হাদীসের শিক্ষাকে প্রয়োজনীয়ই মনে করে না। তাহারা বলে, হাদীস পড়ারই কি প্রয়োজন? উহাতে এমন কোন্ জটিল বিষয় রহিয়াছে যে, ওস্তাদের নিকট না পড়িলে বুঝা যাইবে না? কিন্তু আমি বলি, ওস্তাদের নিকট সবকে সবকে হাদীস পড়ার পরেও যদি পূর্ণরূপে বুঝে আসে, তবে উহাকে আল্লাহ্‌র দান মনে করিতে হইবে। সবকে সবকে না পড়িলে তো বুঝে আসিতেই পারে না।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলিতেছি শুনুন। কোন এক বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি কখনও হাদীস পড়েন নাই। কিন্তু হাদীসের শিক্ষকতা করিতে প্রস্তুত হইয়া গেলেন। এক হাদীসে হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আউফ (রাঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)কে না জানাইয়া বিবাহ করিয়া ফেলিলেন, বিবাহের পরদিন তিনি হুযূর (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে হুযূর তাঁহার শরীরে যর্দ রংএর আভা দেখিতে পাইলেন। দুলহানের যর্দ রংএর কাপড়ের চিহ্ন তাঁহার দেহে লাগিয়া গিয়াছিল। তখন হুযূর (দঃ) বলিলেন: مَهْيَمْ هٰذِهِ الصُّفْرَةُ "এই যরদ রং কিসের?" তিনি উত্তর করিলেন: تَزَوَّجْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ অর্থাৎ, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি বিবাহ করিয়াছি।" হুযূর (দঃ) বলিলেনঃ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "একটি বকরী দ্বারা হইলেও 'ওলিমা' কর।" এই হইল হাদীসের মর্ম। একজন তালেবে এল্ম প্রশ্ন করিয়া বসিল, এই যর্দ রং কি প্রকারের ছিল?

মুদার্রেস সাহেব হাদীস তো পড়েনই নাই, উহার তথ্য কিরূপে জানিবেন? তিনি 'এজতেহাদ' করিয়া নিজের মনগড়া বলিলেনঃ "আসল কথা এই যে, আবদুর রহমান ইব্নে-আউফ যুবক ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন যাবৎ বিবাহ করেন নাই। অতএব, বিবাহ করা মাত্র স্ত্রী-সঙ্গম খুব অতিরিক্ত মাত্রায় করিয়াছিলেন। কাজেই চেহারা ফেকাশে যর্দ বর্ণ হইয়া গিয়াছিল। দুরাচার, হাদীসের কেমন কদর্থ করিয়া ফেলিল? সে رَاٰى عَلَيْهِ اَثَرَ الصُّفْرَةِ "তাহার উপর যর্দ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন।" কথার অর্থ এই বুঝিয়াছিল যে, "চেহারা যরদ্ বর্ণ হইয়াছিল।" لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

ছাত্র বেচারা এই উত্তর শ্রবণ করিয়া নীরব হইয়া গেল—কিন্তু এই উত্তর তাহার মনঃপূত হইল না। সে অপর একজন আলেমের নিকট ইহার মতলব জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহার প্রকৃত অর্থ বলিয়া দিলেন যে, বিবাহের দিন দুলহানের কাপড়ে 'আতর' এবং সুগন্ধি দ্রব্য লাগান হয়। সেকালে আরবে যে সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা হইত তাহাতে জাফরান প্রভৃতি মিশান হইত। দুলহানের নিকট গমন করিলে উক্ত যরদ্ বর্ণের রং আবদুর রহমানের কাপড়েও লাগিয়াছিল। যেহেতু পুরুষেরা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিত না। কাজেই হুযুর (দঃ) বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই রং দুলহানের ব্যবহৃত সুগন্ধি দ্রব্যের বটে। এই তথ্য অবগত হইয়া তালেবে এলমটির তৃপ্তি হইল।

অতএব, বন্ধুগণ! হাদীস পাঠকারী এবং হাদীসের সংগে সম্পর্কহীন লোকের মধ্যে এরূপ পার্থক্য হইয়া থাকে। হাদীসের মধ্যে এমন কথা থাকে মূল ঘটনা জানিতে না পারিলে তাহা বুঝা যায় না। বিজ্ঞান সেখানে কোন কাজে আসে না। সেরূপ ক্ষেত্রে শুধু বিবেক বুদ্ধি খাটাইলে এমন মতলবই বর্ণনা করা হইবে, যেমন মুদার্‌রেস الصفرة اثر ای علیه ر বাক্যের অর্থ বর্ণনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দ্বীনী এলম্ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভের পর দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। অন্যথায় বিবেক-বুদ্ধির উপর বিজ্ঞান ও যুক্তিরই প্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়িবে এবং হাদীস শরীফ অধ্যয়নকালে সেই বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করা হইবে।

এক সময়ে আমি বসিয়া কিছু লিখিতেছিলাম। জনৈক যুক্তিবাদী লোক জিজ্ঞাসা করিল: কি লিখিতেছেন? আমি বলিলাম, শায়খের (পীরের) ধ্যান করা সম্বন্ধীয় মাস্‌আলা লিখিতেছি।" সে বলিল: "শায়খ বু-আলী সাইনার ধ্যান? দেখুন, তাহার কল্পনাপটে সর্বদা শায়খ বু-আলী সাইনার ধ্যানই লাগা থাকে। কাজেই "শায়খের ধ্যান" বলিতে শায়খ বু-আলী সাইনার কথাই স্মরণ পড়িল যেন তাহার মতে জগতে এই একজন শায়খই আছেন। এতক্ষণ যাহাকিছু বলিলাম, ইহা হইল আলেম শ্রেণীর ভুল

॥ সাধারণ লোকের ভুল ॥

আর সাধারণ শ্রেণীর লোকের ভুল এই যে,তাহারা হিতকর বিদ্যাও শিক্ষা করে না। তাহারা যদিও ক্ষতিকর বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে; কিন্তু হিতকর ও উপকারী ধর্মীয় বিদ্যা সম্বন্ধেও তাহারা সম্পূর্ণ বে-খবর রহিয়াছে। সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা যে এই ভুল করিয়া যাইতেছে—ইহাও প্রকৃত প্রস্তাবে আলেমর পবিত্র সত্তা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কেননা, প্রত্যেক অনর্থ আমাদিগ হইতেই প্রকাশ পায়।

বস্তুতঃ সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে যে সমস্ত গোলযোগ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশই কোন না কোন আলেম লোক হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। দেখুন, পৃথিবীতে যত প্রকারের বেদ্‌আত বা অশোভনীয় কার্যের বিস্তার হইয়াছে। ইহাতে প্রথমতঃ কোন আলেমেরই হস্তক্ষেপে হইয়াছে। ইহার মূল কারণ এই যে, সাধারণ লোকেরা এলমে দ্বীনকে আরবী ভাষার সহিতই নির্দিষ্ট বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে। অথচ আরবী ভাষা শিখিবার সুযোগ সকলের হয় না। অতএব, তাহারা উর্দু ভাষায়ও ধর্মীর মাস্‌আলাগুলি শিক্ষা করে নাই। কেননা, উর্দু ভাষায় দ্বীনী মাসায়েল শিখিয়া লওয়াকে তাহারা এলমই মনে কারে না। তাহারা ধারণা করিয়া রাখিয়াছে যে, উর্দু ভাষায় দ্বীনী মাসায়েল শিখিয়া লওয়ার পরেও যখন আমরা 'জাহেল' বলিয়া গণ্য হইব, তখন ইহারই বা প্রয়োজন কি? এই ভুলটি তাহাদের মধ্যে আমাদের দ্বারাই উৎপাদিত হইয়াছে। কেননা, আজকাল ওয়ায়েযগণ এল্‌মের ফযীলত বর্ণনা করিবার সময় যতগুলি হাদীস পাঠ করিয়া থাকেন উহাদের সাথে সাথে একথাও বলিয়া দেন যে, আরবী ভাষা শিক্ষা করা কর্তব্য এবং আরবী শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলিকে সাহায্য করা কর্তব্য। সুতরাং যদিও তাঁহারা বলেন যে, দ্বীনী এল্‌ম আরবী ভাষার সহিতই নির্দিষ্ট কিন্তু এল্‌মের ফযীলত প্রসঙ্গে আরবী এল্‌মের অবতারণা এবং আরবী মাদ্রাসাগুলির সাহায্যের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ দ্বারা সর্বসাধারণের মনে এই ধারণা নিশ্চিতরূপে উৎপন্ন করিয়া দেওয়া হয় যে, এল্‌মের যত ফযীলত ও বিশেষত্ব বর্ণনা করা হইল—সমস্তই আরবী বিদ্যার সহিত সীমাবদ্ধ। আরবী ভিন্ন অন্য ভাষায় দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করিলে এ সমস্ত ফযীলত লাভ করা যাইবে না। ওয়ায়েযগণের উদ্দেশ্য তো ছিল শুধু সর্বসাধারণকে মাদ্রাসায় সাহায্য প্রদানের প্রতি উৎসাহিত করা, কিন্তু সর্বসাধারণ তাহাতে বুঝিয়া লইয়াছে যে, কেবল আরবী ভাষায় দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা করিলেই এ সমস্ত ফযীলত পাওয়া যাইতে পারে। তাহারা হয়ত ইহাই বুঝিয়া থাকিবে যে, আরবী ভাষা আল্লাহ্ তা'আলার ভাষা। আর উর্দু ভাষা আমাদের ভাষা। তাই এল্‌মে-দ্বীন আল্লাহ্ তা'আলার ভাষায়ই হওয়া কর্তব্য। কেবল সর্বসাধারণের রুচিই এইভাবে বিকৃত হয় নাই ; বরং কতক তালেবে এল্‌মও এই ভুলের মধ্যে পতিত রহিয়াছে।

মৌলবী মুগীস উদ্দিন নামক এক তালেবে এল্‌ম ছিল। সে মুন্‌ইয়াতুল মুছল্লী নামক কিতাবে এই মাস্‌আলা পড়িয়াছিল যে, "মানুষের কথায় নামায নষ্ট হইয়া যায়। এই মাস্‌আলাটির অর্থ সে এইরূপ বুঝিয়াছিল যে, "উর্দু ভাষায় কথা বলিলে নামায নষ্ট হয়।" একবার সে কোন ইমামের পিছে মুক্‌তাদী হইয়া নামায পড়িতেছিল। ইমাম মাগ্‌রিবের দ্বিতীয় রাকাতে এত দীর্ঘ সময় বসিয়া রহিলেন যে, মুক্‌তাদিগণ সন্দেহ করিতে লাগিল যে, এখন ইমাম সালাম ফিরাইবেন। অতএব, মৌলবী মুগীস উদ্দিন পশ্চাৎ হইতে বলিয়া উঠিল, قُمْ "দাঁড়ান"। ইহাতে ইমামের স্মরণ হইল যে,

ইহা দ্বিতীয় রাকআত। কাজেই তৎক্ষণাৎ তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মৌলবী মুগীস উদ্দিন মনে মনে খুব আনন্দিত হইল—আজ তাহার আরবী শিক্ষা বড়ই কাজে লাগিয়াছে। সে ইমামের ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছে, অথচ তাহার নামায নষ্ট হয় নাই।

ইমাম সালাম ফিরাইয়া বলিলেন: এই قُم শব্দটি কে উচ্চারণ করিয়াছেন? সে অগ্রসর হইয়া বলিল: "আমি"। ইমাম বলিলেন: "আপনি নামায পুনরায় পড়ুন। আপনার নামায নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেননা, মানুষের কথায় নামায নষ্ট হইয়া যায়।" তখন মুগীস উদ্দিন সাহেব বলিলেন, "আমি তো আরবী ভাষায় কথা বলিয়াছিলাম।" ইমাম বলিলেন: "আচ্ছা! তবে আপনার নিকট আরবী ভাষা মানুষের কথা নহে? যান নামায পুনরায় পড়িয়া লউন।" তখন সে বুঝিতে পারিল যে, আরবীও মানুষেরই ভাষা।

ফলকথা, এরূপ ভুলের মধ্যে বহু লোক পতিত রহিয়াছে। এই কারণেই লোকে মনে করে, আরবী ভাষায় যে দোআ করিলে নামায নষ্ট হয় না তাহা উর্দু কিংবা ফারসী ভাষায় নামাযের মধ্যে পড়িলে নামায নষ্ট হইয়া যাইবে। অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভুল ইহাতে নামায নষ্ট হয় না। অবশ্য আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় নামাযের মধ্যে দোআ পাঠ করা হারাম। কিন্তু এই হারাম হওয়ার দরুন নামায ফাসেদ হয় না। আসল লক্ষ্যণীয় বিষয় হইল দোআর বিষয়বস্তু। যে বিষয়ের দোআ নামাযের মধ্যে আরবী ভাষায় পাঠ করিলে নামায ফাসেদ হয় না, তাহা উর্দু বা ফারসী ভাষায় পড়িলেও ফাসেদ হইবে না। শুধু এতটুকু হইবে যে, তাহা হারাম ও নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, তাহাও যদি ইচ্ছাকৃত হয়। অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে কিংবা হালের প্রভাবে উর্দু কিংবা ফারসী ভাষায় দোআ মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িলে তাহা মাক্‌রূহও হইবে না—যদি বিষয়বস্তুটি নামায নষ্টকারী না হয়।

মৌলবী তাজাম্মুল হুসাইন নামে আমাদের হাজী ছাহেব রাহেমাহুল্লাহুর একজন খাদেম ছিলেন। মক্কা মুয়ায্‌যামা গমনের পর এক দিন তিনি শাফেয়ী ইমামের পশ্চাতে মুক্‌তাদী হইয়া ফজরের নামায পড়িতেছিলেন। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ ফজরের নামাযে দোআ-য়ে কুনূত পড়িয়া থাকে। হানাফী মুক্‌তাদিগণ তখন নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে। সকলের দোআ-য়ে কুনূত পাঠ শ্রবণে মৌলবী তাজাম্মুল হুসাইনের উপর এক বিশেষ হালের উদ্ভব হইল। তিনি ভাবিলেন, "সকলে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতেছে, আর আমি মূর্তির ন্যায় নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।" তিনি নিজকে শামলাইতে না পারিয়া "পান্দেনামা" কিতাবের নিম্নোক্ত বয়েতগুলি পড়িতে লাগিলেন

پادشاہا جرم ما را در گذر + ما گنہگاریم وتو آمرزگار

تو نکوکاری وما بد کردہ ایم + جرم بے اندازہ بیحد کردہ ایم

سر در آمد بندۂ بگریختہ + آبروے خود بعصیاں ریختہ

"হে প্রভু! আমাদের গুনাহ মা'ফ কর। আমরা গুনাহ্গার এবং তুমি ক্ষমাকারী, তুমি পুণ্যময় এবং আমরা বদকার পাপী, আমরা অপরিমিত ও অসীম গুনাহ করিয়াছি। পলাতক গোলাম প্রভুর দ্বারে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে, পাপের পঙ্কিলে নিজকে কলঙ্কিত করিয়া ফেলিয়াছে।" মোটকথা, তিনি পুরা বয়েতগুলিই পড়িয়া ফেলিলেন এবং চতুর্দিক হইতে মানুষ হত চকিত হইয়া পড়িল---নামাযের মধ্যে এসব কি হইতেছে! নামায শেষ হইলে সকলে বলিয়া উঠিল, এ ব্যক্তির নামায বাতিল হইয়া গিয়াছে, পুনরায় পড়িতে হইবে। হযরত হাজী ছাহেব কেবলার নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে হাজী ছাহেব বাছ্, অপূর্ব হালে পতিত হইলেন,। তাই তিনি বুঝিতে পারিলেন, বেচারা 'হালের' প্রাবল্যে এরূপ করিয়াছে, স্বেচ্ছায় করে নাই। তিনি বলিলেন: "নামায বাতিল হয় নাই।" বাস্তবিক ছাহেবে হালের অবস্থা সে-ই বুঝিতে পারে যে ইহার ভুক্তভোগী। আর যাহার উপর এরূপ অবস্থার আবির্ভাব কখনও হয় নাই, সে ইহার কি বুঝিবে? কবি বলেন:

اے ترا خارے بپا نشکستہ کے دانی کہ چیست + حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خورند

"ওহে, তোমার পায়ে কখনও কাঁটা বিঁধে নাই, কেমন করিয়া জানিবে যে, মস্তকে বিপদরূপ তরবারির আঘাত ভোগকারী ব্যাঘ্রের অবস্থা কিরূপ?"

আরেফ শীরাযী বলেন:

شب تاریک و بیم موج و گردابے چنیں ہائل + کجا دانند حال ما سبکساران ساحلہا

"রাত্রির অন্ধকারও বিভীষিকাময়, ওদিকে নদীর ঘূর্ণিপাকও তরঙ্গ কত ভীষণ! এমন সংকট মুহূর্তে আমাদের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহা সমুদ্র তীরে আরামে বিচরণকারীরা কোথা হইতে জানিতে পারিবে?"

সারকথা এই যে, যাহারা দিব্যি আরামে তীরের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহারা সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা কেমন করিয়া বুঝিবে যে, সে কেমন বিপদের সম্মুখীন হইতেছে?

এই বয়েতটি সম্পর্কে একটি সূক্ষ্ম কথা এই মাত্র আমার মনে পড়িয়াছে। তাহা এই যে, সমুদ্রের তীর দুইটি। একটি এপাড়ে আর অপরটি ওপাড়ে অর্থাৎ সমুদ্র পাড়ি দিয়া যে পাড়ে পৌঁছায়। আলোচ্য বয়েতে এপাড় উদ্দেশ্য, সমুদ্র পাড়ি দিয়া যে পাড়ে পৌঁছা হয়, সে পাড় উদ্দেশ্য নহে। সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি এখনও এপাড়েই দণ্ডায়মান রহিয়াছে সমুদ্রে নামেই নাই, সে ব্যক্তি সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না। কাজেই সে ব্যক্তি নিমজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে পারে না। কেননা, তাহার অবস্থা সে বুঝিতে সক্ষম নহে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া সাঁতরাইয়া ও হাবুডুবু খাইয়া ওপাড়ে যাইয়া পৌঁছিয়াছে অর্থাৎ, তরীকতের কঠিন পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, সে ব্যক্তি সমুদ্রের পথে

ভ্রমণকারীর অবস্থা বুঝিতে পারে। কেননা, তাহার উপর দিয়া এমন একটি সময় বহিয়া গিয়াছে যে, সে সাঁতরাইয়া ও হাবুডুবু খাইয়া সমুদ্র অতিক্রম করিতেছিল, যদিও অপর পাড়ে পৌঁছিয়া যাওয়ায় তাহার অবস্থা এখন বেশ শান্ত। এই ব্যক্তি মারেফতের পথ অতিক্রমকারীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারে। অতএব, পাড়ের লোক দুই প্রকার। এক প্রকারের লোক এখনও সমুদ্রে প্রবেশ করে নাই। ইহারা সমুদ্রের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আর এক প্রকারের লোক সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অপর পাড়ে পৌঁছিয়াছে। বাহ্য দৃষ্টিতে ইহার অবস্থাও তীরবর্তী লোকেরই সমতুল্য; উভয়কে প্রশান্ত দেখা যায়। কিন্তু প্রভেদ এই যে, দ্বিতীয় প্রকারের লোক বিপদ ভুগিবার পর এখন শান্তি লাভ করিয়াছে, আর প্রথম প্রকারের লোক বিপদের সম্মুখীন হয় নাই। উভয় অবস্থার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। সুতরাং সমুদ্র অতিক্রমকারী নিমজ্জমান ব্যক্তির অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারে, কিন্তু অন্ধ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তরীকতপন্থীর 'হাল' সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন করিতে পারে না।

এই কারণেই হাজী ছাহেব মৌলবী তাজাম্মুল হুসাইনের অবস্থার উপর প্রশ্ন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন বলিয়াই কোন প্রশ্ন করেন নাই। আর যাহারা তাঁহার অবস্থার উপর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল তাহাদের কোনই অধিকার ছিল না। মোটকথা, সাধারণ লোক মনে করে, এমতাবস্থায় নামায নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেননা, নামাযের মধ্যে আরবী ছাড়া অন্য যে কোন ভাষা পাঠ করিলে সাধারণের নিকট নামায নষ্ট হইয়া যায়। এই ভুল ধারণার উৎস ইহাই যে, তাহারা আরবীকে খোদার ভাষা মনে করে, আর উর্দু ফারসী প্রভৃতি ভাষাকে মানুষের ভাষা মনে করে। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বিষয়বস্তু নামায নষ্টকারী হইলে তাহা আরবীতে পড়িলেও নামায নষ্ট হইয়া যাইবে, যেমন মৌলবী মুগীসুদ্দিন আরবী ভাষায়ই قم অর্থাৎ "দাঁড়াইয়া পড়ুন" বলিয়াছিল এবং তাহাতে তাহার নামায নষ্ট হইয়াছিল।

॥ আলেমদের ত্রুটি ॥

সাধারণ লোকের এই ভুল ধারণার মূল কারণ প্রধানতঃ আলেমদেরই ত্রুটি। কেননা, তাঁহারা কখনও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই যে, উর্দু ভাষায় দ্বীনী এলম পড়িলেও সে সমস্ত ফযীলত হাছীল হইতে পারে যাহা এলম সম্বন্ধে হাদীস ও কোরআন শরীফে উল্লেখ রহিয়াছে। অথচ হাদীস ও কোরআনে কোথাও এরূপ উল্লেখ নাই যে, এলমে দ্বীন শুধু আরবী ভাষার সহিতই নির্দিষ্ট। আলোচ্য আয়াতটি হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, যাহা আখেরাতে কাজে লাগে তাহা হিতকর এলম এবং যাহা আখেরাতের কোন কাজে লাগে না তাহাই অহিতকর বা অনিষ্টকর এলম।

ইহাতে এমন কোন উল্লেখ নাই যে, হিতকর বিদ্যা আরবী ভাষায়ই হইতে হইবে। কিন্তু আলেমগণ সম্ভবতঃ একথাটি এই কারণে পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই যে, তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন—"যদি আমরা বলিয়া দেই যে, উর্দু ভাষায় দ্বীনী মাসায়েল শিক্ষা করিয়া লইলেও এল্মের ফযীলত লাভ করা যাইতে পারে, তবে আমাদের এই মর্যাদা থাকিবে না। তখন তো সকলেই আলেম বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু আমি বলি, ইহাতেও আলেমদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় নাই; বরং দুইটি ক্ষতি হইয়াছে, একটি আলেমের অপরটি সাধারণের। সাধারণের ক্ষতি হইল এই যে, তাহারা যখন এল্মে দ্বীনকে আরবী ভাষার সহিত নির্দিষ্ট মনে করিয়াছে এবং আরবী ভাষা শিখিবার সুযোগ বা সাহস সকলের হয় নাই। উর্দু ভাষায় দ্বীনী এলম পড়াকে তাহারা এলমই মনে করে নাই। ফলে দ্বীনী মাসায়েল সম্বন্ধে তাহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ রহিয়া গিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে দ্বীনী এলম হইতেই বঞ্চিত রহিয়াছে। আলেমদের এই ক্ষতি হইয়াছে যে, সাধারণ লোকেরা যখন এল্ম্ হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রহিয়াছে তখন তাহারা আলেমদের মান-মর্যাদা সম্বন্ধেও অন্ধ রহিয়াছে। কেননা, দুনিয়ার নিয়ম এই যে, প্রত্যেক বস্তুর আদর এবং সম্মান সে-ই করিতে পারে, যে সে সম্পর্কে কিছু না কিছু অবগত আছে।

দেখুনঃ যদি কোন জমিদার কোন গ্রামের এক বিরাট অংশের মালিক হন, তবে তাঁহার সম্মান ঐ ব্যক্তিই করিতে পারে ঐ গ্রামে যাহার কিছু মাত্র অংশ রহিয়াছে। সে-ই বুঝিতে পারিবে যে, এই ব্যক্তি বড় এবং আমি ছোট। আর সে গ্রামে যাহার কোনই অংশ নাই, সে ব্যক্তি উক্ত জমিদারের মর্যাদা কিছুই বুঝিতে পারিবে না। এইরূপে মণিমুক্তা জহরতের মূল্য সে ব্যক্তি বুঝিতে পারে—যে ব্যক্তি জীবনে কখনও জহরত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে। অনভিজ্ঞের দৃষ্টিতে একখণ্ড লাল পাথর এবং ইয়াকুত পাথর উভয়ই সমান। قدر جوهر شاه بدا ند یا بدا ند جوهری । "জহরতের মূল্য বুঝিতে পারে—বাদশাহ্ কিংবা রত্ন-ব্যবসায়ী।"

হে আলেম বন্ধুগণ! আপনারা যদি সাধারণ লোককে বাদশাহ্ বানাইতে পছন্দ না করেন, তবে অন্ততঃপক্ষে তাহাদিগকে রত্ন ব্যবসায়ী অর্থাৎ, রত্নের মর্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন বানাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। তাহা হইলে তাহারা রত্নের মূল্য বুঝিতে পারিত যাহা আপনাদের নিকট রহিয়াছে। আর এখন তাহারা যেহেতু দ্বীন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত রহিয়াছে—কাজেই তাহারা বুঝিতে পারে না যে, আরবী শিক্ষিত আলেমদের নিকট কেমন মূল্যবান রত্ন আছে। অতএব, তাহারা আপনাদের মূল্য কি ছাই মাটি বুঝিবে। হাঁ, যদি তাহারা উর্দু ভাষায় কিছু আকায়েদ এবং ধর্মীয় মাসায়েল পড়িয়া লইত। আবার সে সমস্ত আকায়েদ এবং মাসায়েলের পূর্ণ বিশ্লেষণ আপনাদের মুখে শুনিতে পাইত, তখন তাহারা বুঝিতে পারিত যে,

আলেমদের নিকট এইরূপ মহামূল্য রত্ন সম্ভার রহিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহাদের নিকট আলেমদের যথেষ্ট কদর হইত।

কিন্তু আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কোন বন্ধু এই নিয়তে জনসাধারণকে উর্দু ভাষায় দ্বীনী-এল্‌ম্ তা'লীম দিতে আরম্ভ করিবেন না। ইহা তো আমি শুধু এই জন্য বর্ণনা করিয়াছি যে, যদি কেহ নিজের কদর করিবার লোক না থাকার ভয়ে উর্দু ভাষায় সাধারণ লোককে দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষা দিতে না-চাহেন তিনি যেন মনে করেন যে, সাধারণ লোক উর্দু ভাষার সাহায্যে দ্বীনী-এল্‌মের জ্ঞান লাভ করিলে তাহারা আপনার আরও অধিক সম্মান করিবে। অর্থাৎ, একথাটি আমি একটু নীচে নামিয়া বলিতেছি যে, সাধারণ লোককে উর্দু ভাষায় দ্বীনী-এল্‌ম শিখাইতে নিজেদের মর্যাদা হানির আশঙ্কা করিবেন না। অন্যথায় প্রকৃত প্রস্তাবে ভাবিয়া দেখুন, সর্বসাধারণের নিকট হইতে সম্মান বা অসম্মান লাভের কি মূল্য আছে যে, উহার পরোয়া করা হইবে? সাধারণ লোকের সমর্থন বা শ্রদ্ধা এমন কি বস্তু যে, উহার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে? আলেমদের অভিরুচি তো এইরূপ হওয়া উচিত:

دلا را ئے کہ داری دل درو بند + دگر چشم از همه عالم فرو بند

"তোমার যে প্রিয়জন রহিয়াছে অন্তর তাঁহাতেই নিবদ্ধ কর। এতদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ হইতে চক্ষু বন্ধ কর।"

জনসাধারণ কদর করিয়া তোমাকে কি দিতে পারিবে? শুধু দুনিয়ার কয়েক খণ্ড ভাঙ্গা টুক্‌রা। এল্‌মের দ্বারা আপনি যে পূর্ণতা গুণ লাভ করিয়াছেন উহার সম্মুখে ইহার অস্তিত্ব কি?".

কবি বলেন:

خلیل آسا در ملک یقین زن + نوائے "لا احب الافلین" زن

زر و نقره چیست تا مجنون شوی + چیست صورت تا چنین مفتون شوی

"ইব্‌রাহীম খলিলের (আঃ) মত বিশ্বাস অর্জন কর। لا احب الافلين অর্থাৎ, "নশ্বর পদার্থকে আমি পছন্দ করি না" ধ্বনি উত্থিত কর। স্বর্ণ-রৌপ্য কি পদার্থ যে, উহার জন্য পাগল হইবে? উহার রূপই বা কি যাহার জন্য এত আত্মহারা হইয়া পড়িবে?"

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজকাল আলেমদের মধ্যে এই অভিরুচির যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। আজকাল অধিকাংশ লোক এল্‌ম শিক্ষা করার পরেও সর্ব-সাধারণের দৃষ্টিতে মান-সম্মান ও পদমর্যাদার প্রত্যাশী রহিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহারা সর্বসাধারণের মনস্তুষ্টির জন্য কোন কোন সময় এমন কার্যে লিপ্ত হইয়া পড়েন—যাহাকে তাঁহারা অন্তরে সমর্থন করেন না। কেহ কেহ যখন দেখেন যে, অমুক জায়গায় অবস্থান করিলে সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে আমার কোন

মর্যাদা থাকিবে না, তখন সেই স্থান ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন এবং যেই জায়গায় গেলে তিনি অধিক সম্মান লাভ করিবেন বলিয়া আশা করেন, তদ্রূপ স্থানের অন্বেষণ করিতে থাকেন।

কতক লোক এমনও আছেন যাঁহারা সর্বদা এইরূপ চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন যেন বাজারে কিংবা কোন স্থানে গেলে দুই চারি জন লোক তাহাদের সহচররূপে সঙ্গে থাকে, একাকী চলাফেরা করা তাহাদের পছন্দনীয় নহে। অথচ হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, পথিমধ্যে তাঁহার সহিত কিছু সংখ্যক ছাহাবী একত্রিত হইলে তিনি তাঁহাদের কয়েকজনকে সম্মুখে এবং কয়েজনকে পশ্চাতে রাখিতেন। তিনি সকলের সম্মুখে কখনও থাকিতেন না।

এইরূপে মজলিসে গেলে তিনি যেখানে স্থান দেখিতেন সেখানেই বসিয়া পড়িতেন। তাঁহার বসিবার জন্য কোন বিশিষ্ট স্থান ছিল না। এমনকি বহিরাগত কেহ বুঝিতে পারিত না যে, ইহাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে?" যে পর্যন্ত না সে জিজ্ঞাসা করিত যে, من محمد فيكم "তোমাদের মধ্যে মোহাম্মদ (দঃ) কে?" এবং ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উত্তরে বলিয়া দিতেন যে, هذا الابيض المتكئ "অর্থাৎ এই গৌর বর্ণের লোকটি যিনি ঠেস্ দিয়া বসিয়াছেন ইনিই হযরত মোহাম্মদ (দঃ)।"

হুযূর (দঃ) মক্কা হইতে হিজরত করিয়া যখন মদীনায় পৌঁছিলেন, তখন মদীনাবাসীরা শহর হইতে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)ও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তিনি হুযূর (দঃ)-এর চেয়ে বয়সে দুই কিংবা আড়াই বৎসরেরই ছোট ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৈহিক শক্তি হুযূরের মত সবল ছিল না। কাজেই বয়সে ছোট হওয়া সত্ত্বেও দেখিতে তাঁহাকে হুযূর (দঃ)-এর চেয়ে বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত। কেননা, তাঁহার চুল অধিক সাদা হইয়া গিয়াছিল। আর হুযূর (দাঃ)-এর সর্ববিধ শক্তি খুব দৃঢ় ও সবল ছিল। তৎকালে সম্ভবতঃ তাঁহার একটি চুলও সাদা হইয়াছিল না। কেননা, এন্তেকালের সময় হুযূর (দঃ)-এর মাত্র অল্প কয়েকটি চুলই সাদা হইয়াছিল। হিজরতের ঘটনা ছিল এন্তেকালের দশ বৎসর পূর্বে। অতএব, তখন সম্ভবতঃ তাঁহার একটি চুলও সাদা হইয়াছিল না। এই কারণে অনেকেই হযরত আবুবকরকেই রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) মনে করিয়াছিল। সকলে আসিয়া হযরত আবু বকরের সহিত 'মুছাফাহা' করিতে আরম্ভ করিল। হুযূরের সহিত কেহই মুছাফাহা করে নাই। দেখুন কি বিচিত্র নম্রতা!

হুযূর (দঃ)ও কাহাকেও বলেন নাই যে, "আমার সঙ্গে মুছাফাহা কর। আমিই আল্লাহর রাসূল মোহাম্মদ।" আবার দেখুন, হযরত আবু বকরের সরলতা তিনিও মুছাফাহা করিতে অস্বীকার করেন নাই। যে কেহ মুছাফাহা করিতে আসিত নির্বিকার মনে হাত বাড়াইয়া দিতেন। তিনি সম্ভবতঃ ইহাতে হুযূর ছাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লামের আরামের চিন্তা করিয়া থাকিবেন যে, এতটুকু কষ্টই বা হুযুর (দঃ)কে কেন দিব ? মোটকথা, অনেক্ষণ যাবৎ মানুষ হযরত আবু বকরকেই আল্লাহ্‌র রাসূল মনে করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে যখন হুযূর (দঃ)-এর দেহে রৌদ্রের তাপ লাগিতে আরম্ভ করিল, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) দাঁড়াইয়া নিজের চাদর দ্বারা হুযূরের উপর ছায়া করিতে লাগিলেন। ইহাতে লোকে বুঝিতে পারিল যে, ইনি খাদেম, যাহার সঙ্গে আমরা মুছাফাহা করিতেছিলাম এবং অপর জন প্রভু। আচ্ছা বলুন তো, এই বিনয়ের ও সরলতার কোন সীমা আছে ?

কিন্তু আজকাল তো মানুষ নিজে নিজেই বড় হওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর যদি কেহ চেষ্টা নাও করে, তবুও সর্বসাধারণ তাহার পা চুম্বন করিলে সে মনে মনে সন্দেহ করিতে থাকে যে, আমি অবশ্যই একজন বড় মানুষ, তাই তো ইহারা আমার এত সম্মান করিতেছে। ইহা অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, মানুষের অনেক দোষ এমন আছে যাহা সে জানে এবং অপরে জানে না। অর্থাৎ, অন্যান্য লোক তাহার দোষ সম্বন্ধে অজ্ঞ ও জাহেল। কিন্তু সে জাহেল ও অজ্ঞ লোকদের নিকট তা'যীম ও সম্মান পাইয়া মনে করিতে আরম্ভ করে যে, আমি বাস্তবিকই এই তা'যীম পাওয়ার উপযুক্ত এবং নিজের মধ্যে যে সমস্ত দোষ-ত্রুটি আছে বলিয়া নিশ্চিতরূপে তাহার জানা আছে সেগুলির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করে না ; বরং সেগুলি ভুলিয়াই যায়।

যেমন কথিত আছে যে, কোন এক নাপিতের স্ত্রী জনৈকা ভদ্র মহিলাকে নাকের নথ খুলিয়া মুখ ধৌত করিতে দেখিয়া মনে করিল, সে বিধবা হইয়া গিয়াছে। দৌড়িয়া নিজের স্বামীর নিকট আসিয়া বলিলঃ "কি দেখিতেছ ঃ সত্বর যাও এবং অমুক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ উক্ত ভদ্র মহিলার স্বামীকে) সংবাদ দাও, "তোমার স্ত্রী বিধবা হইয়া গিয়াছে।" সেই নাপিতও তেমনই আহ্‌মক ছিল। দৌড়িয়া গেল, ঘটনাক্রমে সেই লোকটিও নির্বোধ ছিল। নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাড়ীতে সব ভাল আছে তো ? নাপিত বলিল ঃ 'হুযুর সবই ভাল ; কিন্তু আপনার স্ত্রী বিধবা হইয়া গিয়াছে।' বাস এই সংবাদ শ্রবণ করিতেই তিনি কান্না-কাটি জুড়িয়া দিলেন। এক বন্ধু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "ভাল তো ? এই কান্নাকাটি কিসের ? বলিল ঃ "আমার বিবি বিধবা হইয়া গিয়াছে।" বন্ধু বলিলেনঃ 'আরে খোদার বান্দা ! একটু বিবেক বুদ্ধি খাটাইয়া কাজ কর। তুমি যখন জীবিত রহিয়াছ, তখন তোমার স্ত্রী বিধবা কেমন করিয়া হইল ?' সে কি বলে শুনুন, ইহা তো আমিও বুঝি, কিন্তু বাড়ী হইতে যে বিশ্বস্ত নাপিত সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে।

বছ, আজকালকার লোকদের মধ্যে অনেকেরই এই অবস্থা। তাহারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে খুবই অবগত আছে এবং ভাল করিয়া বুঝে যে, আমি কোন তা'যীমেরই যোগ্য নহি। কিন্তু মানুষের সম্মান ও তা'যীম দেখিয়া ধারণা করে যে, বিশ্বস্ত

ও নির্ভরযোগ্য লোক যখন আমার সম্মান করিতেছে, তবে সম্ভবতঃ আমার অবস্থা ইহারা আমার চেয়ে অধিক অবগত আছে এবং যে সমস্ত দোষ আমার মধ্যে আছে বলিয়া আমি মনে করিতেছি তাহাও বোধ হয় নাই। অতএব, সেই কথাই হইল, "বাড়ী হইতে যে বিশ্বস্ত নাপিত সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে।"

জনৈক মোল্লাজী ছেলেপিলেদিগকে পড়াইতেন। এক দিন ছেলেরা পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, আজ যে প্রকারেই হউক ছুটি লইতে হইবে। সকলে একমত হইয়া ঠিক করিল যে, মোল্লাজী আসা মাত্রই একটি ছেলে চিন্তান্বিত চেহারা ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিবে ঃ "হুযূর ভাল আছেন তো? আপনার চেহারা কিছু রোগা রোগা মনে হইতেছে। অতঃপর এক এক করিয়া প্রত্যেকে তাঁহার সামনে যাইবে এবং ইহাই বলিতে থাকিবে। যাহা হউক, মোল্লাজী আসিলেন। তৎক্ষণাৎ একটি ছেলে চিন্তান্বিত সাজিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, হুযূরের শরীর কেমন? ভাল আছেন তো? মুখ খানি যেন কিছু রোগা রোগা মনে হইতেছে। মোল্লাজী তাহাকে ধমকাইয়া দিলেন, "যা, যা, বসিয়া নিজের কাজ কর। আমি বেশ ভালই আছি। এই মাত্র পেট ভরিয়া খাইয়া আসিলাম।" সে তো যাইয়া বসিয়া পড়িল। আর একজন আসিয়া তদ্রূপ বলিল, মোল্লাজী তাহাকেও ধমকাইয়া দিলেন। তৃতীয় একজন আসিল, এখন মোল্লাজীর মনে সন্দেহ ঢুকিল তাহাকেও হটাইয়া দিলেন, কিন্তু একটু নরম সুরে। এখন কার পূর্বের মত তেজ নাই। চতুর্থ জন আসিল। এখন তো মোল্লাজীর সন্দেহ দৃঢ় হইয়া গেল। "বাস্তবিকই হয়ত আমার চেহারা রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাই তো ছেলেরা সকলে আসিয়া আমার স্বাস্থ্যের খবর লইতেছে। অতঃপর আর এক জন আসিল, এখন তো মোল্লাজীর দস্তর মত জ্বরই আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি কাপড় গায়ে জড়াইয়া বাড়ীর দিকে যাত্রা করিলেন এবং মক্তব বন্ধ করিয়া দিলেন। ছেলেরা ছুটি পাইল।

মোল্লাজী আহা, উহু করিতে করিতে বাড়ী পৌঁছিলেন, বিবি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ "কি হইল? এখনই তো এখান হইতে ভাল মানুষটি গেলে?" মোল্লাজী তাঁহাকে লইয়া পড়িলেন। "তুমি তো ইহাই চাও যে, আমি মরিয়া যাই, আর তুমি অন্যত্র বিবাহ কর, কাজেই তো বলিতেছ—"তুমি তো এই মাত্র এখান হইতে ভাল মানুষটি গিয়াছিলে।" আমি ভাল মানুষটি গিয়াছিলাম? তখনই আমার চেহারা রুগ্ন ছিল। ছেলেরা বুঝিতে পারিয়াছে আর তুমি বুঝিতে পার নাই যে, আমি রুগ্ন হইয়া পড়িয়াছি।

ফলকথা, কথায় কথায় আশে-পাশের লোকজন আসিয়া জড় হইল। মোল্লাজী তাহাদের নিকট স্ত্রী সম্বন্ধে অভিযোগ করিল। তখন এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, মোল্লাজী তোমার বুদ্ধি কোথায়? ছেলেরা তো তোমার সঙ্গে দুষ্টামি করিয়াছে।

তাহারা তোমার নিকট হইতে ছুটি লওয়ার জন্য এই ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। এই মাত্র তাহাদিগকে রাস্তায় বলিতে শুনিলাম, আজ আমরা খুব ছুটি লইয়াছি। তুমি নির্বোধ বলিয়া তাহাদের ধোকায় পড়িয়া গিয়াছ। তখন মোল্লাজীর কিছু হুশ হইল। বন্ধুগণ! এই গল্পে তো সকলেই মোল্লাজীকে নির্বোধ সাব্যস্ত করিবেন। কিন্তু খবর নাই যে, আমরা সকলেই এরূপ নির্বুদ্ধিতার মধ্যে পতিত আছি। যখনই চারি জন লোক আসিয়া আমাদের হাত-পা চুম্বন করিতে আরম্ভ করিল, তখনই আমাদের সন্দেহ হইতে লাগিল সত্যই আমরা বুযুর্গ লোক। এই মর্মেই মাওলানা বলিতেছেন:

ایںنش گوید نے منم انبا ز تو + انش گوید نے منم همراز تو
او چو بیند خلق را سر مست خویش + از تکبر می رود از دست خویش
اشتها ر خلق بند محکم ست + بنداوا ز بند آهن کے کم ست
خویش را رنجور سازوزار زار + تاترا بیرون کنند ازا شتها ر

"এই ব্যক্তি তাহাকে বলে না, আমি তোমার শরীক। ঐ ব্যক্তি তাহাকে বলে না, আমি তোমার রহস্য-সঙ্গী। সে যখন মানুষকে নিজের প্রতি অনুরক্ত দেখিতে পায় অহংকারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। মানুষ-সমাজে খ্যাতি লাভ করা একটি মজবুত বন্ধন বিশেষ। ইহার বন্ধন লৌহ বন্ধষ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। নিজেকে দুঃখিত ও দুর্বল করিয়া রাখ, তাহা তোমাকে খ্যাতিলাভের মোহ হইতে মুক্ত করিবে।"

উপরে যাহাকিছু বলা হইল, তাহা সর্বসাধারণ লোকের তা'যীম ও সম্মানের আভ্যন্তরীণ অনিষ্টকারিতা। আর জগতে উহার বাহ্যিক অনিষ্টকারিতা এই যে:

خشمها وچشمها ور شکها + بر سرت ریزد چو آب از مشکها

"ক্রোধ, কুদৃষ্টি এবং হিংসা তোমার মাথার উপর বর্ষণ করিবে যেমন মোশক হইতে পানি ঢালা হয়।" অর্থাৎ, যেখানেই সর্বসাধারণ কাহারও অতিরিক্ত সম্মান ও তা'যীম আরম্ভ করিয়া দিল, তখনই মানুষ তাহার প্রতি হিংসা পোষণ করিতে শুরু করিল তাহার বহু শত্রু জন্মিয়া গেল। তাহারা সেই তা'যীম ও সম্মান দেখিলে তাহাদের চক্ষু জ্বালা করিতে থাকে। দিবা-রাত্র এই চেষ্টা করিতে থাকে—কি প্রকারে সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে তাহাকে হেয় করা যায়। সুতরাং তাহারাই সুখে ও শান্তিতে বাস করে, যাহাদের কোন খ্যাতি নাই। যাহাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসাই করে না, তাহার সহিত কাহারও হিংসাও থাকে না, শত্রুতাও থাকে না।

آنانکه بکنج عافیت بنشستند + دندان سگ ودهان مردم بستند
کاغذ بدریدند وقلم بشکستند + وزدست وزبان حرف گیران رستند

"যাহারা (সুখ্যাতি ও মান মর্যাদার প্রত্যাশা ছাড়িয়া) নিরাপদে ঘরে বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহারা কুকুরের দাঁত এবং মানুষের মুখ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কাগজ

ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, কলম ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন এবং সমালোচনাকারীদের হাত ও মুখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।"

যাহা হউক, আমি বলিতেছিলাম, সর্বসাধারণের সম্মান এবং তা'যীম লাভ করা এবং তাহাদের দৃষ্টিতে মান-মর্যাদা অর্জন করা এমন বস্তু নহে যাহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। চুলায় যাক্ সর্বসাধারণের মনস্তুষ্টি। মানুষের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ অন্বেষণ করা। কেননা, সাধারণ লোকের ভক্তি লাভের বিভিন্ন প্রকারের অনিষ্টকারিতা আমি আপনাদিগকে বলিয়া দিয়াছি। তাহাতে ভিতর-বাহির উভয় দিকেরই ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকে। إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللّٰهُ "কিন্তু আল্লাহ্ যাহাকে রক্ষা করেন" তাহার কথা স্বতন্ত্র।

।। আলেমদের প্রতি হেদায়ত ।।

সুতরাং এল্‌মের ফযীলত কেবল মাত্র আরবী ভাষার সহিত সীমাবদ্ধ না করা আলেমদের কর্তব্য। ইহাও ধারণা করা উচিত নহে যে, উর্দু ভাষায় দ্বীনী-এল্‌ম শিক্ষার্থী যদি আলেমের সমান মর্যাদার অধিকারী হইয়া গেল, তবে আমাদিগকে কে জিজ্ঞাসা করিবে? আমি বলি, তোমরা এরূপ ধারণাকে অন্তর হইতে বিতাড়িত করিয়া দাও এবং নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া দাও। অতঃপর দেখিবে তোমাদেরই সম্মান বৃদ্ধি পাইবে। নিজেকে বিলুপ্ত করার মধ্যে এই বিশেষত্ব আছে যে, তাহাতে খ্যাতি বাড়িয়া যায়। আমি তো বলিয়াই থাকি যে, যাহারা মান-মর্যাদার প্রত্যাশী তাহারা মানমর্যাদা লাভের পন্থাই জানে না। সম্মানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইলেই সম্মান আরও অধিক লাভ হয়, অন্বেষণে বা প্রত্যাশার দ্বারা লাভ হয় না। কিন্তু আবার ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, সম্মান বৃদ্ধি পাওয়ার নিয়তে যদি কেহ সম্মানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়, তাহার কিছুই লাভ হইবে না। যদি কেহ এই নিয়তে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে যে, ইহাতে আমি বিনয়ী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিব, তবে এরূপ বিনয়ও অহংকারেরই শামিল হইবে। মোটকথা, নিজেকে গোপন করিয়া রাখার মধ্যে এই বিশেষত্ব আছে যে, তাহাতে খ্যাতি লাভ হয়। একজন বুযুর্গ লোক বলিতেছেন :

اگر شہرت ہوس داری اسیر دام عزلت شو + کہ در پرواز دارد گوشہ گیری نام عنقا را

"খ্যাতি লাভের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে নির্জন কোণের বন্দী হও। কেননা, আত্মগোপনই ওন্‌কা পক্ষীর নামকে বিখ্যাত করিয়া রাখিতেছে।" আর একটি কথা এই যে, তুমি সারা জগতবাসীকে আলেম বানাইয়া দিলেও পরিশেষে তুমিই বড় থাকিবে। কেননা, তবুও তুমি হইবে ওস্তাদ আর সারা জগত হইবে তোমার ছাত্র। ছাত্র যতই বড় হউক না কেন মর্যাদায় ওস্তাদের চেয়ে খর্বই থাকে, যদিও

বাহিরে বড় বলিয়া মনে হয়। যেমন, কেহ যদি নিজের ছোট ভাইকে মোটা তাজা হওয়ার জন্য দুধ-ঘি খাওয়ায় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সে এমন মোটা তাজা হইয়া পড়ে যে, বাহ্য দৃষ্টিতে তাহাকে বড় ভাই অপেক্ষা বড় এবং বড় ভাইকে তাহার চেয়ে ছোট বলিয়া বোধ হইতে থাকে, তবে কি মর্যাদার এবং সম্মানের দিক দিয়াও বড় ভাই তাহার চেয়ে ছোট হইয়া যাইবে? কখনই নহে, বড় ভাই তবুও বড়ই থাকিবে। অনুরূপ ভাবে সমস্ত মানুষ যখন তোমার ছাত্র হইবে তোমার তখনকার মর্যাদা এখনকার মর্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। কেননা, তাহারা বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মধ্যে এল্‌মরূপ মহামূল্য রত্ন রহিয়াছে। 'মীযান' (প্রাথমিক আরবী ব্যাকরণ) পাঠকারী 'শরহে মোল্লাজামী (উচ্চস্তরের আরবী ব্যাকরণ) পাঠকারীকে এই জন্য সম্মান করে যে, সে বুঝিতে পারে—শরহে মোল্লাজামীর ছাত্র এই স্তরের তালেবে এল্‌ম, আর যে ব্যক্তি কিছুই পড়ে নাই তাহার দৃষ্টিতে 'মীযান' পাঠকারী এবং শরহে মোল্লাজামী পাঠকারী উভয়েই সমান।

মোটকথা, পাঠ্য তালিকার মধ্যে ব্যাপৃতি দান করা আলেমদের কর্তব্য। একটি তালিকা পূর্ণাঙ্গরূপে তাহাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত যাহারা আরবী ভাষা শিখিবার সুযোগ এবং অবসর পায়, আর এক প্রকারের আরবী পাঠ্য তালিকা সে সমস্ত লোকের জন্য সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত যাহারা আরবী পড়িতে আগ্রহশীল কিন্তু অবসর কম। তৃতীয় প্রকারের পাঠ্য তালিকা উর্দু ভাষায় সে সমস্ত লোকের জন্য হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহারা আরবী পড়িতে পারে না। তাহাদিগকে উর্দু ভাষার মাধ্যমে ধর্মের আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রদান পূর্বক ইস্‌লামী আকায়েদ এবং কারবার সম্বন্ধীয় বিধানগুলি জানাইয়া দেওয়া উচিত। চতুর্থ প্রকারের আর একটি পাঠ্য তালিকা ঐ বুড়ো তোতাদের জন্য নির্ধারিত হওয়া উচিত, যাহারা উর্দুও পড়িতে পারে না। কেননা, সে বুড়ো লোকদের পক্ষে এখন মক্তবে যাইয়া শিক্ষা লাভ করা কঠিন। তাহাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করা উচিত যে, কোন একজন আলেম প্রতি সপ্তাহ অন্তর এক দিন কিতাব সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে পড়িয়া শুনাইবেন এবং ভালরূপে বুঝাইয়া দিবেন। এই উপায়ে গ্রামের সকল লোকই শিক্ষা লাভ করিতে পারে। গ্রামের লোকদেরও কর্তব্য একজন আলেম লোককে নিজেদের গ্রামে নিযুক্ত করিয়া রাখা। দশ পনর টাকা মাসিক বেতনে এমন এক জন আলেম অবশ্যই তাঁহারা পাইবেন যিনি অন্ততঃ সপ্তাহে এক দিন তাঁহাদিগকে ধর্মের আবশ্যকীয় মাস্‌আলাগুলি শিক্ষা দিবেন। আলেমদেরও উচিত গ্রামের লোকদের শিক্ষা প্রদানেরপ্রতি মনোযোগী হওয়া। ইহাতে একটি স্বার্থ এই হইবে যে, তাহাদিগকে 'উপযুক্ত শিক্ষা দিলে তাহারা কাহারও ধোকায় পতিত হইবে না। অন্যথায় কোন মূর্খ ওয়ায়েয তাহাদিগকে বিপথে চালিত করিতে পারে। তখন যে

সম্মান আজকাল তোমরা তাহাদের নিকট হইতে লাভ করিতেছ তাহা সমস্তই লোপ পাইবে। এমন ঘটনা অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়।

এক ব্যক্তি গ্রামে যাইয়া চিন্তা করিল, কোন উপায়ে এসমস্ত মোল্লাদের পাততাড়ি উঠাইয়া দেওয়া উচিত। সে এক পন্থা অবলম্বন করিল যে, সমস্ত মোল্লাদের পরীক্ষা লইতে আরম্ভ করিল। সে সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, বলুন তো نمی دا نم বাক্যের অর্থ কি ? যদি কোন মোল্লাজি উহার অর্থ বলিতে না পারিতেন তবে তো অপদস্ত হইতেনই। আবার কেহ অর্থ জানিলেও তাহাকে ইহাই বলিতে হইত, "আমি জানি না" কেননা, نمی دا نم বাক্যের অর্থ ইহাই। তখন সে জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিত, তোমাদের মোল্লা নিজেই স্বীকার করিল যে, সে ইহার অর্থ জানে না। নিজের মূর্খতা সে নিজেই স্বীকার করিতেছে। তখন গ্রামবাসীরা বুঝিত যে, বাস্তবিকই এই মোল্লা মূর্খ। ইহাকে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।

আর এক ব্যক্তি কোন এক গ্রামে যাইয়া তথাকার মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিল, বলুন তো ایمان নোক্তাওয়ালা না নোক্তাশূন্য ? বাহ্য দৃষ্টিতে তো এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা উচিত ছিল যে, ایمان নোকতাওয়ালা। কেননা, ইহাতে ی এবং ن অক্ষরদ্বয় নোক্তাবিশিষ্ট, কাজেই ایمان শব্দ নোকতাওয়ালা হইল ; কিন্তু প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ইহা ছিল না। সেই মোল্লাজীও ছিলেন বেশ চতুর। তিনি বলিলেন : ایمان নোক্তাশূন্য। পরীক্ষাকারী জিজ্ঞাসা করিল : "কিরূপে ?" তিনি বলিলেন : 'দেখ ঈমান لا اله الا الله محمد رسول الله কলেমাকে বলা হয়। এই কলেমার কোন অক্ষরেই নোক্তা নাই।' ইহা শুনিয়া পরীক্ষক বলিল : "আপনি উত্তর ঠিকই দিয়াছেন। কিন্তু উহার কারণ ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই।" মোল্লাজী বলিলেন : "আচ্ছা তবে তুমি ঠিক কারণ বলিয়া দাও।" সে বলিল : "ঈমানকে এই কারণে নোক্তাবিহীন বলা যায় যে, তুমি যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর, তুমি কি মুসলমান ? সে উত্তরে বলে, الحمد لله। এবং দেখ ইহার কোন অক্ষরে নোক্তা নাই।" মোল্লাজী ইহা শুনিয়া চিন্তা করিলেন, গ্রামবাসীদের সম্মুখে ইহার কথাকে কোন প্রকারে ভুল প্রমাণ করিতে হইবে। অতএব, তিনি বলিলেন, তোমার বর্ণিত এই কারণ মোটেই ঠিক নহে। কেননা, এই প্রশ্নের উত্তরে মানুষ শুধু الحمد لله। না বলিয়া شكر الحمد لله "শোকর আলহামদুলিল্লাহ্" বলে এবং দেখিতেই পাইতেছ এই উত্তরে ش অক্ষরে নোক্তা আছে। কাজেই ایمان নোক্তাওয়ালা হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমি যে কারণ বর্ণনা করিয়াছি তাহাই ঠিক। বস্, অতটুকু কথায়ই মোল্লাজীর জয় হইল এবং গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল যে, আমাদের মোল্লাজী বড়ই শিক্ষিত লোক। যাহা হউক, আমার বক্তব্য এই ছিল যে, গ্রামের অজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা প্রদান করিলে একটি স্বার্থ ইহাও

হইবে যে, তোমরা গ্রামে টিকিয়া থাকিতে পারিবে ; কেহ তোমাদিগকে ধোকায় ফেলিতে পারিবে না। ইহা তো একটি কৌতুকের কথা বলিলাম। তোমরা যদি টিকিতেও না পার তথাপি তোমাদের পুরস্কার আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রাপ্য হইবে। সওয়াব কোথায়ও যাইবে না। ইহা কি কম স্বার্থ ? অতএব, তোমরা রুটির চিন্তা করিও না। আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা কর। রুটির চিন্তা করা আলেম লোকের উচিত নহে। আলেমের শান নিম্নরূপ হওয়া উচিত :

اے دل آں بہ کہ خراب از مے گلگوں باشی + بے زرو گنج بصد حشمت قارون باشی
در رہ منزل لیلے کہ خطرہاست بجاں + شرط اول قدم آنست کہ مجنون باشی

"হে মন! দরিদ্রতা ও ফকীরীর রঙ্গীন শরাবে মত্ত থাকা তোমার জন্য কারূনের ন্যায় ধনবান হইয়া মহা জাঁকজমকে থাকা অপেক্ষা বহু গুণে উত্তম। প্রিয়তমের এশ্‌কের পথে জীবনের উপর অনেক বিপদ আছে। তথায় প্রথম পদক্ষেপের শর্ত এই যে, তোমাকে পাগল হইতে হইবে।" আলেমদের উচিত, নিজেদের অনাহারের জন্য গর্বিত থাকা। লোকের ধন-দৌলতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা উচিত নহে এবং মনে এরূপ বলা উচিত :

ما اگر قلاش و گر دیوانہ ایم + مست آں ساقی و آں پیمانہ ایم
اوست دیوانہ کہ دیوانہ نہ شد + مرعسس را دید و در خانہ نہ شد

"আমরা যদিও দরিদ্র কিংবা আমরা পাগল, কিন্তু আমরা সেই "শরাবে এশ্‌কের সাকী (শরাব পরিবেশনকারী) এবং পেয়ালার পাগল। যে ব্যক্তি (আমাদের ন্যায়) পাগল নহে সেই প্রকৃত পাগল। সে দ্বারবানকে দেখিয়াই পশ্চাৎপদ হইয়াছে ঘরে প্রবেশ করে নাই।"

॥ এল্‌মের পরশমণি ॥

আমি সত্যই বলিতেছি যে, এল্‌মের মধ্যে এমন স্বাদ রহিয়াছে যাহার সম্মুখে দুনিয়ার যাবতীয় স্বাদ তুচ্ছ। আলেম হইয়া দুনিয়ার লোভ ? তাজ্জুবের কথা : দুনিয়া কোন্ ছাই বস্তু, এল্‌মের সম্মুখে উহার অস্তিত্ব কি ? তবে তোমাদের অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা। সে সম্বন্ধে নিশ্চিত থাক—আলেম লোক কখনও ভুকা থাকে না। ভুক্ নিবৃত্তির চেয়ে অধিক তোমাদের প্রয়োজন নাই। আলেম লোকের উচিত পরমুখাপেক্ষী না থাকা। দুনিয়াদারদের মনে কখনও এই চিন্তা যেন না আসিতে পারে যে, আলেমেরা আমাদের মুখাপেক্ষী।

বন্ধুগণ : তোমরা কি 'কিমিয়াগার (রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বর্ণ প্রস্তুতকারী) অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া গেলে ? তাহারা এই যৎসামান্য ভিত্তিহীন বস্তুর প্রভাবে এমন অভাশূন্য হইয়া যায় যে, নওয়াব এবং বাদশাহ্‌কেও নিজেদের সম্মুখে তুচ্ছ মনে

করে। অথচ তোমাদের নিকট এত বড় কিমিয়া রহিয়াছে যাহার সম্মুখে সহস্র কিমিয়া ধূলিকণা সদৃশ। এল্‌মের কিমিয়া এমন সম্পদ যাহার সাহায্যে বেহেশ্‌ত্ এবং আল্লাহ্‌র সন্তোষ ভাগ্যে জোটে। ইহার মোকাবেলায়, আল্লাহ্‌র কসম সপ্তবসুন্ধরার রাজত্বও তুচ্ছ। অতএব, আশ্চর্যের বিষয়, এত বড় কিমিয়ার অধিকারী হইয়াও তোমরা দুনিয়াদারের খোশামোদ করিতেছ! তাহাদের ধন-দৌলতের প্রতি লোভ করিতেছ! এই চিন্তা তোমাদের করা উচিত নহে যে, সকলকে আলেম বানাইয়া দিলে আমাদিগকে কে জিজ্ঞাসা করিবে? আমি বলিতেছি, তোমাদের তত্ত্বাবধান করিবেন আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহার হাতেই আসমান ও জমিনের সমস্ত ধন ভাণ্ডার। খোদা যখন তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, তখন তিনি কখনও তোমা-দিগকে অনাহারে মারিবেন না। তবে তোমাদের কিসের চিন্তা? অতএব, দ্বীনি এল্‌মের তা'লীম ব্যাপক হওয়া উচিত। ইহার পন্থা আমি বলিয়া দিয়াছি। এখন শুধু স্ত্রী-শিক্ষার মাস্‌আলাটি বর্ণনার বাকী রহিয়াছে। স্ত্রী-লোকদিগকে তাহাদের স্বামিগণ শিক্ষা প্রদান করিবে: একজন স্ত্রী লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সে অনেকজন স্ত্রী লোককে শিক্ষা দিতে পারে।

নিন, আমি এখন পন্থা বলিয়া দিলাম যদ্দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত মুসলমানই আলেম হইতে পারে। কিন্তু এই পন্থা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। তাহাও দৃঢ়তা সহকারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুসলমানদের মধ্যে দৃঢ়তারই অভাব। কোন কাজই পূর্ণরূপে সমাধা করিতে চায় না। অথাৎ এল্‌ম পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার বিষয়। কেননা, ইঁহার ধারাবাহিকতা কখনও শেষ হয় না। এল্‌ম শিক্ষা করা সারা জীবনের কাজ। কবি বলেন:

اندریں راہ می تراش و می خراش + تا دم آخر دمے فارغ مباش -

تا دم آخر دمے آخر بود + کہ عنایت باتو صاحب سر بود

"এই পথে যত্ন ও চেষ্টা সহকারে প্রবৃত্ত থাক। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এক মুহূর্তও অবসর থাকিও না, যেন তোমার অন্তিম মুহূর্ত পথের শেষ মুহূর্ত। আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী তোমার সঙ্গী হয়।"

কোন এক রসিক বুযুর্গ লোক একটি ছেলে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন: "এই ছেলেটি কি পড়ে?" তাহার পিতা উত্তর করিল: "হযরত! সে কোরআন শরীফ হেফ্‌য্ করিতেছে।" বলিলেন: "আরে ভাই! বেচারাকে জনমরোগে কেন লাগাইলে?" তিনি কোরআন শরীফ হেফ্‌য্ করাকে জনমরোগ এই জন্য বলিয়াছেন যে, বাস্তবিক পক্ষে কোরআন শরীফ হেফ্‌য্ করা যদিও দুই এক বৎসরের কাজ কিন্তু উহার রক্ষণাবেক্ষণ করা সারা জীবনের কাজ। কোন সময়ে একটু অমনোযোগী হইলেই আর স্মরণ থাকিবে না। এই জন্য বৎসরে ইহাকে

পুনঃ পুনঃ খতম করিতে হয়। মেহরাবে দাঁড়াইয়া শুনাইতে হয়। প্রত্যহ এক এক মঞ্জিল ওযীফার ন্যায় তেলাওয়াত করিতে হয়। এই কারণে তিনি ইহাকে জনমরোগ বলিয়াছেন। কিন্তু সেই রোগ সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাতে খোদা তা'আলা রাযী থাকেন।

এইরূপে বুঝিয়া লউন, এই এল্ম্ও 'জনমরোগ'। ইহার ধারাবাহিকতা সারা জীবনের জন্য জারী থাকা উচিত। হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে :

مَنْهُوْمَانِ لَا يَشْبَعَانِ طَالِبُ الدُّنْيَا وَطَالِبُ الْعِلْمِ *

"দুই লোভী কখনও তৃপ্ত হয় না, একজন দুনিয়া অন্বেষণকারী আর একজন বিদ্যা অন্বেষণকারী।" দুনিয়ার প্রার্থী যতই দুনিয়া হাছিল করুক তাহার পেট ভরে না। এইরূপে এল্ম তলবকারী যখন এল্মের স্বাদ উপলব্ধি করে, তখন যত এল্মই হাছিল করুক এল্মে তাহার পেট ভরে না। ইহার কারণ এই যে, এল্মের পারম্পর্য অশেষ অতএব, উহার কামনারও শেষ নাই। কবি বলেন :

اے برادر بے نہایت درگہیست + ہرچہ بروے می رسی بروے مایست

"ভ্রাতঃ! একটি দরবার আছে অসীম ও অফুরন্ত। যে সীমায়ই তুমি পৌঁছ না কেন, তাহার পরে আরও কাম্য এবং প্রার্থনীয় বস্তু রহিয়াছে।"

যদি আপনি বলেন যে, সারা জীবনের জন্য ধারাবাহিকভাবে এই কাজে মশ্গুল থাকা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে। দুই এক দিনের কাজ হইলে সমাধা করিয়া ফেলা যাইতে পারে। আমি বলি, তাহা হইলে খাওয়াও ছাড়িয়া দিন এবং বলুন, প্রত্যহ দুই বেলা রুটি খাওয়ার ঝামেলা আমার দ্বারা হইবে না। এই ঝামেলাটি সারা জীবনের জন্য আপনি কেমন করিয়া বরদাশ্ত করিয়া নিলেন? যদি কেহ বলেন যে, ইহা তো খাদ্য গ্রহণ করা। ইহার উপর জীবন নির্ভর করে। আমি বলিব, খাদ্য গ্রহণ করা দৈহিক 'গেযা' আর এল্ম হাছিল করা রূহানী গেযা।

।। এল্মের ফযীলত ।।

এল্মের দ্বারাই রূহ্ জীবিত থাকে। দৈনিক দুই বেলা রুটি খাওয়া যেমন আপনার জন্য সহজ, এইরূপে এল্মের মধ্যে মশ্গুল হইয়া দেখুন তাহাও আপনার জন্য রুটি খাওয়ার ন্যায়ই সহজ হইয়া পড়িবে। আবার এল্মের মোহে পড়িয়া গেলে তখন এল্ম ভিন্ন আপনার মনে শান্তিই আসিবে না। আবার উহার মধ্যে আরও একটি লাভ এই যে, উহাতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি হাছেল হয়। যে ব্যক্তি এলম অন্বেষণের অবস্থায় মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে শহীদের সওয়াব পায়।

বন্ধুগণ! আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাগণের উপর সন্তুষ্ট থাকার জন্য উপায়

খুজিয়া বেড়ান। কোন ব্যক্তি ইমাম মোহাম্মদ (রঃ)কে তাঁহার এন্তেকালের পর স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : "আপনার কি অবস্থা ?" তিনি বলেন : আমাকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে আমার প্রতি নির্দেশ হইল : "মোহাম্মদ, চাহিবার যাহাকিছু থাকে চাও।" আমি আরয করিলাম : "আমাকে মা'ফ করিয়া দিন।" আল্লাহ্ তা'আলা বলিলেন : "তোমাকে আযাব করিবার ইচ্ছা থাকিলে আমি তোমাকে এল্ম দান করিতাম না। আমার এল্ম আমি তোমাকে এই জন্যই দান করিয়াছি যে, আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে চাহিতাম। সুতরাং ক্ষমা-তো তোমার জন্য আছেই। অন্য কিছু চাহিবার থাকিলে চাও।" سبحان الله দেখুন, দ্বীনী এল্মের কেমন ফযীলত! যেমন আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন শরীফের একস্থানে বলিতেছেন :

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামতসমূহের শোকরগোযারী কর, অর্থাৎ, ঈমান আনয়ন কর, তাহা হইলে তোমাকে শাস্তি প্রদানে আল্লাহ্ তা'আলার কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ, তোমাকে শাস্তি দিয়া আল্লাহ্ তা'আলার কি লাভ ? আল্লাহ্ তা'আলা শোকরগুযারীর বড়ই বিনিময় প্রদানকারী এবং বড় জ্ঞানী। তিনি সবকিছুরই খবর রাখেন যে, কে ঈমানদার, কে ঈমানদার নহে। তিনি প্রত্যেক মুমেনেরই ঈমানের মূল্য প্রদান করিবেন।

এই আয়াতটির মধ্যে কেমন উচ্চাঙ্গের অভিব্যক্তি! ইহা বলেন নাই যে, ঈমান আনয়ন কর। তাহা হইলে তোমাকে আযাব করা হইবে না ; বরং এরূপ বলিয়াছেন যে, "এমতাবস্থায় তোমাকে আযাব করার আমার কি প্রয়োজন ?" এই ধরনের বর্ণনাভঙ্গীতে কেমন সুন্দর বালাগাৎ রহিয়াছে। তাহা ভাষাবিদ এবং রুচি সম্পন্ন লোকই বুঝিতে পারে। বাস্তবিকই আমাদিগকে আযাব করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার কি লাভ ? তিনি তো সর্বক্ষণ আমাদিগকে ক্ষমা করার জন্যই প্রস্তুত। কেহ নিজেকে ক্ষমা করাইবার ইচ্ছা তো করুক।

এক মূর্তিপূজক সর্বদা মূর্তিকে পূজা করিত এবং নব্বই বৎসর পর্যন্ত "সনম্ সনম্ অর্থাৎ "মূর্তি মূর্তি" ওযীফা পাঠ করিত। এক দিন সনম্ সনম্ বলিতে বলিতে হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া "সমদ" শব্দ বাহির হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ আওয়ায আসিল لَبَّيْكَ يَا عَبْدِىْ لَبَّيْكَ "হে আমার বন্দা! আমি উপস্থিত আছি।" এই শব্দ শ্রবণ করিয়াই সে কাঁদিতে লাগিল এবং মূর্তিকে উঠাইয়া নিক্ষেপ করিল এবং বলিলঃ 'হতভাগা! নব্বই বৎসর ধরিয়া তোকে ডাকিতেছি এক দিনও তুই আমার ডাকে সাড়া দিলে না। সেই খোদার জন্য আমি কোরবান হই যাঁহা হইতে নব্বই বৎসর পর্যন্ত

বিমুখ ছিলাম, তথাপি ভুলে একবার তাঁহার নাম মুখে উচ্চারণ হইতেই তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ডাকে সাড়া দিলেন এবং আমার প্রতি সদয় হইলেন।"

বন্ধুগণ! একজন মূর্তিপূজকের ভুলক্রমে স্মরণ করাতেও আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাহার প্রতি এত সদয় হইলেন, তখন আপনি কি মনে করেন যে, তিনি মুসলমানের প্রতি সদয় হইবেন না? যদি বন্দা খোদাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তবে তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট ও সদয় হইবেন। অতএব, আপনি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার ইচ্ছা করিয়াই দেখুন। তিনি তো সর্বদাই বলিতেছেন:

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ + گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

ایں درگاہ ما درگہ نومیدی نیست + صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

"ফিরিয়া আস, ফিরিয়া আস, যাহাকিছুই হও না কেন ফিরিয়া আস। তুমি কাফেরই হও আর অগ্নিপূজকই হও কিংবা মূর্তিপূজকই হও, ফিরিয়া আস। এই দরবার নিরাশ হওয়ার দরবার নহে। একশত বারও যদি তওবা ভঙ্গ করিয়া থাক, আবার ফিরিয়া আস।"

অতএব দেখুন, এল্‌মের মধ্যে কত বড় লাভ! উহা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভ হয়। এই কারণে উহার পারম্পর্য বন্ধ করা উচিত নহে। কোন সময় উহার পারম্পর্য বন্ধ হইয়া গেলেও পুনরায় জারী করিয়া লওয়া উচিত। কেহ যদি নিয়মানুবর্তিতার সহিত তাহা করিতে নাও পারে, তবেনিয়মানুবর্তিতা ব্যতীতই এলম হাছিল করিতে থাকুক। একেবারে না হওয়ার চেয়ে কিছুটা হওয়া তবুও ভাল। এইরূপে অর্জন করিতে করিতে ইন্‌শাআল্লাহ্ একদিন নিয়মানুবর্তিতাও আসিয়া যাইবে। মাওলানা বলেন:

دوست دارد دوست ایں آشفتگی + کوشش بیہودہ بہ از خفتگی

"বন্ধু অনুরক্ত থাকাকেই ভালবাসে, নিষ্কর্মা শুইয়া থাকার চেয়ে বিশৃঙ্খল চেষ্টাও ভাল।" বাস্তবিক মাওলানা বড়ই জ্ঞানী, তরীকতপন্থীকে কোন অবস্থাতেই নিরাশ করেন না। বলিতেছেন, যেকের ফেকেরের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলা যদি নাও হয়, তবুও এমনি নিয়মানুবর্তিতা ছাড়াই বিশৃঙ্খল ভাবেই কাজ করিতে থাক।" বন্ধু ইহাই পছন্দ করেন। অতঃপর কেমন সুন্দর দলিল বর্ণনা করিতেছেন, বিশৃঙ্খল চেষ্টা অকর্মন্যভাবে শুইয়া থাকার চেয়ে অবশ্যই ভাল। কেননা, সে চেষ্টা তো করিতেছে। আর যে ব্যক্তি একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিয়াছে সে তো এতটুকু চেষ্টাও করে না।

॥ সংসর্গের ফল ॥

শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের পারম্পর্য রক্ষা করা যদি কাহারও দ্বারা সম্ভব নাও হয়, তাহার উচিত অন্ততঃ আলেমদের সাথে মেলামেশা করা এবং তাহাদিগ

হইতে ধর্মীয় মাসায়েল জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইতে থাকা এবং কিছু কাল তাঁহাদের সংসর্গে অবস্থান করা, বরং ইহা এমন বস্তু যে, এল্‌ম্ শিক্ষার কাজে মশ্‌গুল হইয়াও ওলামার সংসর্গে অবস্থান করা উচিত। শুধু তাঁহাদের নিকট হইতে কিতাব পড়িয়া লওয়াকেই যথেষ্ট মনে না করা উচিত। কেননা, এল্‌ম শিক্ষা করার মধ্যে একটি বস্তু এমনও আছে যাহা সংসর্গ অবলম্বন করা ছাড়া হাছিল হইতে পারে না তাহা হইতেছে ধর্মের সহিত সম্পর্ক। এই সম্পর্ক সংসর্গ অবলম্বন করা ব্যতীত কখনও হয় না। সংসর্গের মধ্যে এমন সুন্দর ক্রিয়া ও ফল রহিয়াছে যাহা শেখ্‌ সা'দী (রঃ) বলেন:

گلے خوشبوے درحمام روزے + رسیدازدست محبوبے بدستم
بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری + کہ از بوئے دلا ویز تو مستم
بگفتا من گل نا چیز بودم + ولیکن مدتے با گل نشستم
جمال همنشین در من اثر کرد + وگرنہ من همان خاکم کہ هستم

"একদা হাম্মাম খানায় কোন এক বন্ধুর হাত হইতে কতটুকু সুগন্ধযুক্ত মাটি আমার হাতে আসিল। আমি উহাকে বলিলাম, তুমি মেশ্‌ক না আম্বর? তোমার মন মাতান সুগন্ধে আমি মত্ত হইয়া পড়িয়াছি। মাটি বলিল, আমি সামান্য কতটুকু নগণ্য মাটিই ছিলাম, কিছুকাল ফুলের সংসর্গে বসিয়াছিলাম। উহার সংসর্গের সৌন্দর্য আমার মধ্যে ক্রিয়া করিয়াছে। অন্যথায় আমি যেরূপ মাটি সেরূপ মাটিই আছি।"

দেখুন, গোলাপ ফুলের সংসর্গে থাকিলে মাটির মধ্যে সুগন্ধ উৎপন্ন হইয়া যায়। এইরূপে আল্লাহ্‌ওয়ালা লোকের সংস্পর্শে থাকিলে আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং ধর্মের সাথে সম্পর্ক জন্মে। হুযূরের (দঃ) সাহচর্য লাভের ফলেই ছাহাবায়ে কেরাম এমন ফযীলতের অধিকারী হইয়াছেন যে, আজ কোন ইমাম, ফেকাহ শাস্ত্রবিদ এবং কোন শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ওলি-আল্লাহ্‌ও সর্ব নিম্নস্তরের একজন ছাহাবীর পর্যায় পৌঁছিতে পারে না। অথচ তাঁহারা তেমন লেখা-পড়াও জানিতেন না; বরং অনেক প্রকারের বিদ্যা ছাহাবায়ে কেরামের পরেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। তাঁহাদের সময়ে সে সমস্ত বিদ্যার নামগন্ধও ছিল না যাহা আজকাল প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। তাঁহাদের কামালিয়াতই এটুকু যে, তাঁহারা এসমস্ত বিদ্যার মধ্যে লিপ্ত হন নাই। কেননা,

دلفر یبان نباتی همه زیور بستند + دلبر ماست کہ باحسن خدا داد آمد
زیر بارند درختها کہ ثمرها دارند + اے خوشا سرو کہ از بند غم آزادآمد

"মনমাতান মেয়েরা সকলেই অলঙ্কার পরিয়াছে। আর আমাদের মা'শুক আল্লাহ্‌র দেওয়া সৌন্দর্য নিয়া আসিয়াছে। ফলবান বৃক্ষ ফলের ভার বহন করিতেছে, কিন্তু কি সুন্দর سرو 'সারব' বৃক্ষ; সর্ববিধ চিন্তার বেড়ী হইতে মুক্ত।"

অতএব, ছাহাবায়ে কেরামের কামালত ইহাই যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দর্শন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দর্শন ও সংসর্গ লাভের সৌভাগ্য তাঁহাদের হইয়াছিল। অতএব, স্মরণ রাখিবেন, প্রচলিত বিদ্যা ছাড়াও সংসর্গ হিতকর হইতে পারে, কিন্তু সংসর্গ ছাড়া প্রচলিত বিদ্যা তত হিতকর হইতে পারে না। এই কারণেই আজকাল বহু আলেম দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাজের আলেম দুই চারি জনই আছেন যাঁহারা কোন কামেল লোকের সংসর্গ লাভের সুযোগ পাইয়াছেন।

ফলকথা, আমি প্রমাণ করিয়া দিয়াছি যে, সকল মানুষই এল্‌মের ফায়দা হাছিল করিতে পারে। মূর্খ থাকার কোন ওযরই কাহারও নাই। আরবী ভাষায় না হউক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রহিয়া ছাত্র হিসাবে না হউক, শিক্ষালাভ করার যথেষ্ট উপায় আছে।

॥ আমীর ও বড় লোকদের ত্রুটি ॥

অবশ্য আমি সেই শ্রেণীর আমীর ও মালদার লোকের কথাই বলিতেছি আল্লাহ্ তা'আলা যাঁহাদিগকে প্রত্যেক প্রকারের সচ্ছলতা দান করিয়াছেন। তাঁহাদের চাকুরী নক্‌রীরও প্রয়োজন হয় না। খাওয়া-পরার ব্যাপারে কোন প্রকার চিন্তাও করিতে হয় না। আল্লাহ্‌র দেওয়া সবকিছুই তাঁহাদের আছে এবং এত অধিক আছে যে, কয়েক পুরুষ পর্যন্ত স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইবে। ইঁহাদের উপর এই দায়িত্ব অবশ্যই রহিয়াছে যে, তাঁহাদের অগাধ জ্ঞানী আলেম হওয়া উচিত। কেননা, আজকাল যাঁহারা আলেম হইতেছেন, অতি শীঘ্র পরিবার পোষ্যবর্গের জীবিকা নির্বাহের চিন্তা তাঁহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। সুতরাং তাঁহারা অগাধ জ্ঞান অর্জনের অবকাশ পান না। কিন্তু অতিশয় আফসুসের বিষয়, বিত্তশালী লোকেরা এবিষয়ে কোনই চিন্তা করেন না। ইঁহাদের পক্ষে সারা জীবন এল্‌ম্ হাছিল করিতে অতিবাহিত করিয়া দেওয়া সহজ। কিন্তু এই শ্রেণীর মালদার লোকেরাই সর্বাপেক্ষা অধিক অমনোযোগী। কিছু মনোযোগ ইঁহাদের থাকিলেও তাহা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি রহিয়াছে। আমি বলি না যে, তাঁহারা ইংরেজী না পড়ুন। না, তাঁহারা নিজের পার্থিব প্রয়োজনে অবশ্য পড়ুন। কিন্তু তাঁহাদের ডিগ্রী লাভের কি প্রয়োজন? তাঁহাদের তো চাকুরীর প্রয়োজন নাই। যখন চাকুরীর প্রয়োজনই তাঁহাদের নাই, তখন নিজের ঘরে মাষ্টার রাখিয়া আবশ্যক পরিমাণ ইংরেজী শিখিয়া নিতে পারেন। যদ্দ্বারা নিজের তালুক জমীদারী এবং ব্যবসায়ের কাজ চালাইতে পারেন এবং আবশ্যক পরিমাণ ইংরেজী তো তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিখিয়া লইতে পারেন। অবশ্য ডিগ্রী লাভ করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন।

যাহা হউক, আমি তাঁহাদিগকে ইংরেজী পড়িতে নিষেধ করি না। আমি শুধু ইহাই বলিব, ইংরেজীর একেবারে কাছে ঘেষিবেন না, দূরে দূরে থাকিবেন। আরবী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়াও এই পরিমাণ ইংরেজী তাঁহারা শিখিয়া লইতে পারেন। কিন্তু তাঁহারা অধিক ধন-দৌলত এবং মান-মর্যাদার পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন। এই জন্যই তাঁহারা ইংরেজীতে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করিয়া চাকুরীতে প্রবৃত্ত হন। এই লোভের দরুনই এই শ্রেণীর লোক ধর্ম হইতে অধিক বঞ্চিত। অথচ তাঁহাদের উচিত ছিল মাওলানা নেযামীর উক্তির উপর আমল করা। মাওলানা বলেন :

خو شا روزگارے کہ دارد کسے + کہ بازار حرصش نبا شد بسے

بقدر ضرورت یسا رے بود + کند کارے ا ر مر دکارے بود

"মানুষের পক্ষে এতটুকু জীবিকাই উত্তম যেন তাহার লোভ অধিক না হয়। প্রয়োজনের পরিমাণ আর্থিক সচ্ছলতা থাকে এবং কাজের মানুষ হইলে কাজে ব্যস্ত হইয়া পড়ে।"

তাঁহাদের উচিত ছিল আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁহাদিগকে অবকাশ দিয়াছেন, তখন নিশ্চিন্ত মনে ধর্মের খেদমতে রত থাকেন। এই খেদমতে সমস্ত জীবন শেষ করিয়া দেন। তাহা হইলে আপনি দেখিতে পাইতেন আলেমদের মধ্যে কেমন যোগ্য লোক উৎপন্ন হইতেছেন। আমি সত্য বলিতেছি, এল ম চর্চায় মশ্গুল হইয়া তাঁহারা এমন স্বাদ পাইতেন যে, কোন সময় তাঁহাদের তৃপ্তিই হইত না। ইহা তো খোদার রাস্তা। যতই অতিক্রম করা হয় ততই বাড়িয়া যায়। ইহার অন্বেষণ কখনও হ্রাস পায় না। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়ায় যে :

نگویم کہ بر آب قادر نیستند + کہ بر ساحل نیل مستسقی اند

"আমি বলি না যে, তাঁহাদের পানির অভাব। কেননা, নীল নদের তীরে বসিয়া তাঁহারা পানি চাহিতেছেন। অর্থাৎ, এত পানি সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের পিপাসার নিবৃত্তি নাই।"

।। এল্‌মের মূল্য ।।

খোদার কসম! কোন কোন সময় কোন নূতন বিষয়ের জ্ঞান অন্তরে আবির্ভূত হইলে উহার এমন বিচিত্র এক স্বাদ পাওয়া যায় যে, কেহ উহার মোকাবিলায় আমাকে সপ্ত খণ্ড পৃথিবীর রাজত্ব দিতে চাহিলেও আমি তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইব না। এল্‌মের প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিলে একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বের জ্ঞানও এমন মনমাতান হয় যে, উহার সম্মুখে সমস্ত দুনিয়া একটি ধূলিকণার সমতুল্য হয়। যেমন, শায়েরগণ যখন কোন একটি ভাল শে'এর (কবিতা) বলিতে পারেন, তখন তাঁহারা বলিয়া থাকেন, এই কবিতাটি হাজার টাকা মূল্যের, লক্ষ টাকা মূল্যের।

কোন একটি বালক জনৈক কবির নিকট শ্লোক রচনা শিক্ষা করিতেছিল। সে একটি খাতা বানাইয়া রাখিয়াছিল। উহাতে ওস্তাদের শ্লোকগুলি সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছিল। ওস্তাদ কখনও তাহাকে বলিতেন, এই শ্লোক পাঁচ শত টাকার, কখনও বলিতেন, এই শ্লোক হাজার টাকার। সেই বালকটি আনন্দিত হইয়া সবগুলি শ্লোকই লিখিয়া রাখিত। এক দিন তাহার মা বলিল: 'তুই কি করিতেছিস, কিছু উপার্জনও করিতেছিস না, কিছু আয়ও করিতেছিস না।' সে বলিল: "আমার নিকট এখন লক্ষ লক্ষ টাকার কবিতা সঞ্চিত আছে। কোনটি পাঁচ শত টাকা মূল্যের, কোনটি হাজার টাকা মূল্যের।" তাহার মা বলিল: আচ্ছা আজ আমাকে এক পয়সার তরকারী আনিয়া দে তো।" সে বলিল: "বহুত আচ্ছা" সে তরকারী বিক্রেতার কাছে যাইয়া বলিল: "আমাকে এক পয়সার তরকারী দাও"। বিক্রেতা বলিল: পয়সা দাও তখন সে তাহাকে একটি শ্লোক শুনাইয়া দিয়া বলিল: "আমার নিকট পয়সা নাই। তুমি এই কবিতাটি গ্রহণ কর। ইহার মূল্য পাঁচ শত টাকা।" সে বলিল: এই পাঁচ শত টাকার আমার প্রয়োজন নাই। আমাকে তুমি একটি পয়সা আনিয়া দাও, তবে তরকারী পাইবে।"

বালক অতিশয় রাগান্বিত হইয়া ওস্তাদের নিকট গেল এবং তাঁহাকে বলিল, 'আপনার খাতা গ্রহণ করুন, আপনি আমাকে ধোকা দিয়াছেন। এই কবিতাগুলির মূল্য তো এক পয়সাও নহে। অথচ আপনি তখন বলিতেন, এই কবিতা এক হাজার টাকার, ইহা দুই হাজার টাকার। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন: বাপু, তুমি এই কবিতাগুলি কাহার নিকট লইয়া গিয়াছিলে? সে বলিল: আমি এই কবিতাগুলি একজন তরকারী বিক্রেতাকে দিতে চাহিয়াছিলাম, সে এক পয়সার বিনিময়ে ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। ওস্তাদ বলিলেন: তুমি বড় ভুল করিয়াছ। এই রত্ন-সম্ভার বিক্রয় করিবার স্থান সেই বাজার ছিল না যেখানে তুমি উহা লইয়া গিয়াছিলে। ইহা অন্য এক বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। সেইখানে লইয়া গেলে ইহার মূল্য উপলব্ধি হইবে। এইবার তুমি আমার অমুক কবিতা কোন বাদশাহের দরবারে যাইয়া পাঠ কর এবং বলিও এই কবিতা আমি নিজে লিখিয়াছি। তখন তুমি ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে। তদনুযায়ী ছেলেটি বাদশাহের দরবারে যাইয়া সেই কবিতাটি বাদশাহকে শুনাইল, তখন তো সে কয়েক সহস্র টাকা পুরস্কার পাইল এবং অনেক জামা কাপড় প্রভৃতিও পাইল। এখন ছেলেটি বুঝিল, বাস্তবিকই ওস্তাদ সত্য বলিয়াছেন। আমি ভুল করিয়াছিলাম। এই রত্ন-সমূহকে অন্য এক বাজারে লইয়া গিয়াছিলাম। মূল্য না বুঝিলে এল্‌ম সংক্রান্ত সূক্ষ্মতত্ত্বগুলির মূল্য এক পয়সাও নহে। যেমন সেই তরকারী বিক্রেতা বলিয়াছিল। আর যদি মূল্য বুঝে, তবে সেই সূক্ষ্ম এলমী তত্ত্বগুলির মূল্য অনেক বেশী।

দিল্লী শহরে কোন কবির মুখ দিয়া হঠাৎ একটি কবিতার চরণ বাহির হইয়া পড়িল, لختے بردازدل گزرد ہرکہ ز پیشم ইহার দ্বিতীয় অংশ মিলাইতে পারিতেছিল না। অতিশয় অস্থির হইয়া পড়িল, কিন্তু সম্মুখের অংশ মিলিলই না। এক দিন বসিয়া বসিয়া সে এই চিন্তাই করিতেছিল। এমন সময় একজন খরবুজা বিক্রেতা সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, সে কোন কবি দ্বারা একটি কবিতার পদ রচনা করাইয়া লইয়াছিল, কিংবা নিজেই রচনা করিয়া লইয়াছিল এবং ফেরির ডাকের পরিবর্তে সে ঐ পদটি আওড়াইয়া যাইতেছিল। অর্থাৎ, সে বলিতেছিল :

من قاش فروش دل صد پارۂ خویشم

"অর্থাৎ, আমি আমার শতধা বিভক্ত অন্তরের একটি ফালি বিক্রয় করিতেছি।" কবি এই পদটি শ্রবণ করিয়া নাচিয়া উঠিল এবং দৌড়াইয়া সেই তরকারী বিক্রেতার নিকট গেল এবং বলিল : ভাই! তোমার এই পদটি আমাকে দাও এবং যত টাকা তুমি বলিবে তাহাই আমি তোমাকে দিতেছি। কেননা, আমার একটি 'পদ' অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিয়াছে, উহার জোড়া এই পদটিই হইতে পারে। ফলকথা, পাঁচ শত টাকায়-মীমাংসা হইল। এই কবি পাঁচ শত টাকায় একটি 'পদ' ক্রয় করিয়া লইল, এখন তাহার শ্লোক পূর্ণ হইল :

لختے برداز دل گزرد ہرکہ ز پیشم + من قاش فروش دل صد پارۂ خویشم

"আমার অন্তরের একটি টুকরা লইয়া যাহাকিছু আমার সামনে রহিয়াছে, ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। আমি আমার শতধা বিভক্ত হৃদয়ের ফালি বিক্রয় করিতেছি।"

আপনি হয়ত এই পদ ক্রয় করার অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। ইহার অর্থ এই যে, "এই পদটি তুমি আমার রচিত বলিয়া প্রচার করিবে, নিজের বলিবে না।" শুধু এতটুকু কথার জন্য কবি তাহাকে পাঁচ শত টাকা দিয়াছিল। ইহার কারণ কি ছিল? সেই মূল্য-বোধ। কেননা, কবিতার মূল্য কবিই বুঝিতে পারে। অতএব, বন্ধুগণ! 'মূল্য-বোধ' এমন একটি বিষয়, কাহারও মধ্যে ইহা বিদ্যমান থাকিলে একটি সূক্ষ্ম এল্‌মী তত্ত্ব সহস্র টাকার ধন-দৌলতের চেয়ে অধিক হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা আমার মনে পড়িল। দিল্লী শহরে আহ্‌মদ মির্যা নামে একজন ফটোগ্রাফার আছেন। ফটোগ্রাফীতে তিনি অতিশয় অভিজ্ঞ কিন্তু হযরত মাওলানা গঙ্গুহী (রঃ)-এর নিকট বাইআত হওয়ার পর তিনি জীবিত প্রাণীর ছবি আঁকা বন্ধ করিয়া তওবা করিয়া লইয়াছেন। তিনি নিজের এক দিনের ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন : "জনৈক ভদ্রলোক আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনার নিকট মেহ্‌দী আলী খাঁর ফটো আছে কি?" আমি বলিলাম : ভাই! এখন তো আমি ফটো উঠাইব না বলিয়া তওবা করিয়াছি এবং পূর্বেকার সমস্ত ফটো নষ্ট করিয়া দিয়াছি। সে বলিল : 'হয়ত কোন পুরাতন ফটো তালাশ

করিলে পাওয়া যাইতে পারে।" আমি বলিলাম: "তুমি ঐ নষ্ট কাগজগুলি খুঁজিয়া দেখ, পাওয়া যাইতেও পারে।" সে তথায় নষ্ট কাগজগুলির মধ্যে খুঁজিয়া সেই ফটো পাইল। তাহা একেবারে নিখুঁত ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল: 'ইহার মূল্য কত?' আমি বলিলাম: "এখন তো আমার নিকট ইহার কোনই মূল্য নাই।" সে বলিল: 'এই মহাপুরুষের ফটো আমি বিনামূল্যে লইতে পারি না। কেননা, ইহাতে তাঁহার মহত্বের প্রতি অবমাননা করা হইবে। ইনি এমন ব্যক্তি নহেন যাঁহার ফটো বিনামূল্যে লওয়া যাইতে পারে।" আমি বলিলাম: "ইহার মূল্য গ্রহণ করা আমার জন্য জায়েয নহে। কেননা, শরীয়ত অনুযায়ী ইহা মূল্যবান বস্তু নহে।" সে বলিল: "কিন্তু আমি তো ইহা বিনা মূল্যে গ্রহণ করিব না। আমি আপনাকে হাদিয়া স্বরূপ দিতেছি, আপনি ইহাকে মূল্য মনে করিবেন না।" এই বলিয়া সে পকেট হইতে তের টাকা বাহির করিয়া সমস্ত টাকাই আমার হাতে দিয়া বলিল, আফসুস্ আমার নিকট্ আর টাকা নাই। এখন পকেটে মাত্র তেরটি টাকাই ছিল। নচেৎ আমার উদ্দেশ্য ছিল, আপনাকে পঞ্চাশ টাকা দিব। এখন আপনি হাদিয়াস্বরূপ ইহাই কবূল করুন। মোটকথা, যে মালের মূল্য মালিকের নিকট এক পয়সাও নহে, উহার জন্য সে বহু সাধ্যসাধনা করিয়া তের টাকা দিয়া গেল।" মোটকথা, প্রত্যেক বিষয়ের গুণগ্রাহী ব্যক্তি খুব ভাল করিয়াই জানে যে, ইহা কত মূল্যের বস্তু। ইহা তো বলিলাম পার্থিব এল্‌মের কথা। এখন আপনারাই চিন্তা করিয়া দেখুন, যেই এল্‌ম ধর্ম সংক্রান্ত, যাহা আখেরাতের সাথী এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভের উপায় উহার মূল্য কি হইতে পারে?

علم چوں بر دل زنی یارے شود + علم چوں بر تن زنی مارے شود

"এল্‌ম এমন বস্তু উহাকে যখন হৃদয়ে স্থাপন কর, অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়। আর যখন দেহের উপর প্রয়োগ কর—সর্প হয়।"

॥ তালেবে এল্‌ম নির্বাচন ॥

আমি বলিতেছিলাম, এলমে দ্বীন হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক অমনোযোগী উচ্চস্তরের আমীর লোক। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাদিগকে যে অগাধ নেয়ামত দান করিয়াছেন উহার শোকরগুযারী ইহাই ছিল যে, জীবিকার চিন্তা হইতে মুক্ত থাকিয়া এল্‌মে দ্বীন সম্বন্ধে অফুরন্ত জ্ঞান হাছিল করেন এবং নিজেদের সন্তানদিগকে আরবী এল্‌ম শিখান। বন্ধুগণ! যেরূপ মালের যাকাত আছে তদ্রূপ আওলাদের যাকাত রহিয়াছে। অতএব, আপনারা আওলাদেরও যাকাত দিন। কিন্তু আওলাদের বেলায় চল্লিশ ভাগের প্রশ্ন নাই। আপনি হয়ত যাকাত শব্দ শ্রবণ করিয়া মনে মনে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছেন যে, চল্লিশটি সন্তান হইলে, একটি আল্লাহ্‌র

নামে যাকাতস্বরূপ দ্বীনী এল্‌মের খেদমতে লাগাইয়া দিব। না, তাহা নহে, সন্তানের বেলায় দুই জনের মধ্যে একজন যাকাত দিন, তাহাকে আরবী পড়ান। কিন্তু অতিশয় বিনয়ভাবে আরয করিতেছি—আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে একান্ত নির্বোধ সন্তানগুলিকে বাছিয়া আরবী শিক্ষার জন্য মনোনীত করিবেন না। আজকাল বড় লোকেরা প্রথমতঃ নিজেদের সন্তানদিগকে আরবী পড়াইতেই চাহেন না। যদিও বা ইচ্ছা হয়, তবে ছেলেদের মধ্যে যেটি নিতান্ত বোকা তাহাকে আরবী পড়ার জন্য নির্বাচিত করিয়া থাকেন এবং মেধাবী ও জ্ঞানবান ছেলেগুলিকে ইংরেজী পড়িবার জন্য পাঠান হয়। কোন বন্ধু তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া যদি জিজ্ঞাসা করে যে, আপনার ছেলেরা কে কি পড়ে? তবে সর্বপ্রথম ইংরেজী পড়ুয়া ছেলেদের কথা বলিলেন, অমুক ছেলে বি, এ পড়িতেছে, অমুক ছেলে এন্ট্রেন্স ক্লাসে আছে, একটি মডেল পাশ করিবে। সর্বশেষে আরবী পড়ুয়া ছেলেটির নামে বলা হয় এবং বলেন, একটি একটু মোল্লা স্বভাবের, এবং জ্ঞান বুদ্ধিও তেমন নাই। ইহাকে আরবী পড়াইতেছি। সোব্‌হানাল্লাহ্‌! আপনি দ্বীনের খুব কদর করিলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (দঃ)-এর এল্‌মের এই কদর? আল্লাহ্‌র কালামের এই সম্মান? আচ্ছা; আল্লাহ্‌ এবং রাসূলের এল্‌মে বুঝিবার মত ক্ষমতা এসমস্ত নির্বোধ ও বোকাদের হইতে পারে, যাহাদিগকে আপনি তজ্জন্য মনোনীত করিতেছেন?

ইহারই ফলে ওলামাদের মধ্যে সেই গুণ পাওয়া যাইতেছে না যাহা তাহাদের মধ্যে থাকা উচিত ছিল। ইহার পরেও মানুষ বলিতেছে, আজকাল 'গায্‌যালী' ও 'রাযী' পয়দা হইতেছে না। আমি বলি, তোমরা কাহার উপর এই দোষারোপ করিতেছ? এসমস্ত নির্বোধ ছেলেকে "গায্‌যালী" এবং "রাযী" কে বানাইতে পারিবে? তোমরা নিজেদের সন্তানগণের মধ্য হইতে মেধাবী ছেলেদিগকে আরবী পড়াও, দেখিও তাহারা "গায্‌যালী" এবং "রাযী" হয় কি না? খোদার কসম, গায্‌যালী ও রাযী এই যুগেও হইতে পারে। কেন, মাওলানা কাসেম ছাহেব নানুতবী এবং মাওলানা গঙ্গুহী (রঃ) কি গায্‌যালী ও রাযীর চেয়ে কম ছিলেন? আল্লাহ্‌র কসম! কোন কোন বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞানে এই মহা পুরুষদ্বয় তাঁহাদের হইতেও অধিক উন্নত ছিলেন, কিন্তু তোমরা যদি নির্বোধদিগকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য মনোনীত কর, তবে বলা বাহুল্য, তোমাদের অনুসরণীয় ও বরণ্য এসমস্ত নির্বোধেরাই হইবে। তাহাদের মধ্যে জ্ঞান এবং বুদ্ধি আমরা কোথা হইতে পয়দা করিয়া দিব? কবি বলেন:

شمشیر نیک ز آهن بد چون کند کسے + ناکس بتربیت نشود اے حکیم کس

"খারাপ লোহা দ্বারা ভাল তরবারি প্রস্তুত করিবে কেমন করিয়া? হীন প্রকৃতির লোক শিক্ষা প্রদানে কখনও উত্তম স্বভাব প্রাপ্ত হয় না, হে জ্ঞানী।"

॥ দ্বীনী এল্‌মের বরকত ॥

কিন্তু এই বোকা এবং নির্বোধ হওয়াই তো তাহাদের সৌভাগ্য হইয়াছে। তাহারা যদি আহ্‌মক না হইয়া মেধাবী হইত, তবে তাহাদিগকে আপনারা ইংরেজী দিকে ঠেলিয়া দিয়া জাহান্নামের ইন্ধন বানাইয়া দিতেন। এখন তাহারা ধর্মের কাজে লাগিয়া গিয়াছে, খোদাকে সন্তুষ্ট করার পন্থা তাহারা জানিয়া লইয়াছে। ইন্‌শা আল্লাহ্ তাহারা জান্নাতের অধিকারী হইবে এবং কেয়ামতের দিন ইহা তাহাদের বড় কাজে আসিবে। দুনিয়াতেও তাহারা এল্‌মে দ্বীনের বরকতে তোমাদের বরেণ্য হইয়া গেল।

এই বোকামি সৌভাগ্য হওয়া প্রসঙ্গে আরেফ শীরাযীর কিস্‌সা আমার স্মরণ হইল। হযরত শায়খ নাজমুদ্দীন কোবরা এল্‌হাম যোগে হাফেয শীরাযীকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদানের জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং ইহাও বলিয়া দেওয়া হইল, হাফেয (রঃ) অমুক রঈস লোকের পুত্র, অমুক জায়গার অধিবাসী এবং তাঁহার আকৃতি এরূপ এরূপ। হযরত শায়খ বহু মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া শীরায পৌঁছিলেন এবং হাফেয ছাহেবের পিত্রালয়ে অতিথি হইলেন। তিনি হযরত শায়খের খুব সম্মান ও খাতির করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, হযরত কি উদ্দেশ্যে তকলিফ স্বীকার করিয়াছেন ? তিনি বলিলেন : 'আমি তোমার ছেলেদিগকে দেখিতে চাই। তুমি তোমার ছেলেদিগকে আমার সম্মুখে হাযির কর।' তিনি তাঁহার ছেলেদিগকে হাযির করিলেন। তাহারা সংখ্যায় কয়েকজন ছিল। শায়খ নাজমুদ্দিন কোব্‌রা সবগুলি ছেলেকেই নীরিক্ষণ করিয়া দেখিলেন। কিন্তু যাহার তালাশে তিনি এতদুর আসিয়াছেন ইহাদের মধ্যে তাহাকে দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন : 'তোমার আরও কোন ছেলে আছে কি ?' তিনি বলিলেন : "আর কেহ নাই।" তিনি হাফেয (রঃ)কে না থাকার শামিলই মনে করিতেন। হযরত শায়খ বলি-লেন : 'নিশ্চয়ই আছে।' হযরত হাফেয ছাহেবের পিতা বলিলেন : 'হাঁ হুযূর। পাগলা পাগলা আর একটি ছেলে আছে। আমি তাহাকে এজন্যই উপস্থিত করি নাই যে, সে তো পাগল, তাহার থাকা না থাকা সমান।' দেখুন, তিনি হযরত হাফেয ছাহেবকে এমনভাবে না থাকার শামিল মনে করিতেন যে, একবার তো অস্বীকারই করিলেন যে, আমার আর কোন ছেলেই নাই। হযরত শায়খ বলিলেন : "সেই পাগলেরই আমার আবশ্যক। তাহাকে ডাক।" হাফেয ছাহেবের পিতা চাকরকে বলিল : 'যা-ত-রে সে পাগলা ছেলেটাকে খুঁজিয়া নিয়া আয়। কোথাও হয়ত জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তৎক্ষণাৎ চাকর তালাশ করিতে যাইয়া দেখিল, বাস্তবিকই তিনি জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতেছেন। তিনি এমন অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন যে, পায়ের গোছা পর্যন্ত কাদা লাগিয়াছিল। মাথার চুল এলোমেলো ছিল। পোষাকও খুব পুরান এবং ছেঁড়া ফাটা। হযরত হাফেয দরবারে পৌঁছিয়া শায়খ নাজমুদ্দীন কোব্‌রার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই

চিনিয়া লইলেন যে, "ইনি একজন কামেল পীর এবং আমার মুরব্বি" তৎক্ষণাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বয়েতটি আবৃত্তি করিলেন :

آنا نکه خاک را بنظر کیمیا کنند + آیا بود که گوشۂ چشمے بما کنند

"যিনি এক নযরে মাটিকে স্বর্ণে পরিণত করিতে পারেন তিনি চক্ষুকোণ দ্বারা আমার প্রতি একবার দৃষ্টি করিবেন কি ?" হযরত নাজমুদ্দীন কোব্‌রা তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া হাফেয ছাহেবকে বক্ষে টানিয়া লইলেন এবং বলিলেন : بتو نظر کردم بتو نظر کردم "তোমার প্রতি দৃষ্টি করিলাম, তোমার প্রতি দৃষ্টি করিলাম।" অনন্তর যাহাকিছু তাঁহাকে দেওয়ার ছিল সেই সময়েই দিয়া দিলেন এবং চলিয়া গেলেন।

অতএব, বন্ধুগণ ! কোন কোন আহ্‌মক এমনও হইয়া থাকে যে, বড় বড় বুদ্ধিমান অপেক্ষা উত্তম বলিয়া প্রমাণিত হয়। ফলকথা, তাহাদের বোকামিই তাহাদের জন্য সাক্ষাৎ সৌভাগ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তোমরা তাহাদের এই হিত কামনা কর নাই। তোমরা তো তাহাদিগকে নিষ্কর্মা এবং হীন মনে করিয়াই আরবী শিক্ষার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া থাক। অতএব, ভাবিয়া দেখ, ইহা কেমন অবিচারের কথা। তোমাদের উচিত মেধাবী মেধাবী ছেলে বাছিয়া দ্বীনী এল্‌মের জন্য মনোনীত করা। আর আল্লাহ্ তা'আলা যখন তোমাদিগকে ফুরসৎ দিয়াছেন এবং সচ্ছলতা দান করিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে নিশ্চিন্ত মনে আরবী শিক্ষার সর্বাঙ্গীন পূর্ণ পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী শিক্ষা দান কর। আর যদি পূর্ণ শিক্ষা দিতে না পার, তবে আরবীর সংক্ষিপ্ত পাঠ্য তালিকাই তাহাদিগকে পড়াইয়া দাও। কেননা, আবশ্যক পরিমাণে তাহাও যথেষ্ট। যদি ইহাও না হয়, তবে অন্ততঃ উর্দু ভাষায়ই তাহাদিগকে ধর্মীয় মাসায়েলসমূহ শিখাইয়া দাও। আর কিছুকালের জন্য কোন কামেল লোকের ছোহ্‌বতে তাহাদিগকে অবশ্যই রাখিয়া দাও। তাহা হইলে উহারা অন্ততঃ মুসলমান তো হইতে পারিবে।

হয়ত আপনারা বলিতে পারেন, উর্দু ভাষায়ই যখন ধর্মের মাসায়েল জানিয়া লওয়া যাইতে পারে আর এমনি মুখে মুখেও ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে, তবে আরবী এল্‌ম পড়াইবারই কি প্রয়োজন ? একথার উত্তর খুব বুঝিয়া লউন, দ্বীনী তা'লীমকে ব্যাপক করার পরামর্শ দানে কখনই আমার এই উদ্দেশ্য নহে যে, আরবী এল্‌মের প্রয়োজনই নাই। আরবী তা'লীমের প্রয়োজনীয়তা কোন মতেই দুর হইতে পারে না। আমার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকু যে, যদি তোমরা আরবী পড়াইতে না চাও, তবে অন্ততঃপক্ষে উর্দু ভাষায়ই ধর্মের মাসায়েলগুলি শিখাইয়া দাও। কিন্তু উর্দু শিক্ষিত লোক কখনও আরবী শিক্ষা প্রাপ্তের সমান হইতে পারে না।

ইহার কারণ একটি শিশু বলিয়া দিয়াছে। বাস্তবিকই সে চমৎকার বলিয়াছে। এই অল্প বয়সে সে এমন গভীর জ্ঞানের কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। আমারই একজন আত্মীয়। তাহার পিতা তাহাকে শৈশবকাল হইতে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে ফেলিয়া

রাখিয়াছিল। একবার তাহাকে দেখিলাম, সে বড় উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিতেছে। আমি তাহাকে ডাকিলাম ঃ "এদিকে আস, আলাপ করি।" সে আসিলে আমি তাহাকে বলিলাম ঃ বল ত আরবী শিক্ষা ভাল না ইংরেজী শিক্ষা।" সে তৎক্ষণাৎ বলিল, "আরবী"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ "কেন?" বলিল ঃ আল্লাহ্‌র কালাম আরবী ভাষায়। আরবী পড়িলে আল্লাহ্‌র কালাম খুব ভালরূপে বুঝে আসে। তাহার জবাব শুনিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম।

আমি আবার বলিলাম, ইহা তো সত্য কথা। কিন্তু এই শিক্ষা দ্বারা দুনিয়াও পাওয়া যায় না, বড় বড় চাকুরীও পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ইংরেজী পড়িলে বড় বড় পদ লাভ করা যায়। অতএব, আরবী পড়িলে খাওয়া পরা কোথায় হইতে জুটিবে? ইহার উত্তরেও ছেলেটি কেমন গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিল—শ্রবণ করুন। সে বলিল ঃ মানুষ যখন আরবী পড়িতে আরম্ভ করে, তখন হইতে সে আল্লাহ্‌ তা'আলার হইয়া যায়। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বসাধারণ লোকের অন্তরে এই ভাব সৃষ্টি করিয়া দেন যে, ইহার খেদমত কর। কাজেই মানুষ তাহার খেদমত করিতে আরম্ভ করে। এই কারণে তাহার জীবিকার জন্য অস্থির হওয়ার প্রয়োজন হয় না।" আমি বলিলাম ঃ "ইহাও ঠিক। কিন্তু ইহা তো অপমানের কথা, মানুষের দয়ার প্রত্যাশী হইয়া পড়িয়া থাকিতে হয়।" সে বলিল ঃ নিজে প্রার্থনা করিলে বা চাহিয়া লইলে তো অপমান হইবে। মানুষ খোশামোদ করিয়া দান করিলে কিসের অপমান। আমি বলিলাম ঃ 'বাস্তবিক তুমি খুব ভালই বুঝিয়াছ।"

অতঃপর আমি বলিলাম ঃ 'তুমি কেন ইংরেজী পড়িতেছ?' সে বলিল ঃ আমি কি করিব? আব্বা ইহাই পড়াইতেছেন।' আমি তাহার পিতাকে বলিলাম ঃ তুমি অন্যায় ভাবে এই ছেলেটিকে ইংরেজী শিক্ষার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছ। তাহার মনের আকর্ষণ তো আরবী শিক্ষার প্রতি মনে হইতেছে এবং ছেলের সহিত আমার কথোপকথনের ঘটনাটি আমি তাঁহাকে শুনাইলাম। তিনিও তো সেই ছেলেরই পিতা ছিলেন। বলিতে লাগিলেন, আরবী শিক্ষার সহিত তো তাহার নিজেরই সম্পর্ক রহিয়াছে। সুতরাং সে উহা নিজেই শিখিয়া লইতে পারিবে। আর ইংরেজীর সহিত তাহার মনের মিল নাই। কাজেই তাহা আমি পড়াইয়া দিলাম। কেননা তৎপ্রতি আগ্রহের অভাবে সে নিজে উহা শিখিত না। অথচ আজকাল উহারও প্রয়োজন আছে। আমি বলিলাম আজ হয়ত আরবীর প্রতি তাহার মনের আগ্রহ আছে দীর্ঘ দিন ইংরেজী শিক্ষার ফলে এই আগ্রহ নাও থাকিতে পারে। শেষ পর্যন্ত তিনি তাহাকে ইংরেজী শিক্ষার মধ্যে নিয়োজিত রাখিলেন। আজ পর্যন্ত তিনি তাহাকে ইংরেজীই পড়াইতেছেন। কিন্তু আজও সেই ছেলেটির মধ্যে মোল্লা স্বভাবের একটি ধমনী রহিয়াছে। ইহাতে আশা করা যায় ইন্‌শা আল্লাহ্‌ এক দিন সে এদিকেই আকৃষ্ট হইবে।

এতএব, বন্ধুগণ! আরবী পড়ার মধ্যে এই বিষয়টি রহিয়াছে যাহা এই ছেলেটি বলিয়াছে। অর্থাৎ, আরবী ভাষায় জ্ঞানার্জন করা ব্যতীত কোরআন ও হাদীস পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায় না। যদি কেহ বলে যে, আমি তরজমা পড়িয়া সবকিছু বুঝিয়া লইব, তবে স্মরণ রাখিবেন, তরজমার সাহায্যে কালামুল্লাহ্‌র প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নহে।

।। কতিপয় জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ।।

রুচীর নাম এল্‌ম। কোরআন ও হাদীসের রুচী তখনই জন্মিতে পারে যখন উহাদিগকে উহাদের নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ আরবী ভাষায় পড়া হয়। যেমন চাক্ষুষ দেখা যাইতেছে যে, আলেমগণ কোরআন হাদীসের যে স্বাদ পাইয়া থাকেন অনুবাদ পাঠ করিয়া তাহা পাইতে পারে না। ইহা নিয়মের কথা,যে কিতাব যে ভাষায় লিখিত সে ভাষা না জানা পর্যন্ত আপনি উক্ত কিতাবে মজা পাইতে পারেন না। অনুবাদ পাঠ করিলে কোরআনের প্রতি বহু জটিল প্রশ্ন উত্থিত হয়, ভাষায় রুচী না থাকিলে উহার জবাব আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। অনেক প্রকারের প্রশ্ন আরবী ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণে উত্থিত হয়। এই কারণে আরবী ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যাসমূহ শিক্ষা করারও প্রয়োজন রহিয়াছে; বরং কিঞ্চিৎ পরিমাণ তর্ক ও দর্শন শাস্ত্র শিখিবারও প্রয়োজন আছে। কেননা, কতক প্রশ্নের মীমাংসা এসমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারাই হইতে পারে। কোন কোন প্রশ্ন এমনও আছে যে, এসমস্ত শাস্ত্রের জ্ঞান ব্যতীত তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় নাই। ইহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে; কিন্তু নমুনা স্বরূপ আমি অল্প কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনা করিতেছি। বিশেষ করিয়া এগুলি তালেবে এল্‌মদের প্রণিধানযোগ্য।

এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া বলিল: 'আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করিতে চাই। কিন্তু প্রথমে ووجدك ضالا فهدى আয়াতটির তরজমা বলিয়া দিন। তাঁহার উদ্দেশ্য আমি বুঝিতে পারিয়া আয়াতটির তরজমা আমি এইরূপে করিলাম, "আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনাকে অজ্ঞ পাইলেন অতঃপর জ্ঞানী করিয়া দিলেন।" এই তরজমা শ্রবণ করিয়া সে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি তাহাকে বলিলাম: 'এখন জিজ্ঞাসা কর। কি জিজ্ঞাসা করিতে চাও।' সে বলিল: 'আপনার এই তরজমার পরে আর সেই প্রশ্নের অবকাশ থাকে নাই।' আমি বলিলাম: 'তবে কি আপনি ধারণা করিয়াছিলেন, আমি এস্থলে ضالا শব্দের তরজমা "গোমরাহ্‌" অর্থাৎ "পথভ্রষ্ট" বলিব? এবং সেই অর্থও ভুল নহে, কিন্তু ভাষায় অনভিজ্ঞ হওয়ার কারণেই ভুল বুঝাবুঝি হইয়া থাকে। কেননা, উর্দু ভাষায় 'গোমরাহ্‌' শব্দের অর্থ সত্য প্রকাশিত

হওয়া সত্ত্বেও উহাকে কবুল না করা। আর আরবী ভাষায় ضلال এবং ফার্সী ভাষায় گمراهى শব্দদ্বয়ে এই অর্থও আছে এবং উহারা অস্পষ্টতা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ضلال শব্দ পথ-ভ্রষ্ট অর্থেও ব্যবহৃত হয় এবং অজ্ঞ অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

অনুবাদ পাঠকগণের মনে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি এক প্রশ্ন উত্থিত হয় ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদিগকে মুসলমানদের উপর কোন পথ অর্থাৎ, বিজয় দিবেন না।" প্রশ্ন এই জাগে যে, আমরা তো বহুবার দেখিয়াছি যে, কাফেরেরা মুসলমানদের উপর জয়লাভ করিয়াছে। আলেমগণ ইহার নানা প্রকার উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু কোরআনের প্রকৃত রুচী এবং কোরআনের সহিত সম্পর্ক থাকিলে প্রত্যেকেই ইহা অবশ্য বুঝিতে পারিবে যে, আল্লার কালাম পূর্বাপর সম্পর্ক ও যোগ-সূত্রবিহীন নহে। মানুষ যখন কোরআনকে পূর্বাপর এক সূত্রে যুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিবে, তখন প্রত্যেক স্থলেই পূর্ব ও পরের বিষয়বস্তুর প্রতিও লক্ষ্য রাখিবে। এক্ষেত্রেও : لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا -এর পূর্ববর্তী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করার কারণেই মানুষের মনে উপরোক্তরূপ প্রশ্নের উদ্ভব হইতেছে। অত্র আয়াতের এই হুকুমটি আখেরাতের সহিত নির্দিষ্ট। কেননা, ইহার পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : فالله يحكم بينكم يوم القيمة "আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দিবেন। অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে ফয়সালা হইয়া যাইবে যে, কাহারা সত্যের উপর ছিল এবং কাহারা অসত্যের উপরে ছিল। ইহার পরে বলিতেছেন :

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

"এবং আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদিগকে মুসলমানদের উপর কখনই বিজয় দিবেন না।" অর্থাৎ সেই ফয়সালার সময় যাহা আখেরাতে হইবে। এখন আর কোন প্রশ্ন থাকে না।

কোন কোন সময় আরবী ভাষার শব্দগুলির রূপান্তর সম্বন্ধীয় জ্ঞান না থাকার কারণে প্রশ্ন উদ্ভব হইয়া থাকে। যেমন, এক সময়ে খবরের কাগজে এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আমেরিকায় জনৈক ব্যক্তির দুইটি অন্তঃকরণ রহিয়াছে। ইহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করিয়া বলিল যে, ইহা তো কোরআনের উক্তির বিপরীত দেখা যাইতেছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : ما جعل الله لرجل قلبين "অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের মধ্যে দুইটি অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেন নাই।"

ইহার একটি উত্তর তো এই যে, সাংবাদিকদের সংবাদের কি বিশ্বাস ? কেহ উহার পেট ফাঁড়িয়া তো দেখে নাই যে, তাহার ভিতরে কয়টি অন্তঃকরণ আছে।

শুধু ধারণা এবং অনুমান করিয়াই তো বলিয়া দিয়াছে যে, এই লোকটির মধ্যে দুইটি অন্তঃকরণ আছে। অতএব, এখানে এমনও হইতে পারে যে, লোকটির হৃদয় খুব সবল হওয়ার কারণে উহাকে দুইটি হৃদয় বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। এই জবাবটি দেওয়া হইল সন্দেহকারীর সন্দেহের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া। আর সন্দেহকারীর সন্দেহ স্বীকার করিয়া এই জবাব দেওয়া যাইতে পারে যে, কোরআনের এই আয়াতটিতে ما جعل শব্দটি অতীতকাল বাচক। ইহাতে আয়াতের অর্থ এই হয় যে, কোরআন নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত অতীতকালে আল্লাহ্ তা'আলা কোন মানুষের মধ্যে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করেন নাই। ইহাতে কেমন করিয়া অনিবার্য হইয়া গেল যে, তিনি ভবিষ্যতেও কোন ব্যক্তির মধ্যে দুইটি হৃদয় সৃষ্টি করিবেন না? অতএব, যদি এই ঘটনা সঠিকও হইয়া থাকে, তবুও কোরআনের উপর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

আর কোন কোন প্রশ্নের উত্তর ব্যাকরণের নিয়ম দ্বারা দেওয়া যায়। যেমন আমার নিকট এক 'মোল্লাজী' আসিয়া বলিলেন: "ওযূর মধ্যে পা ধোয়া ফরয হওয়ার দলিল কি? কোরআনে তো পা সম্বন্ধে মসহে করার নির্দেশ রহিয়াছে।" আমি বলিলাম: "কোরআনের এই নির্দেশ কোথায় আছে? তিনি বলিলেন: "শাহ্ আবদুল কাদের ছাহেবের তরজমা পড়িলে বুঝা যায়। অতঃপর তিনি সেই তরজমা-ওয়ালা কোরআন শরীফ আমার নিকট আনিয়া এই আয়াতটি দেখাইলেন:

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ❋

তরজমা এই লিখিত ছিল: "ধৌত কর তোমরা নিজেদের মুখমণ্ডলকে এবং হাতকে কনুই পর্যন্ত এবং মুছিয়া ফেল নিজেদের মস্তককে এবং পাকে টাখ্নু পর্যন্ত।"

শাহ্ ছাহেব এখানে উহ্য ক্রিয়াটিকে উল্লেখ করেন নাই এবং مسح শব্দের তরজমা প্রচলিত ভাষা অনুযায়ী করিয়া দিয়াছেন। অন্যথায় কোন কোন তরজমায় উহ্য ক্রিয়াটিকে উল্লেখ করিয়া এরূপ তরজমা করা হইয়াছে "এবং ধৌত কর নিজেদের পাসমূহকে টাখ্নু পর্যন্ত" এবং কোন কোন তরজমায় مسح শব্দের তরজমা 'মসহে' দ্বারাই করা হইয়াছে। অর্থাৎ, "মসহে কর নিজেদের মস্তকসমূহ" এই তরজমায় 'کو' অর্থাৎ, 'কো' শব্দটি উল্লেখ করা হয় নাই। সুতরাং এই তরজমা অনুযায়ী কোন প্রশ্নের উদ্ভব হয় না। কিন্তু শাহ্ ছাহেবের তরজমায় মোল্লাজীর এই সন্দেহ হইয়া ছিল যে, পাগুলিও মসহে করারই নির্দেশ আসিয়াছে।

আমি প্রশ্ন শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িলাম। কেননা, এই প্রশ্নের জবাব ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম জানার উপর নির্ভর করে। এখন যদি আমি তাহাকে ব্যাকরণের নিয়ম

অনুযায়ী উত্তর প্রদান করি. তবে তাহাকে সংযোজক অব্যয় এবং উহ্য ক্রিয়ার তথ্য বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। কিন্তু তাহা তিনি বুঝিতেই পারিবেন না। অবশেষে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম: 'ইহা যেই কালামের তরজমা আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, উহা আল্লাহ্‌র কালাম ?' তিনি বলিলেন : 'আলেমদের মুখে শুনিয়াছি।' আমি বলিলাম : 'আফসুস। হয়ত তুমি আলেমদিগকে এত ঈমানদার মনে করিয়াছ যে, তাঁহারা যে কোন একটি আরবী এবারতকে 'কালামুল্লাহ্‌' বলিয়া দিলে তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস কর কিংবা তাঁহাদিগকে এত বে-ঈমান মনে কর যে, তাঁহারা এখানে একটি ক্রিয়া (فعل) উহ্য আছে বলিলে মিথ্যাবাদী বল।' একথায় লোকটি নীরব হইয়া গেল। আমি বলিলাম : খবরদার তুমি আর কখনও ক্বোরআনের তরজমা পাঠ করিও না। এরূপ জ্ঞানের লোকের পক্ষে ক্বোরআনের তরজমা পড়া জায়েয নহে।

এইরূপ অনেক প্রশ্ন আছে যাহার জবাব আরবী ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যাসমূহের উপর নির্ভরশীল। এই কারণেই আমি বলি, সর্বসাধারণ লোকের পক্ষে নিজে নিজে তরজমা পড়া উচিত নহে ; বরং.আগ্রহ থাকিলে কোন আলেমের নিকট সবকে সবকে পড়িয়া লওয়া উচিত। ফলকথা, এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এখানে ارجلكم শব্দের সংযোগ وجوهكم-এর সঙ্গে। যাহা হউক, ইহা তো তেমন কোন জটিল প্রশ্ন নহে। এস্থলে বড় প্রশ্ন এই যে, কোন কোন মুতাওয়াতের ক্বেরা'তে وَاَرْجُلِكُمْ 'লাম' অক্ষর যেরের সহিত দেখা যায়। এমতাবস্থায় ইহার সংযোগ رُؤُسِكُمْ-এর সহিত বুঝা যায় এবং মস্‌হে করার নির্দেশের অধীন হয়। কাজেই বুঝা যায়, মাথার ন্যায় পাও মস্‌হে করিতে হইবে। অলেমগণ ইহার উত্তর এই দিয়াছেন যে, এখানে اَرْجُلِكُمْ শব্দটি 'যের' বিশিষ্ট' رؤسكم শব্দের নিকটবর্তী এবং প্রতিবেশী বলিয়া উহাতেও 'যের' দেওয়া হইয়াছে। অন্যথায় প্রকৃত পক্ষে উহার সংযোগ فَاغْسِلُوْا ক্রিয়ার অধীনস্থ শব্দের সহিতই বটে। আর যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া হয় যে, ইহার সংযোগ وامسحوا ক্রিয়ার অধীনস্থ رُؤُسِكُمْ শব্দের সহিত। তথাপি পা মস্‌হে করা অবধারিত হয় না। কেননা, প্রচলিত ভাষায় কোন কোন সময় দুই ক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট দুইটি বস্তুকে সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে একই ক্রিয়ার অধীনে বর্ণনা করিয়া দেওয়া হয়। যেমন, দাওয়াত করার সময় বলা হয় আমাদের বাড়ীতে কিছু দানা-পানি আহার করিবেন। অথচ পানি পানীয় বস্তু—খাদ্য বস্তু নহে। মূলকথা এইরূপ ছিল—"কিছু খাদ্য আহার করিবেন এবং পানি পান করিবেন।" কিন্তু সংক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে একটি ক্রিয়াকে লোপ করিয়া উভয় বস্তুকে একই ক্রিয়ার অধীনে উল্লেখ করা হয়। এইরূপে যদি কেহ

জিজ্ঞাসা করে, "দাওয়াতে কি কি খাইলে ?" তখন জবাবে বলা হয়, পোলাও, যর্দা, দুধ, দৈ, গোশ্ত খাইয়াছি। অথচ দুধ পানীয় বস্তু। এরূপ বলা উচিত ছিল, দুধ পান করিয়াছিলাম আর পোলাও, যর্দা, গোশ্ত ও দৈ খাইয়াছিলাম।

এতটুকু কথা যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন বুঝিয়া লউন যে, أَرْجُلَكُمْ শব্দের সংযোগ যদি امْسَحُوْا ক্রিয়ার অধীনস্থ শব্দের সহিতও মানিয়া লওয়া হয়, তথাপি অবধারিত হয় না যে, পাগুলি মসহে করারই নির্দেশ হইয়াছে ; বরং বলা যাইবে যে, رُؤُس (মাথা) এবং أَرْجُل (পা)-এর সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে দুইটি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার সহিত ছিল। সংক্ষেপ করার নিমিত্ত একটি ক্রিয়াকে লোপ করিয়া প্রকাশ্যে উভয় শব্দকে امْسَحُوْا ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়া দেওয়া হইতেছে এবং অর্থ উহাই থাকিবে যে, মাথা মস্হে কর এবং পা ধৌত কর। আরবী ভাষায় ইহার নযীর عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا "আমি উহাকে ঘাস এবং ঠাণ্ডা পানি খাওয়াইয়াছি।" আবার যদি পা সম্বন্ধে মসহে করার নির্দেশই মানিয়া লওয়া হয়, তথাপি কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কেননা, নিয়ম এই যে, দুই প্রকারের কেরাত দুইটি আয়াতের সদৃশ হইয়া থাকে। দুইটি আয়াত যেমন নিজ নিজ হুকুম স্বতন্ত্র ভাবে সাব্যস্ত করিয়া থাকে এবং উভয় হুকুম অনুযায়ীই অমল করা অবশ্য কর্তব্য হয়, তদ্রূপ দুই প্রকারের ক্বেরা'তেরও প্রত্যেক কেরা'ত অনুযায়ী আমল করিতে হয়। সুতরাং যে কেরাতে أَرْجُلِكُمْ শব্দের লাম অক্ষরে যের পড়া হয়, তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, পাগুলি মসহে করার নির্দেশ করা হইয়াছে। তবে পা যে ধুইতে হইবে না তাহা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না। কেননা, যে ক্বেরা'তে أَرْجُلَكُمْ শব্দের 'যবর' পড়া হয়, তাহা পা ধৌত করাকে অবধারিত করিতেছে। অতএব, উভয় প্রকার ক্বেরাতের সমন্বয়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, পায়ের মধ্যে ধৌত করা এবং মসহে করা উভয়বিধ নির্দেশই রহিয়াছে। তাহা এইরূপে পালন করা যায় যে 'লাম' অক্ষরে 'যেরের ক্বেরা'ত মোজা পরিহিত অবস্থার জন্য প্রযোজ্য এবং 'যবরের' কেরা'ত মোজাবিহীন অবস্থায় প্রযোজ্য। অর্থাৎ মোজা পরিহিত থাকিলে পা মসহে করিতে পারে এবং মোজাবিহীন অবস্থায় পা ধুইতে হইবে ; এই ব্যাখ্যাও খুব উত্তম।

কাহারও প্রশ্নকালে আমার মনে আর একটি ব্যাখ্যা উদিত হইয়াছিল, তাহা এই যে, মসহে শব্দের অর্থ 'ঘষা' তাহা ধোয়ার সহিতই হউক কিংবা ধোয়া ব্যতীতই হউক। ধৌত করা তো 'যবরের' ক্বেরা'ত ও হাদীসে-মোতাওয়াতের দ্বারা ফরয। আর 'যেরের ক্বেরাত দ্বারা ঘষার নির্দেশ মুস্তাহাব হইয়াছে।" ইহার কারণ

এই যে, পায়ের চামড়া শক্ত ও খস্খসে হইয়া থাকে। সুতরাং স্বভাবতঃ শুধু পানি ঢালিয়া দেওয়া উহা ধৌত করার জন্য যথেষ্ট নহে। ঘষিলে ফাঁকে ফাঁকে পানি পৌঁছিয়া যায়। এবিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্যই ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ ওযুর পূর্বে পা ভিজাইয়া লওয়া এবং পরে ওযুর শেষে ধুইয়া ফেলা মুস্তাহাব বলিয়াছে। ফলকথা, আপনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আরবী ব্যাকরণ পাঠ করার প্রয়োজন কতটুকু। কেননা, ইহার দ্বারাই অনেক প্রশ্নের সমাধান হইয়া যায়।

দেখুন, একজন প্রকৃতিবাদী তাফ্সীরকারক দাবী করিয়াছিল যে, কোরআন শরীফে 'গোলামী' সম্বন্ধীয় মাস্আলার কোন প্রমাণ নাই ; বরং একটি আয়াত দ্বারা উহা নিষিদ্ধ বলিয়াই প্রমাণিত হয়। আয়াতটি এই :

فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً উহার আগে জেহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে, আল্লাহ্ বলেন : فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ "যখন তোমরা কাফেরদের সম্মুখীন হও, তখন তাহাদের গর্দান মার অর্থাৎ হত্যা কর।" এমন কি যখন তোমরা তাহাদিগকে বহু পরিমাণে হত্যা করিয়া লও, তখন তোমাদের দুই বিষয়ে অধিকার রহিয়াছে—হয়ত কোন বিনিময় গ্রহণ ব্যতীত ছাড়িয়া দাও, ইহা তাহাদের প্রতি এহ্সান, অথবা বিনিময় গ্রহণ করিয়া ছাড়িয়া দাও। সেই নূতন তাফ্সীরকার ইহা হইতে এই দলিল গ্রহণ করিয়াছে যে, এই আয়াতে নির্দিষ্টরূপে দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতে নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ গোলাম বানাইয়া লওয়া জায়েয নহে।

এই বর্ণনা হইতে কোন একজন আলেমের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। অন্য একজন আলেম তাহাকে এই প্রশ্নের উত্তর মান্তেকের সাহায্যে এইরূপে দিয়াছিলেন যে, "প্রথমে আপনি বলুন, এই বাক্যটি কিরূপ বাক্য, হাম্লিয়া ? না শরতিয়াহ্ ? শরতিয়া হইলে মুত্তাসালা ? না মুনফাসালাহ্ ? মুনফাসালা হইলে মানেআতুল জাম্য়ে ? না-মানেয়াতুল খুলু ? বস্, এতটুকু কথাতেই তিনি সমস্ত প্রশ্নকে উলট-পালট করিয়া দিলেন। কেননা, এমতাবস্থায় উত্তরের সারাংশ এই দাঁড়ায় যে, এই বাক্যটি মানেআতুল জাম'য়েও হইতে পারে যাহার উদ্দেশ্য হয় উভয়টিকে একত্রিত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু ইহাও সম্ভব হইতে পারে যে,দুইটির কোনটিই না হউক এবং তৃতীয় কোন অবস্থা হউক। কেননা, 'মানেআতুল জাম্এর হুকুম ইহাই যে, উভয় বস্তুর সমাবেশ জায়েয নাই ; কিন্তু উভয়টি না হওয়া জায়েয। যেমন দূর হইতে কোন একটি পদার্থ দেখিয়া আমরা বলিয়া থাকি। ইহা হয় গাছ অথবা মানুষ। ইহার অর্থ এই হয় যে, পদার্থটি একই সময়ে গাছও হয় এবং মানুষও হয়, ইহা অসম্ভব।

হাঁ, গাছও না হয় এবং মানুষও না হয়; বরং তৃতীয় কোন বস্তু গরু বা ঘোড়া ইত্যাদি হয় তাহা সম্ভব। এইরূপে এই আয়াতটির অর্থও ইহাই হয় যে, বিনিময় ব্যতীত ছাড়িয়া দেওয়া এবং বিনিময় লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া, একই সময়ে এই উভয়ের সমাবেশ সম্ভব নহে। অবশ্য উভয় বস্তু এক সঙ্গে না-ও হইতে পারে। অতএব, ইহাতে গোলামী নিষিদ্ধ কেমন করিয়া হইল? অতএব, দেখুন যে ব্যক্তি মানেআতুল জাম'এ এবং মানেয়াতুল খুলু-এর তত্ত্ব অবগত নহে, সে এই প্রশ্নের সমাধানও করিতে পারিবে না, এই জবাবও বুঝিতে পারিবে না।

এইরূপে আর একটি আয়াতে আর একটি প্রশ্ন উত্থিত হয়। আল্লাহ্ বলেন:

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ -

বাহ্য দৃষ্টিতে এই আয়াতে মানতেকের শাক্‌লে আউয়াল-এর অবস্থা মনে হইতেছে। আয়াতের তরজমা এই, "যদি আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদের মধ্যে কিছু মঙ্গল বা হিত দেখিতে পাইতেন, তবে তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া দিতেন, আর যদি তাহাদিগকে শুনাইতেন, তবে তাহারা প্রশ্ন উত্থাপনপূর্বক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত।" শাক্‌লে আউয়ালের নিয়মানুসারে ইহার 'নতীজা' অর্থাৎ ফল এই দাঁড়ায়: لَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَّتَوَلَّوْا অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মধ্যে ভাল দেখিতেন, তবে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিত।" অথচ এই নতীজা বা ফল সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেননা, যে অবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের মঙ্গল জানিতে পারিতেন তদবস্থায় তো তাহারা সত্য ধর্ম গ্রহণই করিত। এমতাবস্থায় তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা কেমন করিয়া সম্ভব হইত? কেননা, তাহাদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন তো মঙ্গলের সহিত অমঙ্গল। এই দুইটি কখনও একত্রিত হইতে পারে না। অন্যথায় ইহা অনিবার্য হইবে যে, তাহাদের মধ্যে মঙ্গলই নাই। তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ভুল সাব্যস্ত হইয়া যায়, ইহা অসম্ভব।

এই সন্দেহের জবাব এই যে, আলোচ্য আয়াতের মধ্যে শাক্‌লে আউয়াল নহে। কেননা, শাক্‌লে আউয়ালের মধ্যে 'হদ্দে আওসাত্' অর্থাৎ, 'ছুগ্‌রা' বা প্রথম বাক্যের শেষের অংশ এবং 'কুব্‌রা অর্থাৎ দ্বিতীয় বাক্যের প্রথমাংশ একই শব্দ পুনরুক্ত হইয়া থাকে। অথচ এখানে হদ্দে আওসাত পুনরুক্ত নহে। প্রথম لَاَسْمَعَهُمْ-এর উদ্দেশ্য তো এই: لَاَسْمَعَهُمْ فِىْ حَالَةِ عِلْمِ اللّٰهِ الْخَيْرَ فِيْهِمْ অর্থাৎ, তাহাদের মধ্যে মঙ্গল জানার অবস্থায় তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া দিতেন। আর দ্বিতীয় اَسْمَعَهُمْ-এর অর্থ— لَوْ اَسْمَعَهُمْ فِىْ حَالِ عَدَمِ عِلْمِ اللّٰهِ فِيْهِمْ خَيْرًا অর্থাৎ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের

মধো মঙ্গল না জানার অবস্থায় তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইতেন।" আয়াতের সারমর্ম এই হইল যে, যদি তাহাদের মধ্যে মঙ্গলের অস্তিত্ব জানিতে পারিতেন, তবে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া দিতেন এবং তাহারা উহা কবুলও করিয়া লইত। আর এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা জানেন তাহাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নাই এবং সরাসরি ভাবে তাহাদিগকে ধর্মের কথা শুনাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শনই করিবে। এখন উক্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া গেল, ইহাতে আপনারা হয়ত বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 'মান্‌তেক' অর্থাৎ, তর্ক-শাস্ত্রের প্রয়োজন আছে।

এইরূপে দর্শন-শাস্ত্রেরও প্রয়োজন আছে। কেননা, কোরআনে কোন কোন বিষয়বস্তু এমনও উল্লেখ আছে যাহার বাহ্যিক অর্থ যাহা বুঝা যায়, মূলে তাহা উদ্দেশ্য নহে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِهٖ - عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى - يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ -

فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ -

অর্থাৎ, কোন স্থানে বলা হইয়াছে: "তুমি যে দিকে মুখ ফিরাও খোদার রোখ সে দিকেই আছে।" অন্যস্থানে বলিয়াছেন: "খোদার উভয় হস্ত প্রসারিত।" আবার কোনখানে বলিয়াছেন: "খোদা আরশে সোজা হইয়া বসিয়াছেন। আর এক স্থানে বলিয়াছেন: "আসমানসমূহ আল্লাহ্‌র দক্ষিণ হস্তে জড়ান অবস্থায় থাকিবে।" এসমস্ত আয়াত দেখিয়া কোন কোন মূর্খের এরূপ সন্দেহ হইয়াছে যে, আমাদের ন্যায় আল্লাহরও হাত, পা, মুখ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আছে। কিন্তু দর্শন-শাস্ত্রের প্রমাণে জানা যাইবে, আল্লাহ্ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাল এবং স্থান হইতে পবিত্র। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য এসমস্ত বস্তু সাব্যস্ত হওয়া অসম্ভব। তবে আলঙ্কারিক ভাষায় অন্য কোন অর্থে সম্ভব হইতে পারে। ওলামায়ে কেরাম এসমস্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার শানের উপযোগী অর্থ বর্ণনাও করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন ওলামায়ে কেরাম এসমস্ত আয়াতে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা না করিয়া ক্ষান্ত রহিয়াছেন। অতএব, দর্শন-শাস্ত্র দ্বারা জানা যাইবে যে, কোন্ কোন্ এবং কি জাতীয় গুণ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক এবং কোন্ কোন্ বিষয় হইতে তাঁহার পবিত্র থাকা আবশ্যক।

॥ হিতকর বিদ্যা ॥

এই কারণে অন্যান্য এল্‌মেরও প্রয়োজন আছে। সেই এল্‌মগুলি আরবী ভাষায় সঞ্চিত ও সঙ্কলিত রহিয়াছে। কাজেই আরবী ভাষা শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। আরবী ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের এল্‌ম ব্যতীত শরীয়তের এল্‌ম পূর্ণরূপে হাছিল

হইতে পারে না। যদি কেহ এলম হাছিল করিবার অবসর না পায়। অপূর্ণ এলম হইতেও বঞ্চিত থাকা তাহার উচিত নহে।

مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهٗ لَا يُتْرَكُ كُلُّهٗ "অর্থাৎ, সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিলে সম্পূর্ণই ত্যাগ করা উচিত নহে।" কিন্তু সাধারণ লোকেরা এই ভুল করিয়াছে যে, উর্দু ভাষায়ও দ্বীনী এল্ম শিক্ষা করে নাই। আর আলেমগণ এই ভুল করিয়াছেন যে, আরবী এল্ম শিক্ষা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কতিপয় অহিতকর বিদ্যার মধ্যে, মশ্গুল হইয়া পড়িয়াছেন। এই উভয় প্রকার ভুল সম্বন্ধেই এই আয়াতে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ط وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ قف لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ٥

এই আয়াতটিতে একটি সূক্ষ্ম কথা আছে। তাহা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইহাও বলিতেছেন যে, ইহুদীরা জানে—যে ব্যক্তি অনিষ্টকর বিদ্যা শিক্ষা করে, সেই বিদ্যার কারণে, আখেরাতে তাহাদের কোন অংশ নাই। অতঃপর বলেন: لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ 'আহা! যদি তাহারা জ্ঞানী হইত!' ইহার উপর প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, তাহারা যখন পূর্ব হইতে জানিত, তখন "আহা! তাহারা যদি জ্ঞানী হইত!" কথার অর্থ কি? ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম রহস্য এই যে, একথা দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা জানাইয়া দিতেছেন যে, যেই এল্ম অনুযায়ী আমল না করা হয় উহা অজ্ঞতার শামিল। সুতরাং ইহুদীদের সেই জানা, না জানার সমান হইয়াছে। এখন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলিতেছেন: কি ভাল হইত যদি এখনও জ্ঞান হইত। অর্থাৎ, এল্ম অনুযায়ী আমল করিত।

এখান হইতে আমি আর একটি ভুল সম্বন্ধে আপনাদিগকে সচেতন করিয়া দিতেছি। তাহা এই যে, এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, তাহাই হিতকর বিদ্যা যাহা আখেরাতের কাজে আসিবে। সকল এল্ম উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আজকাল কেহ কেহ এল্মের ফযীলত সম্বন্ধে কোরআনের আয়াত ও হাদীস লিখিয়া একথার উপর জোর দিয়া থাকেন যে, শরীয়তে এল্ম হাছিল করার জন্য যথেষ্ট তাকীদ করা হইয়াছে। অতঃপর এসমস্ত ফযীলতকেই ইংরেজী তা'লীম সম্বন্ধে খাটাইয়া দেন। এসমস্ত ভূমিকা বর্ণনা করার পর তাঁহারা অবশেষে ইংরেজী পড়ার আবশ্যকতা প্রমাণ করিয়া থাকেন এবং উৎসাহিত করেন। ইহার ফল এই দাঁড়ায়, যেন ইংরেজী পড়িলেই এসমস্ত ফযীলত লাভ করা যাইবে।

অতএব, বুঝিয়া নিন যে, ইহারা শক্ত ধোকা দিতেছে। শরীয়তে এলমের যত ফযীলতের কথা উল্লেখ আছে, তাহাতে সেই এল্মই উদ্দেশ্য যাহা আখেরাতের

কাজে লাগিবে। অর্থাৎ,এল্‌মে শরীয়ত। ইসলামী বিধানসমূহের এল্‌ম দ্বারা ইংরেজী শিক্ষা কখনও উদ্দেশ্য নহে,অবশ্য যদি ইংরেজী ভাষায় ধর্মীয় মাসআলাসমূহের অনুবাদ হইয়া যায়,তখন ইংরেজী কিতাবগুলি পাঠ করা উর্দু ভাষায় অনূদিত ধর্মীয় কিতাব-সমূহ পাঠ করার মতই হইবে। কিন্তু শর্ত এই যে,অনুবাদক যেন শুধু ইংরেজী শিক্ষিত না হন, বরং শরীয়ত সম্বন্ধে এলমেও তাঁহার অগাধ জ্ঞান থাকা আবশ্যক, কিংবা কোন ইংরেজী জানা বিচক্ষণ আলেম উহার সংশোধন ও সমর্থন করিয়া থাকেন। তেমন হইলে চলিবে না, যেমন জনৈক লেখক ইংরেজী ভাষায় 'শরএ মোহাম্মদী' নামে একটি কিতাব লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি এই মাসআলাটিও লিখিয়াছেন যে, বিস্ময় বিমুগ্ধ অবস্থায় তালাক দিলে তাহা বর্তিবে না। ইহা আমি এইরূপে জানিতে পারিয়াছি যে, কোন স্থানে একটি তালাকের ঘটনা ঘটিলে তালাকদাতার কতিপয় হিতাকাঙ্ক্ষী চিন্তা করিতে লাগিল, কোনরূপে কোন সম্ভাবনা আবিষ্কার করিয়া খাপ-খাওয়াইয়া দেওয়া যায় কি না। ফলে অনেক কিতাব দেখা হইল। তন্মধ্যে সেই শরএ মোহাম্মদী' নামক কিতাবটিও বাহির করা হইল। 'তাহাতে লিখিত ছিল, বিস্ময় বিমুগ্ধ অবস্থায় তালাক দিলে তাহা বর্তে না।" তাহাতে এই বিশেষ অবস্থাটিও লিখিত ছিল যে, কাহারও স্ত্রী যদি অভ্যাসের বিপরীত হঠাৎ এক দিন খুব সাজ-সজ্জা করিল, স্বামী ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সে যদি সেই বিস্ময়ের অবস্থায় বলিয়া ফেলে, "তোমাকে তিন তালাক।" এখন এমতাবস্থায় সেই ইংরেজী মুফ্‌তী বলেন : "তালাক হইবে না" কেননা, বিস্ময়ের অবস্থায় তালাক দেওয়া হইয়াছে। لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

আমার নিকট এই কিতাবটি আনয়ন করা হইলে আমি বলিলাম : 'এই মাসআলাটি সম্পূর্ণ ভুল, ইহার কোনই ভিত্তি নাই।' আসল মাসআলা এই যে, 'মাদহূশ' ব্যক্তির তালাক হয় না। 'মাদ্‌হূশ' আরবী শব্দ। ইহার অর্থ 'জ্ঞানহারা' অর্থাৎ গোস্বা প্রভৃতি কারণে যদি কোন ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান লোপ পায় এবং তাহা হইতে পাগলের ন্যায় কার্য-কলাপ প্রকাশ পাইতে থাকে। যেমন, দেওয়ালে মাথা কুটিতে আরম্ভ করে, নিজের হাত দংশন করিতে থাকে। মোটকথা, এমন চঞ্চল হইয়া পড়ে যে, জ্ঞান লোপ পায়, এরূপ ব্যক্তির তালাক বর্তে না।

সেই লেখক সাহেব আরবী শব্দ দেখিয়া উর্দু বাক্‌পদ্ধতি অনুযায়ী উহার তরজমা করিয়া দিয়াছেন : 'মাদ্‌হূশ' বিস্মিত অবাক লোককেও বলা হয়। অতএব, তিনি মাদ্‌হূশ-এর অনুবাদ করিয়া থাকিবেন 'মুতাহাইয়্যের, অর্থাৎ, অস্থির। আবার মুতাহাইয়েরের অনুবাদ করিয়াছেন, মুতাআ'জ্জেব' অর্থাৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধ, কিংবা হয়ত তিনি মাদ্‌হূশ শব্দের অনুবাদে কোন ইংরেজী শব্দ অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। আবার যখন উহার উর্দু তরজমা হইল, তখন এক হইতে আর হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, বাঁকা ক্ষীর হইয়া পড়িয়াছে।

বাঁকা ক্ষীরের গল্প হয়ত আপনারা শুনেন নাই। এক ছাত্র তাহার অন্ধ ওস্তাদজীকে বলিল : আজ আমাদের বাড়ীতে আপনার দাওয়াত। তিনি বলিলেন : 'কি খাওয়াইবে ?' সে বলিল : "ক্ষীর।" ওস্তাদজী বলিলেন : "ক্ষীর কেমন বস্তু ?" বালকটি বলিল : 'চাউলের সঙ্গে চিনি দিয়া পাক করা হয়। হাফেযজী জিজ্ঞাসা করিলেন : উহার রং কিরূপ ? সে বলিল : "সাদা।" অন্ধ মিঞাজী সাদা কাল কোথায় দেখিবেন ? তিনি বলিলেন : "সাদা কিরূপ।" বালক বলিল : "বকের মত।" তিনি তো বকও দেখেন নাই, কাজেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন : "বক কিরূপ।" বালক তাহাকে বক কিরূপে দেখাইবে, নিজের হাত বকের ঘাড়ের মত বাঁকা করিয়া উহার উপর ওস্তাদজীর হাত ঘুরাইয়া দিয়া বলিল : "বক্ এইরূপ হয়।" তিনি বুঝিলেন, ক্ষীর এইরূপ বাঁকাই হয়। অতএব, বলিলেন : 'ইহা তো বড়ই বাঁকা ক্ষীর' গলা দিয়া ঢুকিবে না।'

অতএব, দেখুন, কোথাকার কথা কোথায় গিয়া পৌঁছিল। এইরূপে মাদহূশ এর মাস্আলা অনুবাদ হইতে হইতে এই পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, বিস্ময়ের অবস্থায় তালাক হয় না।. তদুপরি আরও মজার কথা এই যে, উক্ত কিতাব আইন-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। তদনুযায়ী বিচার মীমাংসা হইয়া থাকিবে। জানি না, কতজনকে এই মাস্আলা অনুযায়ী তালাক হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। বস্, এমন অনুবাদকের লিখিত শরীয়তের আইন-পুস্তক দেশের আইনের মধ্যে স্থান পাইয়াছে যাহার সহিত শরীয়তের কোনই সম্পর্ক নাই। অতএব, এখন দুনিয়ার অবস্থা এইরূপ হইতেছে :

گربه میر و سگ وزیر و موش را دیوان کنند + این چنین ارکان دولت ملک را ویران کنند

"বিড়ালকে দলপতি, কুকুরকে মন্ত্রী এবং ইঁদুরকে প্রধান কর্মচারী করা হইতেছে। রাষ্ট্রের পরিচালকবৃন্দ এই শ্রেণীর হইলে দেশকে ধ্বংস করিয়া দেয়।"

إِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ + سَيَهْدِيهِمْ طَرِيقَ الْهَالِكِينَا

"কাক যদি কোন সম্প্রদায়ের পথপ্রদর্শন হয়, শীঘ্রই সে তাহাদিগকে ধ্বংসের পথ দেখাইবে।"

॥ কাজের কথা ॥

বন্ধুগণ! এসম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের নিকট দরখাস্ত করার বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে যেন অতি সত্বর উক্ত আইন-গ্রন্থের এই ভুল সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। এই মাস্আলাটি সম্পূর্ণ ভুল। এইরূপে যতগুলি অনূদিত আইন-গ্রন্থ দেশের আইনে স্থান পাইয়াছে, উহার সবগুলিকেই যেন কয়েকজন বিচক্ষণ আলেম দ্বারা সমর্থন করাইয়া লওয়া হয়। শুধু একজন লোকের অনুবাদেই তদনুযায়ী যেন ফয়সালা না করা হয়। দেখুন ইহা করণীয় কাজ, কিন্তু আজ কালকার মুসলমান এমন কাজের প্রতি গুরুত্ব দেয় না যাহা ধর্মের দৃষ্টিতে আশু প্রয়োজন। কেননা, এই ভুল মাস্আলার

কারণে মুসলমান সমাজে কত কুকর্ম ও পাপাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা কে জানে? ইহা এমন একটি কথা, যদি মুসলমান গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহার সংশোধনের জন্য আবেদন করে, তবে গভর্ণমেণ্ট অতি সত্বর ইহার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবে। কিন্তু আজকাল মানুষের অবস্থা এইরূপ হইয়াছে যে, যে কাজ হইতে পারে, যাহার চেষ্টা তাহাদের হাতেই, যাহাতে কৃতকার্যতার পূর্ণ আশা রহিয়াছে, সে কাজ করে না। পক্ষান্তরে যে কাজ তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে, যাহা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, এমন কাজের পাছে লাগিয়া যায়। চোখের সামনে তাহা দেখা যাইতেছে। আমি বলি:

آرزو می خواه لیک بر اندازه خواه + بر نه تابد کوه را یک برگ کاه

"আশা কর, কিন্তু পরিমাণ মত কর। ঘাসের একটি পাতা পর্বতকে জড়াইতে পারে না।"

এই রুচিও দ্বীন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার কারণেই জন্মিয়াছে। মানুষ যদি ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিত তবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতিই অধিক গুরুত্ব প্রদান করিত। ফলকথা, প্রত্যেক কাজেই দ্বীনী এল্‌মের প্রয়োজন। দ্বীনী এল্‌ম ভিন্ন ইহাও জানা যায় না যে, প্রয়োজনীয় কোন্ বস্তু এবং অপ্রয়োজনীয় কোন্ বস্তু। অতএব, শরীয়তবিশারদ লোক যদি ইংরেজী ভাষায় ধর্মীয় মাসায়েল লিখিয়া দেন, তবে সেই ইংরেজী কিতাব পাঠ করিলেও সওয়াব পাওয়া যাইবে। কিন্তু সাধারণ লোক যদি কোন ইংরেজী পুস্তক লেখে, তাহা ধর্ম সম্বন্ধীয় হইলেও নির্ভরযোগ্য নহে। আর যাহাতে ধর্মের কোন কথা নাই, তাহা তো নিছক দুনিয়া, তাহা শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে এল্‌মের ফযীলত সম্বন্ধীয় আয়াত ও হাদীসগুলি ব্যবহার করা নির্ভেট মূর্খতা।

এখন আমি আমার বর্ণনা শেষ করিতে চাই। দীর্ঘ সময় অতীত হইয়াছে। যোহরের নামাযেরও সময় হইয়াছে। অতএব, আমি ওয়াযের সারাংশ বর্ণনা করিয়া ওয়ায শেষ করিতেছি।

সারকথা এই হইল যে, এল্‌মে দ্বীনের তা'লীমকে ব্যাপক করিতে হইবে। ইহাকে শুধু আরবীর সহিত সীমাবদ্ধ করা উচিত নহে। এই প্রসঙ্গে আমি প্রত্যেক স্তরের তা'লীমের পন্থাও বলিয়া দিয়াছি। কিন্তু ইহার সঙ্গে আরবী শিক্ষাকে অনর্থক মনে করিবেন না। যাহারা জীবিকা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও অবসর আছেন, তাঁহাদের পক্ষে আরবী পড়া এবং সন্তানদিগকে পড়ান সর্বাপেক্ষা অধিক কর্তব্য। কিন্তু মুআল্লেমদিগকেও আমি বলিয়া দিতেছি যে, তাঁহারা যেন নিজেদের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করিয়া লন। তালেবে-এলমদের যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয় বর্ণনা করেন। মীযানুস্ ছারফ্ নামক প্রাথমিক ব্যাকরণের শিক্ষা দানকালে 'শরহে মোল্লাজামী' নামক উচ্চ শ্রেণীর ব্যাকরণ না পড়ান। আমি একজন মুদাররেস্‌কে দেখিয়াছি, সেই আল্লাহুর বান্দা 'মীযান' পড়াইবার সময় বর্ণনা করিতেছেন: الحمد। শব্দের ؍ لا الف। টি ق। ستغر। অর্থাৎ

সকল সংখ্যাকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য। الف لام। চারি প্রকার, জেন্সী আহ্দে খারেজী, আহ্দে যেহ্নী এবং এস্তেগ্রাকী। বলুন ত, এসমস্ত বিষয় কি 'মীযান' পড়াইবার সময় বর্ণনা করার বিষয়? সেই মুদাররেস ছাহেব বলিয়া যাইতেছেন, আর তালেবে এল্ম তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। আমি বলিলাম: এই বেচারার নিকট তো الف لام। শুধু এস্তেগ্রাকের জন্যই হইতেছে। আর কিছুর জন্য হয় না, এস্তেগ্রাক অর্থ ডুবিয়া যাওয়া, আপনার এই الف لام।-এর বর্ণনা তো তাহাকে ডুবাইয়াই দিয়াছে।

এইরূপে মুদাররেসগণের উচিত প্রত্যেক তালেবে এল্ম্কে আরবী শিক্ষার পূর্ণ কোর্স পড়ান আবশ্যকীয় মনে না করা, যাহার মধ্যে আরবী শিক্ষার সহিত মনের আকর্ষণ দেখিতে পান এবং যাহার বোধশক্তি ভাল পান তাহাকে পাঠ্য তালিকার সমস্ত কিতাবই পড়াইয়া দিন। আর যাহার মধ্যে দেখিতে পান যে, বোধশক্তিও ভাল নহে, আরবী শিক্ষার প্রতি মনের এত আকর্ষণও নাই, তাহাকে আবশ্যক পরিমাণ ধর্মীয় মাসায়েল পড়াইয়া বলিয়া দিবেন, যাও, দুনিয়ার কাজ-কর্মে লাগিয়া যাও। ব্যবসায় এবং শিল্পের কাজ কর। কেননা, প্রত্যেক ব্যক্তি নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয় না। কেহ কেহ অনুপযুক্তও হয়। এরূপ নির্বোধকে শিক্ষা সমাপ্তির সার্টিফিকেট দিয়া নেতা বানাইয়া দেওয়া খেয়ানত ব্যতীত কিছুই নহে।

بد گہر را علم و فن آموختن + دادن تیغ ست دست رہزن

"অযোগ্য লোককে এল্ম এবং কৌশল শিক্ষা দেওয়া আর ডাকাতের হাতে তলওয়ার দেওয়া সমান কথা।"

কিন্তু আজ-কাল মুদাররেসগণ এবিষয়ে মোটেই খেয়াল করেন না। যত ছাত্র তাঁহাদের মাদ্রাসায় ভর্তি হয়, তাহাদের সকলেরই কি এল্মের প্রতি মনে পূর্ণ মিল বা আকর্ষণ আছে? সকলের বোধ শক্তিই কি সুষ্ঠু? কখনই নহে, তবে তাঁহারা তালেবে এল্ম্ বাছিয়া লন না কেন? এরূপ কম বোধশক্তির লোকের জন্য এক সীমা নির্ধারণ করিয়া লওয়া কর্তব্য। ইহার চেয়ে অধিক তাহাদিগকে যেন পড়ান না হয় এবং উক্ত সীমা এই পর্যন্ত হওয়া উচিত যাহা ধর্মের প্রয়োজনীয় মাস্আলাগুলি জানার জন্য যথেষ্ট হয়। আর সর্বসাধারণ লোকের জন্য উর্দু ভাষায় পাঠ্য তালিকা নির্ধারিত করা উচিত।

আল্হামদুলিল্লাহ্ এখন এল্ম সম্বন্ধে প্রয়োজন অনুযায়ী যথেষ্ট বর্ণনা হইয়াছে। এখন দ্বীনী এল্ম অর্জন না করার পক্ষে আর ওযর চলিবে না। এখনও যদি কেহ দ্বীনী এল্ম শিক্ষা না করে, তবে সে উহার কোনই যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শাইতে পারিবে না। এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ পাক আমাদেরে আমলের তাওফীক দান করেন:

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّمَ

এল্‌মের ব্যাপকতা

০

এল্‌মের আধিক্য এবং এল্‌মের বিভাগ সম্বন্ধে, সাহারানপুর মুযাহেরুল ওলুম মাদ্রাসায় ১৩৪০ হিজরী, ৭ই মুহার্‌রাম, জুমার রাত্রে ২ ঘন্টা ৩০ মিনিট কাল দণ্ডায়মান অবস্থায় এই ওয়ায করিয়াছিলেন। প্রায় ২০০ লোক উপস্থিত ছিল। মাওলানা যাফর আহ্‌মদ ওস্‌মানী ছাহেব তাহা লিপিবদ্ধ করেন।

০

আজকাল লোকে জানা বিষয়ের আধিক্যকেই এল্‌ম মনে করিয়া রাখিয়াছে। অথচ এল্‌ম এক জিনিস আর জানা বিষয়গুলি অন্য জিনিস। আমাদের জানা বিষয় অনেক ; কিন্তু অন্তরের জ্ঞানশক্তি অধিক নহে। এল্‌ম দ্বারা জ্ঞান-শক্তি হাছিল হইয়া থাকে এবং যে সুষ্ঠু ও সবল জ্ঞানশক্তির সাহায্যে সঠিক সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি পৌঁছিতে পারা যায়, তাহাকেই "এল্‌ম" বলে।

০

خطبة ماثورة

بسم الله الرحمن الرحيم ط الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نؤمن به و نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه بارك وسلم *

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

الٓمّٓ ۚ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ صلے فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ط اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ق وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

।। প্রয়োজনীয় বিষয়ের এল্ম ।।

আমি এখন এই আয়াতগুলির সাহায্যে একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। ইহার সম্পর্ক নির্দিষ্টরূপে আলেমদের সহিত রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া তালেবে এল্মগণ ইহার অধিক মুখাপেক্ষী। আজিকার দাওয়াত-কারী যেহেতু তালেবে এল্মগণই ; সুতরাং তাঁহাদের রুচী অনুযায়ী বিষয় অবলম্বনে বর্ণনা করা আবশ্যক। যদিও এক হিসাবে বিষয়টি ব্যাপকও বটে কিন্তু সমস্ত মুসলমানেরই প্রয়োজনীয়ও বটে। কেননা, মুসলমান হিসাবে প্রত্যেক সময় প্রত্যেক মুসলমানই তালেবে এল্ম। কারণ এল্ম তলব করার একটি স্তর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। তাহা প্রয়োজনীয় বিষয়ের এল্ম অর্থাৎ আবশ্যক পরিমাণ আকায়েদের এল্ম এবং নামায রোযার মাস্আলা ও ক্রয়-বিক্রয় এবং সামাজিক জীবনযাপন সম্বন্ধীয় মাস্আলার এল্ম হাছিল করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। (হাদীসে আছে : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। —লেখক) আর ধর্ম ও ধর্মীয় বিদ্যার সঙ্গে সমন্বয় সাধন, ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন এবং বোধশক্তি বৃদ্ধি করারও প্রয়োজন আছে। ইহারই নাম তালেবে এল্মী :

(اَلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا)

অর্থাৎ, হাদীসে আছে : এল্ম মু'মেন লোকের হারাধন, যেখানেই উহাকে পাওয়া যায়, মুসলমানই উহা লাভ করার অধিক হক্দার। —লেখক)

অতএব, এই বিষয়টি যেমন তালেবে এলেমদের প্রয়োজনীয় তদ্রূপ সমস্ত মুসলমানেরও প্রয়োজনীয়। কেননা, এইমাত্র বলিয়াছি যে, প্রত্যেক মুসলমানই তালেবে এল্ম। কিন্তু এই বিশেষণটি "কুল্লি মুশাক্কেক"-এর ন্যায় কতক মুসলমানের মধ্যে অধিক এবং কতক মুসলমানের মধ্যে কম রহিয়াছে। যাহারা যাবতীয় কার্য ত্যাগপূর্বক এল্ম তলব করার মধ্যেই মশ্গুল রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে এই বিশেষণটি সর্বক্ষণ পাওয়া যায় বলিয়া সর্বসাধারণ তাহাদিগকে তালেবে এল্ম বলিয়া থাকে। তালেবে এল্ম বলিতে মন তাহাদের দিকেই ধাবিত হয়। কিন্তু সাধারণতঃ তালেবে এল্ম নাম হইতে কোন মুসলমানই শূন্য নহে। কাজেই এই পর্যায়ে আজকার এই বিষয়টি একক মুসলমানেরই উপযোগী। আমি এতটুকু কথা এইজন্য বলিলাম যে, যাহারা তালেবে এল্ম নামে সমাজে পরিচিত নহেন, তাঁহারা যেন মনে করিতে না পারেন যে, এই বিষয়টি আমাদের দরকারী নহে। কেননা, এরূপ মনে করার মধ্যে দুই প্রকারের ফল ফলিত। যাঁহারা তালেবে এল্ম হইতেন তাঁহারা

আমার ওয়ায শুনিয়া আফসুস করিতেন আর যাঁহারা তালেবে এল্‌ম না হইতেন তাঁহারা স্বাধীন হইয়া মনে করিতেন আমাদের নিশ্চিন্ত হইয়া বসা উচিত। আজিকার ওয়াযের লক্ষস্থলই আমরা নই। বিভিন্ন প্রকারের স্বভাবের উপর এরূপ ধারণার বিভিন্ন ফল ফলিত। কাজেই আমি বলিয়া দিলাম যে, মূলতঃ এই বিষয়টি সকলেরই প্রয়োজনীয়। তবে তালেবে এল্‌মদের সহিত ইহার সম্পর্ক অধিক। সেই জন্যই এদিকে তাহাদের দৃষ্টি ও মনোযোগ অধিক হওয়া আবশ্যক।

কারণ, প্রথমতঃ 'তালেবে এল্‌ম' বিশেষণটি তাহাদের মধ্যে অন্যান্য মুসলমান অপেক্ষা অধিক রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা ভবিষ্যতে জনসাধারণের অনুসরণীয় হইবে; সুতরাং তাহাদের নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের অধিক অবহিত হওয়া আবশ্যক। খোদা না করুন, তাহাদের মধ্যে কর্তব্য জ্ঞানের ত্রুটি হইলে তাহাতে অন্যান্য লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কেননা, তাহারাই হইবে ধর্মীয় বিধানের প্রচারক। অতএব, সাধারণ লোক তাহাদের মধ্যে কোন কার্যের ত্রুটি দেখিলে মনে করিবে, প্রচারকের মধ্যেই যখন ধর্মীয় বিধান মানিয়া চলার গুরুত্ব নাই, তখন বোধ হয় এসমস্ত বিধান মান্য করা তত জরুরী নহে। কেহ কেহ আবার সত্য সত্যই এরূপ বিশ্বাস করিয়া বসে। তাহারা শরীয়ত বিধান হইতে অব্যাহিত পাওয়ার জন্য টাল বাহানা করে। আর যাহারা বাহানা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা যেহেতু অবগত আছে যে, শরীয়তের বিধান সকল মুসলমানদের জন্যই ব্যাপক, কাজেই আলেমদের শৈথিল্য দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাসের দিক দিয়া যদিও কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু বিধান অমান্য করার দোষারোপ হইতে রক্ষা পাওয়ার তাহারা সুযোগ পায়। যদি কেহ তাহাদিগকে নেক কাজের আদেশ করে, তবে তাহারা সাহসিকতার সহিত উত্তর দেয় যে, মিঞা! একাজে তো মৌলবীরাও ত্রুটি করিতেছে, আমরা তো পূর্ব হইতেই দুনিয়াদার। অতঃপর তাহারা পূর্ব হইতে আরও অধিক ত্রুটি করিতে আরম্ভ করে। ইহার কারণ হইল এসমস্ত আলেম এবং ধর্ম প্রচারক। সুতরাং আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয়ের সহিত তালেবে এল্‌মদের সম্পর্ক অধিক। এদিকে তাঁহাদের অধিক মনোযোগ প্রদান করা কর্তব্য। মোটকথা, এই বিষয়ের সহিত তালেবে এল্‌মদের সম্পর্ক প্রথম পর্যায়ের এবং অধিক। আর অন্যান্য মুসলমানের সহিত দ্বিতীয় পর্যায়ের এবং পরবর্তী স্তরের। এখন বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করিয়া দেই, পরে ইহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিব।

।। এল্‌মের আধিক্য ।।

আমার বক্তব্য সেই বিষয়টি এই যে, এল্‌মের আধিক্য ও উন্নতি কাম্য। অর্থাৎ, এল্‌ম তো কাম্য বটেই; যেমন বহু আয়াত ও হাদীসে তাহা সবিস্তার উল্লেখ

রহিয়াছে, সমস্ত আলেমই তাহা জানেন। এখন আমি তাহা বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করি না। আমি শুধু এতটুকু বলিয়া দিতে চাই যে, এল্‌ম শিক্ষা করা যেমন কাম্য তদ্রূপ উহার উন্নতি এবং আধিক্যও কাম্য। কেহ কেহ মনে করিয়া থাকিবেন, উহা বর্ণনা করারই বা কি প্রয়োজন? আমরা পূর্ব হইতে নিজেরাই তদ্রূপ আমল করিতেছি। কেননা, কিতাবের পর কিতাব পড়িয়া যাইতেছি। প্রত্যেক বিষয়ে একটি দুইটি নহে বহু সংখ্যক কিতাব পড়িতেছি। অতএব, এল্‌ম বৃদ্ধি করার জন্য আমরা নিজেরাই আমল করিতেছি। ইহাকে কাম্যও মনে করিতেছি। কাম্য মনে না করিলে আমল কেন করিতেছি?

একথার প্রকৃত জবাব এই যে, এল্‌মের আধিক্য দুই প্রকার। (১) এল্‌মের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি। (২) এল্‌মের মূল তথ্য সম্বন্ধীয় উন্নতি। আপনারা এল্‌মের উন্নতির জন্য যে আমল করিতেছেন তাহা এল্‌মের বাহ্যিক অবস্থার উন্নতি। উহাকে এল্‌মের হাকীকতের উন্নতি বলা যায় না। কেননা, বহু সংখ্যক কিতাব পাঠ করিলে হাকীকতে এল্‌মের উন্নতি হয় না; বরং উহার জন্য অন্যবিধ উপকরণ রহিয়াছে যাহা একটু পরে আপনারা জানিতে পারিবেন। উহার প্রতি আপনারা অমনোযোগী রহিয়াছেন, কাজেই আপনাদের এই প্রশ্ন লক্ষণীয়ই নহে, কিন্তু আমি অনুগ্রহ স্বরূপ প্রশ্নটিকে সঙ্গত বিবেচনা করিয়া উত্তর দিতেছি যে, যে বস্তুকে আপনারা এল্‌মের উন্নতি এবং আধিক্য মনে করিতেছেন, উহা উন্নতিই নহে। কেননা, আপনারা এল্‌মের উন্নতিকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ উহার আধিক্য ও উন্নতির কোন সীমা নাই; বরং উহা একটি সীমাহীন ও অফুরন্ত বিষয়। বর্তমান অবস্থায় অসীম নহে যাহা অসম্ভব; বরং এই অসীমের অর্থ এই যে, কোন সীমায় যাইয়া থামে না; বরং চলিতেই থাকে।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, কিতাবসমূহ পড়াতে বা পড়ানোতে আপনারা কোন্ উন্নতি কামনা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, পাঠ্যতালিকার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছাই আপনাদের উদ্দেশ্য। উহার পরে আপনাদের অনেকে শুধু নিশ্চিন্তই হন না; বরং নিজেকে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী এবং বিদ্যান্বেষণ হইতে মুক্ত মনে করিতে থাকেন। এরূপ ধারণার পরে আরও অধিক এল্‌ম হাছিল করার কাজে কে মশ্‌গুল থাকে? পাঠ্য তালিকার কিতাবগুলি পড়িয়া শেষ করার পর অবস্থা এই দাঁড়ায়, যাহাদের মধ্যে সামর্থ্য ও মেধাশক্তির অভাব, তাহারা ত পড়া ও পড়ানোর কাজ ছাড়িয়া দেয় আবার কেহ কেহ যেকের-ফেকেরে মশ্‌গুল হইয়া যায়। আর কেহবা ওয়ায নছীহতের পেশা অবলম্বন করে।

কেননা, এসব বিষয়ে নফ্‌সানী আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। কাহারও মধ্যে দৈহিক ভোগের মাধ্যমে নফ্‌সানী আনন্দের উপভোগ আছে। আর কাহারও

মধ্যে দৈহিক ভোগের মাধ্যম ব্যতীত নফ্‌সানী আনন্দ রহিয়াছে। ওয়ায করিয়া বেড়ানোর মধ্যে দৈহিক ভোগের মাধ্যমে নফ্‌সানী আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। কেননা, মানুষ ওয়ায়েযের পাছে পাছে ঘুরিয়া থাকে। দৈহিক এবং আর্থিক খেদমত করিয়া থাকে। সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য খাইতে পাওয়া যায়, মূল্যবান যান-বাহনে আরোহণ করা যায়। কোথাও মোটর, কোথাও ফিটন গাড়ী, কোথাও ফাষ্ট ক্লাশের বগীতে ভ্রমণ ইত্যাদি উপভোগ করা যায়। আর যেকের ফেকেরে দৈহিক উপভোগের মাধ্যম ব্যতীত নফ্‌সের আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। কেননা, কোন কোন লোক এই উদ্দেশ্যে যেকের-ফেকেরে মশ্‌গুল হইয়া থাকে যে, তাহাদের কাম্য সম্মান লাভ করা। অর্থাৎ তাহাদের বাসনা হইতেছে সূফী ও বুযুর্গ সাজিয়া মানুষের অন্তরসমূহের উপর আধিপত্য লাভ করা, ইহাতে তো নফ্‌সের আনন্দ লাভ হয়। কিন্তু দৈহিক উপভোগের মাধ্যম ইহাতে এই জন্য নাই যে, যেকের-ফেকেরে মশ্‌গুল হইলে তাহাদিগকে নানাবিধ রিয়াযৎ এবং সাধনা করিতে হয়। যথা—কম খাওয়া, কম শোওয়া ইত্যাদি ; বরং কেহ কেহ সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে এমন অতিরিক্ত দৈহিক কষ্ট বরদাশ্‌ত করিয়া থাকেন যে, এক বেলা খাদ্য গ্রহণ করেন এবং মোটা কাপড় পরিধান করেন, যেন লোকে তাঁহাদিগকে ত্যাগী ও বিরাগী মনে করে। এই তো গেল কপট লোকের অবস্থা। আর যাঁহারা খাঁটি অন্তঃকরণের তাঁহারা নফ্‌সানী আনন্দ উপভোগের প্রত্যাশী নহেন বটে, কিন্তু নফ্‌সানী আনন্দ হইতে তাহারাও মুক্ত নহেন। কেননা যেকের-ফেকেরে তাঁহারা এমন কতক উদ্দেশ্য মনে করিয়া রাখিয়াছেন যাহা প্রকৃত পক্ষে উদ্দেশ্য নহে ; বরং নফ্‌সানী আনন্দের অন্তর্ভুক্ত। যদিও তাঁহারা সমুদয়কে নফ্‌সানী আনন্দ মনে করেন না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যেহেতু তাহা নফ্‌সের আনন্দই বটে এবং তাঁহারা উহার প্রত্যাশী। সুতরাং যদিও তাঁহারা জানেন না, তথাপি তাঁহারা নফ্‌সানী আনন্দেরই প্রত্যাশী বলিয়া গণ্য।

যেমন, যেকের শোগলে যে স্বাদ পাওয়া যায়, অধিকাংশ যেকেরকারী সেই স্বাদের প্রত্যাশীও আছেন এবং উহাকে রূহানী স্বাদ মনে করিয়া উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকেন। অথচ সেই স্বাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নফ্‌সের আনন্দ। আর যদিচ এই লজ্জৎও ক্ষতিকর নহে ; বরং কোন স্তরে প্রশংসনীয়ও বটে ; কিন্তু তথাপি তাহা উদ্দেশ্যও নহে। কেননা, প্রশংসনীয় হইলেই তাহা উদ্দেশ্য হওয়া অনিবার্য নহে। অথচ অধিকাংশ যাকেরই উহাকে উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইয়াছে। বিশুদ্ধরূপে আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তোষ অর্জন এবং খাঁটি যেকের অতি অল্পই তাহাদের উদ্দেশ্য ; বরং এই নফ্‌সানী আনন্দ লাভই তাহাদের অধিক কাম্য। কেননা, এই নফ্‌সানী লয্‌যৎ যদি তাহাদের কাম্য না হইত, তবে তরীকতপন্থী এবং যাকেরগণ সে সমস্ত অভিযোগ কখনই করিতেন না যাহা আজকাল পীরের নিকট মুরিদগণ করিয়া থাকে। কেননা, যদি

বাস্তবিকই কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তোষ লাভ এবং খাঁটি যেকের তাহাদের কাম্য হইত, তবে তাহা তো লয্‌যৎ না পাওয়ার অবস্থায়ও তাহাদের হাছিল আছে, আবার অভিযোগ কিসের ? লয্‌যৎ না পাওয়ার কারণে উদ্দেশ্যের কি হানি হইল যাহার অভিযোগ করা যাইতে পারে ? কোরআন বা হাদীসের কোন দলিল দ্বারা কি ইহা প্রমাণিত আছে যে, লয্‌যৎ হাছিল না হইলে যেকের ফেকেরের সওয়াব কম হইবে ? বলা বাহুল্য, কোন দলিল দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় নাই। তবে লয্‌যৎ না পাওয়ার দরুন চিন্তা ও বিষন্নতা এবং পীরের নিকট অভিযোগ কেন ? কাজেই বুঝা যায় যে, ইহারা গৌণ উদ্দেশ্যকে মুখ্য এবং মুখ্য উদ্দেশ্যকে গৌণ মনে করিয়া থাকে। এই কারণেই লয্‌যৎ কম পাইলে কাজের মধ্যেও ত্রুটি করিতে আরম্ভ করে।

॥ লয্‌যতের প্রভেদ ॥

এখন আমি রূহানী লয্‌যৎ এবং নফ্‌সানী লয্‌যতের প্রভেদ বর্ণনা করিতেছি যেন যাকেরগণ ধোকায় পতিত না হন এবং নফ্‌সের আনন্দ ভোগে বিভোর না হন। স্মরণ রাখিবেন, যেকের-শোগল, নামায রোযা প্রভৃতি এবাদতে রূহের যে কাইফিয়ত হাছেল হয় তাহা অতিশয় সূক্ষ্ম। এমন কি, অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে উহাকে কাইফিয়ত বলিয়া অনুভব করাও মুশ্‌কিল। উহা প্রবলরূপে প্রকাশ পায় না। উহার লক্ষণ এই যে, দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে থাকে। পক্ষান্তরে নফ্‌সের কাইফিয়ত প্রবল ভাবে প্রকাশ পায়, যাহার প্রভাবে মানুষ অনেক সময় শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলে। যদিও এই অবস্থার প্রাবল্যে মানুষ অক্ষম ও মা'যুর হইয়া পড়ে, কিন্তু এই লয্‌যৎ বা হাল উদ্দেশ্য ও কাম্য নহে, উহার স্থায়িত্বও নাই ; বরং কিছু সময় পরে এই অবস্থা লোপ পাইতে থাকে। আর রূহের লয্‌যৎ ও কাইফিয়তের স্বরূপ এই, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাদীসে বর্ণনা করিয়াছেন :

جعلت قرة عيني في الصلوة অর্থাৎ, "আমার চোখের শান্তি নামাযের মধ্যে নিহিত রাখা হইয়াছে।" ইহার স্বরূপ সেই ব্যক্তিই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে যাহার এই শান্তি হাছিল হইয়াছে। কিন্তু উহার লক্ষণ এই যে, নামায ধীরস্থির ভাবে আদায় করে, তাড়াহুড়া করে না, আর দুনিয়ার কোন বিষয়ই নামায হইতে বিরত রাখিতে পারে না। নামায ব্যতীত অন্তরে শান্তি না পাওয়া, সময় আসিতেই নামাযের জন্য অস্থির হইয়া পড়া। ইহাকে বলে খাঁটি সৌন্দর্যপূর্ণ নামায, ইহারই নাম রূহানী কাইফিয়ত পক্ষান্তরে তরীকতপন্থীদের অন্তরের মধ্যক্ষেত্রে যে হালের বা কাইফিয়তের আবির্ভাব হয়, যেমন মোহিত হইয়া যাওয়া, ভাবে নিমগ্ন হওয়া প্রভৃতি। এসমস্ত অবস্থা কোন কোন সময় এত প্রবল হইয়া দাঁড়ায় যে, উহার প্রভাবে মানুষ শরীয়তের সীমা ছাড়াইয়া যায়

এই হাল কখনও কাম্য নহে। আর যাহার মধ্যে এখলাছ রহিয়াছে, যাহার নাম রূহানী কাইফিয়াত তাহাতে কুমন্ত্রণাই উদিত হউক না কেন তদবস্থায় সেই লয্‌যতের প্রত্যাশায় বিভোর হওয়া ঠিক—এইরূপ—যেমন মাওলানা বলিতেছেন ঃ

دست بوسی چوں رسید از دست شاہ + پائے بوسی اندراں دم شد گناہ

অর্থাৎ, "বাদশাহ্ যাহাকে তাঁহার হস্ত চুম্বনের সুযোগ দান করিয়াছেন, এমন অবস্থায় সেই ব্যক্তি যদি বলে, না হুযূর! আমি তো আপনার পা-ই চুম্বন করিব। তবে ইহা গুনাহ্ এবং অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।" নফ্‌সানী লয্‌যতে মোহিত হওয়া তো এই পদ চুম্বনেরই অনুরূপ এবং খাঁটি রূহানী হাল ও সুন্দর রূহানী লয্‌যতের তুলনা সেই হস্ত চুম্বনেরই মত। তবে ভাবিয়া দেখুন, উত্তমকে ছাড়িয়া অধমের প্রত্যাশী হওয়া ভুল কি না?

॥ খোদা ভীতি ও একাগ্রতার স্বরূপ ॥

নফ্‌সানী লয্‌যতে বিভোর ও মোহিত হওয়া কাম্য না হওয়ার প্রমাণ এই যে, কোরআনে বা হাদীসে কোথাও উহার ফযীলত উল্লেখ নাই; বরং হাদীস শরীফে খোদা-ভীতি ও একাগ্রতার স্বরূপ এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে ঃ

مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهٖ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهٗ غُفِرَ لَهٗ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ ـ اَوْكَمَا قَالَ

"যে ব্যক্তি ওযূ করিয়াছে এবং ভালরূপে ওযূ করিয়াছে, অতঃপর দুই রাকআত নামায এমন ভাবে পড়িয়াছে যে, সমস্ত মন উহার প্রতি আকৃষ্ট রহিয়াছে এবং উহাতে মনের সহিত কোন প্রকার বাজে ভাবাগোনা না করে, সে ব্যক্তি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে।" হুযুর একথা বলেন নাই لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهٗ "অর্থাৎ, তাহার অন্তর উহাতে কোন কথা না ভাবে", বরং এইরূপ বলিয়াছেন: لَا تُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهٗ ইহার অর্থ এই যে, নিজের ইচ্ছায় মনের মধ্যে কোন ভাবনা চিন্তা আনয়ন না করে। অবশ্য অনিচ্ছায় আপনাআপনি কল্পনা আসিলে ক্ষতি নাই। যখন বুঝিতে পারিলেন যে, আপনাআপনি চিন্তা কল্পনা আসিয়া পড়া নিন্দনীয় নহে। সুতরাং অনিচ্ছায় আপনাআপনি কল্পনা আসা কাম্যও নহে। হাঁ, তবে ইচ্ছা করিয়া কল্পনা আনয়ন করা অবশ্যই খারাব। নিজে ইচ্ছা করিয়া উহা আনয়ন না করাই কাম্য। সুতরাং যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কোন প্রকার কল্পনা আনয়ন না করে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। অতএব, কেহ যদি এই চেষ্টায় লাগিয়া থাকে যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনের মধ্যে কোন প্রকার চিন্তা ও কল্পনা না আসুক, ইহা এমন চেষ্টা যাহা কাম্য নহে।

হাদীস শরীফে আছে যে : হযরত ছাহাবায়ে কেরাম এই জাতীয় ভাবাগোনা উদিত হওয়ার অভিযোগ করিয়াছেন। উহারউত্তরে হুযুর(দঃ) তাঁহাদিগকে এমন কোন ওযীফা শিখাইয়া দেন নাই—যাহাতে চিন্তা ও কল্পনার আগমন স্বতঃইবন্ধ হইয়া যায়; বরং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়াছেন : ذَاكَ صَرِيْحُ الْاِيْمَانِ "উহা ঈমানের স্পষ্ট লক্ষণ।" আরও বলিয়াছেন : فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ "আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় ও সাহায্য ভিক্ষা করা উচিত এবং সেই কল্পনা চিন্তাহইতে বিরত থাকা উচিত।" ইহার সারমর্ম এই যে, নিজেকে যেকের ফেকেরের প্রতি মনোযোগী করিয়া দিবে। মনে কি কল্পনা আসিতেছে বা আসিতেছে না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবে না। অর্থাৎ, স্বেচ্ছায় কল্পনার ও চিন্তার প্রতি মনোনিবেশ করিবেন না। "لْيَنْتَهِ" অর্থাৎ, "বিরত থাকার অর্থ ইহাই।" এরূপ অর্থ নহে যে, সেই কল্পনা চিন্তাকে রোধ করার প্রতি মনোযোগী হইয়া পড়িবে। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, কল্পনা চিন্তা একেবারে মনে না আসা উদ্দেশ্য নহে। তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) কল্পনা মনে না আসাই উদ্দেশ্য বলিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিতেন।

কেহ একথার উপর সন্দেহ করিতে পারেন—যদিও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাযের মধ্যে মনে কোন প্রকার কল্পনা আসিলে গুনাহ্ হইবে না। কিন্তু কোরআন শরীফ হইতে জানা যায় যে, কল্পনার জন্য হিসাব এবং পাক্ড়াও করা হইবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ "আমি মানুষকে সৃষ্টিকরিয়াছি এবং আমি জানি মানুষের মনে যাহাকিছু কল্পনা ও ভাবাগোনা হইয়া থাকে।" ইহাতে প্রকাশ্য ভাবে সন্দেহ হয় যে, কল্পনার জন্যও শাস্তি হইবে। কেননা, অনেক আয়াতে يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ "আল্লাহ্ তা'আলা জানেন—যাহাকিছু তাহারা করিতেছে।" প্রভৃতি এবারতে শাস্তির প্রতিই ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া মুফাস্সেরগণ সকলেই একমত। কিন্তু সন্দেহকারী আয়াতের মর্মার্থে চিন্তা করেন না বলিয়াই এরূপ সন্দেহ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন কোরআনশরীফের প্রতি যে সমস্ত সন্দেহ ও প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকেউহাদের অধিকাংশই পূর্বাপরের প্রতি লক্ষ্য না করারকারণেই হইয়া থাকে। অন্যথায় কোরআনের কোন বিষয়-বস্তুই কোন প্রকারের সন্দেহ বা প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে না। কোরআন বাস্তবিকই— بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ অর্থাৎ, 'হেদায়তের জন্য স্পষ্ট দলিল এবং হক ও বাতেলের মধ্যে তারতম্য করণের মাপকাঠি।' কিন্তু তাহা কাহার জন্য? একমাত্র কোরআনের মর্মার্থের প্রতি গভীরভাবে

চিন্তাকারীদের জন্য—كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ "ইহা একটি পবিত্র ও মহান কিতাব। আমি তাহা আপনার উপর নাযিল করিয়াছি। উদ্দেশ্য—লোকে উহার আয়াতসমূহে চিন্তা করিবে।" এখন শুনুন, نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ আয়াত দ্বারা কেমন করিয়াসন্দেহের উদয় হয় যে, কল্পনারজন্যও মানুষকে শাস্তিপ্রদান করা হইবে? সন্দেহ উদিত হওয়ার কারণ এই যে, লোকে অন্যান্য আয়াতের ন্যায় এই আয়াতেও শাস্তির প্রতি ইঙ্গিতই বুঝিয়া লইয়াছে এবং মনে করিয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন বলিতেছেন : "আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি এবং আমি তাহাদের মনের চিন্তাভাবনা ও কল্পনাসমূহ খুব ভালরূপে অবগত আছি। কাজেই লোকে যেন কখনও মনে না করে যে, তাহাদের মনের কল্পনা ও চিন্তা কেহ জানে না।" যেমন, نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ "যাহাকিছু তাহারা ব্যক্ত করে সবই আমি জানি।" আর نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ "যাহাকিছু তাহারা বলে তাহাও আমি খুব ভালরূপে জানি।" প্রভৃতি আয়াতে শাস্তির ধমক প্রদান করা হইয়াছে। তদ্রূপ : نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ আয়াতেও আযাবেরই ধমক প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু আমি বলি, এই আলোচ্য আয়াতটির পূর্বাপরের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় যে, শাস্তির সঙ্গে এই আয়াতের কোন সম্পর্কই নাই।

॥ সৃষ্টিকর্তা ও জ্ঞানী হওয়া ॥

এই আয়াতে কেবল একথার প্রমাণ বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং তাহাদের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত কথা ও চিন্তা কল্পনা সম্বন্ধে অবহিত। অনুরূপভাবেআর একস্থানে তাঁহারসৃষ্টিকর্তা গুণ দ্বারা তাঁহার জ্ঞানী হওয়া প্রমাণ করিয়া বলিয়াছেন : أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন,তিনিও কি নিজের সৃষ্ট বস্তুসম্বন্ধে জানিবেননা? অথচ তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী ও মহাজ্ঞানী।" এখানে আলোচ্য আয়াতেও সৃষ্টিকারী ও জ্ঞানী গুণদ্বয়েরই প্রমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে। অত্র আয়াতের পূর্ব ও পরের আয়াতগুলির মধ্যে চিন্তা করিলেই তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। পূর্ব আয়াতগুলিতে প্রথম হইতে চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এখানে পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের মতবাদ খণ্ডনের জন্য পুনরুত্থান বা পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছেন এবং পুনরুত্থান করিতে দুইটি বস্তুর প্রয়োজন। একটি পূর্ণ ক্ষমতা, যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা অস্তিত্ববিহীন পদার্থকে অস্তিত্ব প্রদান করিতে সমর্থ হন, দ্বিতীয়টি পূর্ণ জ্ঞান যাহার সাহায্যে দেহসমূহে মৃত্যুর

পর উহাদের ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত অংশসমূহকে একত্রিত করা সম্ভব হয়। দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমতঃ পুনরুত্থান অবিশ্বাসকারীদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাহারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত হওয়াকে আশ্চর্যজনক এবং অসম্ভব বা সুদূর পরাহত বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে ঃ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ "পুনরুত্থান সুদূর পরাহত পুনর্জীবন"

অতঃপর তাহাদের এই বিস্ময়বোধ এবং অসম্ভব ধারণা খণ্ডনের জন্য নিজে পূর্ণ জ্ঞানী হওয়ার দাবী করিয়াছেন ঃ

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيْظٌ *

ইহার সারমর্ম এই যে, আমার জ্ঞানের এই মহিমা—আমি তাহাদের সেসমস্ত অংশ সম্বন্ধে অবগত আছি যাহাকে মাটি খাইয়া ফেলে এবং বিলুপ্ত করিয়া দেয়। আর ইহাও নহে যে, আমি উহা আজ হইতে অবগত আছি, পূর্বে জানিতাম না; বরং আমার জ্ঞান অনাদি অনন্ত। এমন কি, আমি অস্তিত্ব প্রাপ্তির পূর্বেই সকল পদার্থের সর্ববিধ অবস্থা নিজের অনাদি অনন্ত জ্ঞানের সাহায্যে "লৌহে-মাহ্ফুয" নামক একটি দফতরেও লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি। আজ পর্যন্ত আমার নিকট সেই রক্ষিত দফতর বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার মধ্যে সেই বিলুপ্ত অংশসমূহের আকৃতি, প্রকৃতি, স্থান ও পরিমাণ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর নিজের পূর্ণ ক্ষমতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে আসমান-জমিনের সৃষ্টি এবং বৃষ্টি ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ 'আমি কেমন সুন্দর ও মজবুত করিয়া আসমানকে সৃষ্টি করিয়াছি যাহাতে এত দীর্ঘকাল পরেও কোন প্রকারের টুট-ফাট হয় নাই। আর জমিনকে কেমন সুন্দরভাবে বিছাইয়া দিয়াছি তাহাতে পাহাড়সমূহকে বসাইয়াছি এবং প্রত্যেক প্রকারের সুন্দর উদ্ভিদসমূহ উৎপন্ন করিয়াছি? আর আসমান হইতে বরকতের পানি নাযিল করিয়াছি। উহা দ্বারা বাগানের বৃক্ষসমূহ জন্মাইয়াছি এবং খাদ্যশস্য ও খেজুরের গাছ উৎপন্ন করিয়াছি। যাহাতে শুষ্ক ও অনুর্বর জমিনে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। অতএব, বুঝিয়া লও যে, এইরূপে মৃত দেহও পুনরায় জীবিত হইতে পারে।

অতঃপর বলিতেছেন ঃ أَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ "আমি কি প্রথম বারের সৃষ্টিতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, দ্বিতীয়বার জীবিত করিতে পারিব না?" এইরূপ ধারণাও ভুল। কেননা, ক্ষমতার অভাবেই তো ক্লান্তি আসিয়া থাকে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা অপূর্ণ নহে; বরং চরম স্তরের পূর্ণ। স্বয়ং সৃষ্টজগৎ উহার সাক্ষী। অতএব, আল্লাহ্ তা'আলার ক্লান্তিও নাই। এই পর্যন্ত তিনি স্বীয় ক্ষমতার পূর্ণতা

প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন। অতঃপর নিজের সৃষ্টিকর্তা গুণের উল্লেখ করিয়া প্রথমে দাবী কৃত পূর্ণ জ্ঞানের প্রমাণ দিতেছেন :

ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه

"অর্থাৎ, আমি মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছি। (ইহাতে আমার চরম স্তরের জ্ঞান, কৌশল এবং ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কেননা, মানুষ সমস্ত সৃষ্ট জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান, চতুর এবং জ্ঞানী। অতএব, বুঝিয়া লও এমন সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা কেমন জ্ঞানী হইতে পারেন!) আর আমি সে সমস্ত কথাও অবগত আছি যাহা মানুষের অন্তরে কল্পনারূপে উদিত হয়। কেননা, অন্তরের আলোড়নই উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর সেই আলোড়ন আমিই সৃষ্টি করিয়া থাকি। ইহার প্রমাণ এই যে, এসমস্ত চিন্তা ও কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নহে। অতএব, যে খোদা মানুষের অন্তরের এমন কল্পনা এবং ভাবাগোনাও অবগত আছেন যাহা মানুষের অনিচ্ছাক্রমে সাময়িকভাবে মনে উদিত হয় বলিয়া উহার দায়িত্বও নাই, সে খোদা মানুষের অন্তরে স্থায়ী-ভাবে উৎপন্ন ইচ্ছা এবং সঙ্কল্প সম্বন্ধে কেন অবগত থাকিবেন না? তদুপরি তিনি মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কাজ এবং মুখের কথা কেন জানিতে পারিবেন না যাহা তাঁহার সৃষ্ট মানুষও জানিতে পারে? যদিও এসমস্ত কাজ-কর্ম এবং মুখের কথা সাময়িকভাবে ক্ষণেকের তরে সংঘটিত হয় বলিয়া স্থায়ীও নহে; তথাপি অনুভবনীয় অস্তিত্বের অধীন বলিয়া মানুষও উহাকে অনুভব করিতে পারে, তবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা কেন তাহা অনুভব করিতে পারিবেন না? আর তিনি যখন মনের কল্পনা, ইচ্ছা ও সঙ্কল্প এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির কার্য ও মুখের কথা সবকিছুই অবগত আছেন, তবে তিনি মানুষের মৃতদেহের যে সমস্ত অংশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বিভিন্ন মৌলিক ও অমৌলিক পদার্থের মধ্যে মিশিয়া রহিয়াছে তাহা কেন জানিতে পারিবেন না? আমাদের আলোচ্য আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে এতটুকু কথা বুঝা গিয়াছিল। পরবর্তী আয়াতসমূহে এই কথাটির প্রমাণ তো আরও স্পষ্টরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

অতঃপর তিনি বলিতেছেন : ونحن اقرب اليه من حبل الوريد

অর্থাৎ, "জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাহার ঘাড়ের রগ হইতে অধিক নিকটবর্তী।" (ঘাড়ের রগ বলিতে এখানে সেই রগই উদ্দেশ্য জীবন যাহার উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে জীবনের নির্ভর নফ্‌স এবং রূহের উপরেও বটে। অতএব, এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি মানুষের অবস্থাসমূহ তাহাদের নফ্‌স এবং রূহের চেয়েও অধিক জানি। কেননা, আমার জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত এবং দিব্যও বটে আর

মানুষের নফ্‌স এবং রূহের জ্ঞান দিব্যই হউক আর অর্জিতই হউক তাহা অস্থায়ী অর্থাৎ আদি অন্ত বিশিষ্ট। বস্তুতঃ অর্জিত জ্ঞান যে, মূলতঃ ত্রুটিবহুল ইহা অনস্বীকার্য।)

আলেমগণ একথায় একমত রহিয়াছেন যে, এই আয়াতে নিকটবর্তী শব্দের অর্থ জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে নিকটবর্তী। অতএব, এস্থলে نحن اقرب اليه من حبل الوريد কথাটি ঠিক সেইরূপ যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন : ......الا يعلم من خلق "যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তিনিও কি জানেন না?" অতঃপর বলিয়াছেন : وهو اللطيف الخبير 'অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সর্বজ্ঞ।' উভয় আয়াতের সারমর্ম একই। অর্থৎ, সৃষ্টিকর্তা-গুণ হইতে জ্ঞানী হওয়ার প্রমাণ করা হইয়াছে এবং আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের পূর্ণতা ও ত্রুটি-বিহীনতা প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা পুনরুত্থানের ও পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ পূর্বক মানুষের অন্তর হইতে উহার অসম্ভব ও সুদূর পরাহত হওয়ার বিশ্বাস দুর করাই উদ্দেশ্য। এখানে এমন কোন আলোচনাই নাই যে, সেই কল্পনা ও ভাবাগোনার জন্য শাস্তি হইবে কি, হইবে না; বরং শুধু এতটুকু কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, তিনি মানব-মনের সর্ববিধ কল্পনা ও চিন্তা সম্বন্ধে অবগত রহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞান পরিপূর্ণ ও ত্রুটিবিহীন। খুব অনুধাবন করুন। অতএব, এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে না যে, মনে উদিত কল্পনার জন্য শাস্তি প্রদান করা হইবে। অবশ্য যে আয়াতে প্রথম দৃষ্টিতেই কল্পনা এবং ভাবাগোনার জন্য শাস্তি হওয়ার সন্দেহ হইতে পারিত, আল্লাহ্ তা'আলা তাহা অতি স্পষ্টরূপে ও পরিষ্কার ভাবে অপনোদিত করিয়া দিয়াছেন, আয়াতটি এই:

وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ۝

"আর যদি তোমরা প্রকাশ কর ঐ সমস্ত কথাকে যাহা তোমাদের অন্তরের মধ্যে কল্পিত হয়। কিংবা উহাকে গোপন রাখ, সকল অবস্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলা উহার হিসাব লইবেন। অতঃপর যাহাকে ইচ্ছা ক্ষমা করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা আযাব দিবেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশালী।" এখানে 'ما' শব্দটির ব্যাপকতায় স্বেচ্ছাকৃত কল্পনা এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত আছে। এই ব্যাপকতার কারণেই ছাহাবায়ে কেরামের মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল। অজ্ঞতা তাঁহাদের সন্দেহের কারণ ছিল না। ছাহাবা (রাঃ) জানিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনিচ্ছাকৃত কাজের জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন না। কেননা ইহা সাধারণ জ্ঞানের কথাও বটে;

বরং ভয়ের আতিশয্যে তাঁহারা সন্দেহ করিয়াছিলেন—হয়ত উভয়বিধ কল্পনার জন্যই শাস্তি হইতে পারে। কেননা, আয়াতের শব্দ বাহ্যত ব্যাপক। আর খোদা-ভীতি এমন একটি বস্তু যখন উহার প্রাবল্য হয়, তখন জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য থাকে না; বরং জ্ঞান পরাভূত হইয়া যায়।

।। খোদা-ভীতির সীমা ।।

হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি কোরবান হউন যিনি আমাদের জন্য খোদা-ভীতিরও একটি সীমা বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। হুযূর (দঃ) ভিন্ন কেহই উহার সীমা বর্ণনা করিতে পারিতেন না। আমরা তো খোদা-ভীতির প্রতিটি স্তরকেই উদ্দেশ্য মনে করিতাম। কেননা, খোদা তা'আলাকে ভয় করা প্রশংসনীয় এবং উদ্দেশ্যও বটে। আর উদ্দেশ্যযুক্ত বস্তুর প্রত্যেকটি স্তরই বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। আমরা তো বহিঃদৃষ্টিতে এরূপই মনে করি। কিন্তু হুযূর (দঃ) এই মহান জ্ঞাতব্য বিষয়টিকে পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, উদ্দেশ্যযুক্ত বস্তুরও প্রত্যেকটি স্তর উদ্দেশ্য হওয়া জরূরী নহে; বরং উদ্দেশ্যযুক্ত বস্তুগুলিও এক নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত কাম্য হইয়া থাকে। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন: واسئلك من خشيتك ما تحول به بيني و بين معاصيك "হে খোদা! আমি আপনার ভয় এতটুকু প্রার্থনা করি যাহা দ্বারা আমার ও গুনাহর মধ্যে অন্তরায় হয়।" ইহার চেয়ে অধিক ভয় তিনি প্রার্থনা করেন নাই। ইহাতে বুঝা গেল, ভয়ের অত্যধিক প্রাবল্যও উদ্দেশ্য নহে। কারণ এই যে, অত্যধিক ভয়ের প্রাবল্যে কোন কোন সময় নানাবিধ দৈহিক কষ্টের উৎপত্তি হয়। শরীর দুঃখ ও চিন্তায় বিগলিত হইতে আরম্ভ করে। আবার কোন কোন সময় সীমা ছাড়াইয়া যায়। যেমন, কোন চাকরের মনে প্রভুর ভয় অধিক প্রবল হইলে তাঁহার সম্মুখে যাইতেই তাহার হাত-পা ফুলিয়া যায়। অতঃপর একটা করিতে যাইয়া আর একটা করিয়া বসে, মুখ হইতেও অসংযতভাবে বাক্য নির্গত হয়। একটা বলিতে যাইয়া অন্য কিছু বলিয়া ফেলে। এতদ্ভিন্ন সেই ভয়ের প্রাবল্য বশতঃ কোন কোন সময় নৈরাশ্য পর্যন্ত আসিয়া পড়ে। কাজেই এরূপ সীমাহীন ভয় পূর্ণতাগুণের মধ্যে গণ্য নহে। এই কারণেই কামেল লোকদের হৃদয়ে তেমন প্রবল ভয় জন্মে না, যেমন আম্বিয়া কেরাম (আঃ) সকল অবস্থার উপরই জয়ী থাকিতেন, কখনও পরাভূত হইতেন না। অবশ্য কামেল লোকের উপরও সময়ে ভয়ের প্রাবল্য ঘটে। কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অল্পক্ষণের জন্য হইয়া থাকে। অতঃপর সত্বরই আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে সামলাইয়া লন। আর বস্তুতঃ কামেল লোকদের সাহায্যেই অপূর্ণ লোকদের সামাল হইয়া থাকে। কাজেই আল্লাহ্ ভিন্ন

কামেল লোকদিগকে কে সামলাইবেন? সুতরাং তাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলাই সামলাইয়া লন।

او بدلها هم نماید خویش را + او بد وزد خرقهٔ درویش را

"তিনি কামেল লোকদের হৃদয়ে আত্ম-প্রকাশ করেন। তিনি দরবেশদের খেরকা সেলাই করেন।" অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেকে তাঁহার আশেকদের সম্মুখে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিজে তাহাদের অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় পরিবর্তিত করিয়া থাকেন।

ফলকথা, ছাহাবায়ে কেরাম ভয়ের প্রাবল্য বশতঃ এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, কল্পনার জন্যও শাস্তি হইবে। তাঁহারা উক্ত সন্দেহ হুযূরের খেদমতে নিবেদন করিলেন। হুযূর আদবের আতিশয্য বশতঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা নিজে করিলেন না। এদিকে অকাট্য ওহীর সাহায্যে উক্ত সন্দেহ দূরীভূত হওয়ার আশাও ছিল। শরীয়ত বিধানসমূহের বিভিন্ন ধাপ রহিয়াছে। কোন কোন ধাপের ব্যাখ্যা তো তিনি নিজেই করিয়া দিয়াছেন। আর কোন কোন ধাপের ব্যাখ্যার জন্য তিনি অকাট্য ওহীর প্রতীক্ষায় থাকিতেন এবং সেই ধাপগুলি কেবল তিনিই জানিতেন। ফলকথা, তিনি নিজে ব্যাখ্যা করিলেন না যে, مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ বাক্যের অর্থ মনের স্বেচ্ছাকৃত কল্পনা; বরং বলিলেন: قُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ, "তোমরা বল, আমরা শুনিলাম এবং মান্য করিলাম, তোমার ক্ষমার প্রত্যাশী রহিলাম। হে প্রভু! তোমারই নিকট আমাদের ফিরিয়া যাওয়ার স্থান।" আর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে যে হুকুমই অবতীর্ণ হয় উহা গ্রহণ কর। ফলতঃ ছাহাবায়ে কেরাম তদ্রূপ করিলেন এবং ব্যাপকতার উপরই সম্মত হইয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর প্রশংসায় আয়াত নাযিল হইল:

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

"রাসূল (দঃ) এবং মুমেনগণ আল্লাহ্র নাযিল কৃত হুকুমের উপর পূর্ণ ঈমান রাখেন।" প্রত্যেক হুকুমের উপর অন্তরের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া যায় এবং "শুনিলাম" ও "কবুল করিলাম" বলে। অতঃপর পূর্ববর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

অর্থাৎ, 'আল্লাহ্ তা'আলা শক্তির বাহিরে কাহাকেও হুকুম পালনের দায়িত্ব ভার চাপান না এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনার জন্য তাহাদের শাস্তিও হইবে না।' এই আয়াত দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হইয়া গেল যে, উক্ত আয়াতে مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ পদে

ইচ্ছা ও সংকল্পিত কার্যই উদ্দেশ্য — لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ "যেসব ভাল কাজ করিবে তাহা নফ্‌সের জন্য কল্যাণকর, যাহাকিছু মন্দকাজ করিবে তাহা নফ্‌সের জন্য ক্ষতিকর।" কথার লক্ষ্যস্থল সেই ইচ্ছায় সংকল্পিত কার্যই বটে; অনিচ্ছাকৃত কল্পনা নহে।

এখন একটি প্রশ্ন হইতে পারে যে, "হাদীস শরীফে দেখা যায়, দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতটিকে রহিত করিয়া দিয়াছে। আর আপনার বর্ণনায় বুঝা যায়, দ্বিতীয় আয়াতটি প্রথম আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে নাই; বরং উহার তফ্‌সীর করিয়াছে: প্রাচীনকালের ওলামায়ে কেরামের পরিভাষায় 'নাস্‌খ' (রহিত) শব্দটির অর্থ ব্যাপক। তাঁহারা ব্যাখ্যারূপ বর্ণনাকেও 'নাস্‌খই (রহিত) বলিয়া থাকেন। বাস্তবিক এই জবাবটি বড় মূল্যবান। যাঁহারা হাদীস শরীফকে গভীরভাবে লক্ষ্য করিবেন, তাঁহারাই ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবেন এবং অনুসন্ধান করিলে এই জবাবের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এখন সমস্ত সন্দেহেরই অবসান হইয়া গেল। আর যদি কেহ এরূপ সন্দেহ করেন যে, এমনও সম্ভব যে, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ আয়াতটি لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ আয়াতের পরে নাযিল হইয়াছে। তাহা হইলে তো পরে অবতীর্ণ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ আয়াতটি لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا الخ আয়াতের জন্য নাসেখ অর্থাৎ রহিতকারী হইয়া যাইবে। তবে আপনার বর্ণনার সত্যতা কোথায় থাকে? ইহার একটি জবাব এই যে, ইতিহাস দেখুন, তফ্‌সীরকার আলেমগণ বলিয়াছেন, সম্পূর্ণ 'সূরা-কাফ' মক্কায় অবতীর্ণ, আর সম্পূর্ণ সূরা 'বাকারা' মদীনায় অবতীর্ণ। অতএব, মক্কাবতীর্ণ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ الخ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ আয়াতের পরে কেমন করিয়া হইবে? দ্বিতীয়তঃ সূরা-'কাফ এর' وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ الخ আয়াতটি কল্পনার জন্য শাস্তি হওয়ার কথা পরিষ্কাররূপে বুঝায় না; বরং উহাতে শুধু এতটুকু উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের মনের কল্পনা সম্বন্ধে অবগত আছেন। পক্ষান্তরে সূরা-বাকারার لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ الخ আয়াতে কল্পনার জন্য শাস্তি না হওয়ার কথা পরিষ্কার ভাবে

উল্লেখ রহিয়াছে। অস্পষ্ট আয়াত কখনও স্পষ্ট আয়াতের জন্য 'নাসেখ্' হইতে পারে না। যাহা হউক, বর্ণনা অনেক দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে।

॥ স্বাদ উপভোগ এবং মোহিত থাকা ॥

আমি বলিতেছিলাম, নামাযের মধ্যে যদি আপনা-আপনি মনে কল্পনা আসিতে থাকে, তবে উহাতে কোনই ক্ষতি নাই। অবশ্য ইচ্ছা করিয়া কল্পনা করা খারাপ। অনিচ্ছায় আসে আসুক আপনাদের কোন পরোয়া নাই। এতটুকু উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পর যদি কেহ এরূপ অভিযোগ করে যে, "হায়! আমার মনে নামাযের মধ্যে বহু প্রকারের কল্পনা আসিয়া থাকে" তবে সে ইহাই প্রমাণ করে যে, সে উদ্দেশ্যের প্রার্থী নহে। অন্য কিছুর প্রার্থী এবং তাহা নফ্‌সের কামনা পরিপূরণ করা ছাড়া আর কিছুই নহে। কেননা, যদি মনে কোন কল্পনাই না আসে এবং মোহের মত অবস্থা হইয়া যায়, তবে নফ্‌স্ উহাতে খুব স্বাদ পায় এবং নফ্‌স টানা হেঁচ্‌ড়া হইতে মুক্ত থাকে। নফ্‌সের এই স্বাদ উপভোগের নিমিত্তই এই ব্যক্তি স্বাদ উপভোগ এবং মোহিত থাকা কামনা করিয়া থাকে। সে যেন দুনিয়াও চাহে না, মান-মর্যাদা প্রভৃতিরও প্রত্যাশী নহে, কিন্তু একটি উদ্দেশ্যবিহীন বিষয়ে প্রত্যাশী এবং এপর্যন্ত সে নফ্‌সের কাম্য স্বাদ-এর পশ্চাতেই লাগিয়া রহিয়াছে।

আমি ইহাই বর্ণনা করিতেছিলাম যে, যে সমস্ত তালেবে এলম্ পাঠ্য তালিকার কিতাবগুলি সমাপ্ত করিবার পর যেকের ফেকেরে মশ্‌গুল হইয়া যায় তাহাদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক রহিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোক খাঁটি নহে, তাহারা মান-মর্যাদা প্রভৃতির প্রত্যাশী আর অবশিষ্ট লোক খাঁটি; কিন্তু ইহাদের মধ্যেও অনেকে নফসের কাম্য স্বাদ উপভোগের পিছনে লাগিয়া রহিয়াছে। যদিও উহাকে দুনিয়াবী স্বাদ বলা যায় না; কিন্তু যেকের ফেকেরের উদ্দেশ্যও উহা নহে। আর যে সমস্ত তালেবে এল্‌ম্ খাঁটি নহে তাহাদের কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিবেন। এই তো বলিলাম তাহাদের কথা যাহাদের প্রবৃত্তিই সুষ্ঠু নহে। কাজেই তাহাদের অন্য প্রবৃত্তির কারণেই তাহারা এল্‌ম চর্চা পরিত্যাগ পূর্বক যেকের-ফেকেরে মশ্‌গুল হইয়া পড়ে এবং অধিক জ্ঞানার্জন হইতে পাশ কাটাইয়া বসিয়া পড়ে। আর যাহাদের প্রবৃত্তি সৎ ও সুষ্ঠু, তাহাদের শেষ সীমা এই যে, তাহারা পাঠ সমাপ্ত করিয়া শিক্ষা ও শিক্ষকতা কার্যে লিপ্ত হইয়া যায়, তাহারা ইহাকেই জরুরী মনে করিতে থাকে। তাহাদের অতিরিক্ত জ্ঞানার্জনের সীমা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে যে, তাহারা সদাসর্বদা পাঠ্য কিতাব পড়িয়া ও পড়াইয়াই জীবন কাটাইয়া দেয়। আবার তাহাদের মধ্যেও অনেকের উদ্দেশ্য শুধু বেতন লাভ করা। আর কিছু সংখ্যক লোকের উদ্দেশ্য এই হয় যে, আমরা এল্‌ম্ শিক্ষা দেওয়ার সওয়াব পাইব এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতনও পাইব, কেননা, সকল

বেতনকে উজ্‌রৎ অর্থাৎ, পারিশ্রমিক বলা যায় না ; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন গ্রহণ করার অধিকারও আছে। যেমন, বিবীর খোরাক-পোশাক এবং কাযীর খোরাক-পোশাক ইত্যাদি।

॥ পারিশ্রমিক এবং খোরাক-পোশাকের পার্থক্য ॥

হাঁ, পারিশ্রমিক ও খোরাক-পোশাকের মধ্যে একটি পার্থক্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, বেতন নির্দিষ্ট হইয়া থাকে আর খোরাক-পোশাকের মধ্যে কোন নির্দিষ্টতা নাই ; বরং উহাতে প্রয়োজনানুযায়ী অধিকার হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কিছুর অধিকার হয় না। কিন্তু কোন কোন সময় বিবীর খোরাক-পোশাকের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া فرض جائز জায়েয হয় যেন কোন ঝগড়া-কলহের সম্ভাবনা না থাকে এবং উভয় পক্ষের সুযোগ সুবিধা সংরক্ষিত থাকে। এই নির্দিষ্ট করণের দ্বারা তাহা খোরাক-পোশাকের গণ্ডি ছাড়াইয়া যায় না। কাযী কর্তৃক বিবীর খোরাক-পোশাক নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার পরেও উহার নাম খোরাক-পোশাকই থাকে। এইরূপ মুদাররেসগণের বেতন যদি নির্ধারিত হয়, তবে শুধু তা'লীম প্রদান করাতেই উহা তা'লীমের পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবে না ; বরং উহা গ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং খোরাক-পোশাকেরই অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। কিন্তু এখন দেখিতে হইবে যে, কাহার বেতন পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবে আর কাহার বেতন পারিশ্রমিকের মধ্যে গণ্য হইবে না, খোরাক-পোশাকের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা, শুধু শব্দ শুনিয়া দাবী করা এবং নিজের বেতনকে খোরাক-পোশাকের মধ্যে গণ্য করিয়া লওয়া সহজ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার প্রয়োগক্ষেত্র হওয়া সহজ নহে। কবি বলেন :

وجائزة دعوى المحبة في الهوى + ولكن لا يخفى كلام المنافق -

"মুখে তো মহব্বতের দাবী করা সহজ, কিন্তু সত্যিকারের আশেক হওয়া কঠিন। মুনাফেকের কথা কখনও অপ্রকাশ থাকে না।"

وقوم يدعون وصال ليلى + وليلى لا تقر لهم بذاك

অনেকে লায়লীর সহিত মিলন হইয়াছে বলিয়া দাবী করে, কিন্তু লায়লী তাহা স্বীকার করে না। এইরূপে অনেকে দাবী করে "আমি আল্লাহ্‌র মিলন এবং নৈকট্য লাভ করিয়াছি" কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাও করেন না (যে, এই ব্যক্তি কোন ক্ষেত্রের ভাতুয়া) অনেকে নিজেকে আল্লাহ্ তা'আলার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে, অথচ তাহারা ধোকায় পতিত রহিয়াছে। তাহারা শুধু স্মরণ রাখার ক্ষমতাকেই সম্বন্ধ মনে করিয়া থাকে এবং ভাবে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ হইতে

মন কখনও যেন গাফেল না হয়, কিন্তু এই গাফেল না হওয়াকে "সম্বন্ধ" মনে করা ভুল। বিস্মৃত না হওয়া তো অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। একজন ফাসেক লোকও যদি দুই বৎসর ধরিয়া খোদাকে স্মরণ রাখার অভ্যাস করিয়া লয়, তবে খোদাকে স্মরণ রাখার কাজে সে সফলতা লাভ করিতে পারে। তবে কি সেই ফাসেকও আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে? কখনই নহে। কেননা, ফেস্‌কের সহিত আল্লাহ্ তা'আলার খাছ সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না। মনে রাখিবেন, স্মরণ রাখা আর সম্পর্ক স্থাপন এক কথা নহে; বরং স্মরণ রাখা সম্পর্ক স্থাপনের সহায়ক হইতে পারে। অর্থাৎ, এবাদৎ এবং হুকুম পালনের সহিত যদি স্মরণ রাখাও একত্রিত হয়, তবে অতি সত্বর খাছ সম্পর্ক অন্তরে স্থাপিত হইয়া যায়।

।। নেস্‌বত বা সম্বন্ধের স্বরূপ ।।

এখন সম্বন্ধের স্বরূপ বুঝিয়া লউন। ইহার স্বরূপ উহাই যাহা আপনারা পাঠ্য কিতাবে পড়িয়াছেন। অর্থাৎ দুই পক্ষের মধ্যবর্তী আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক-সম্বন্ধ একটি যোগ সম্পর্ক ও সংযোগের নাম যাহা দুইটি পক্ষের মধ্যে স্থাপিত হইয়া থাকে। খোদার সহিত সম্বন্ধের অর্থ এই যে, আল্লাহ্‌র সহিত বান্দার এবং বান্দার সহিত আল্লাহ্‌র সম্পর্ক সংযোগ সাধিত হওয়া। এখন বুঝিয়া লউন, যেই ছুফী ছাহেব আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিতেছে বলিয়া আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে মনে করে, তাহার অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সহিত তো তাহার স্মরণ রাখার সম্পর্ক আছে, কিন্তু তাহার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার কোনই সম্পর্ক নাই।

ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ মনে করুন, যেমন, কোন একজন লোক জনৈক তালেবে-এল্‌মকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আজকাল কি কাজে আছেন?" সে বলিল, "রাজ কন্যাকে বিবাহ করার ফেকেরে আছি।" লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "উহার কিছু ব্যবস্থাও হইয়াছে কি?" সে বলিল, "হাঁ অর্ধেক ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে আর অর্ধেক বাকী আছে।" সে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহা কেমন?" বলিল, বিবাহ দুই পক্ষের সম্মতিতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমি তো সম্মত আছি; কিন্তু সে এখনও সম্মত হয় নাই। এই কারণেই বলিয়াছি, "অর্ধেক ব্যবস্থা হইয়াছে আর অর্ধেক বাকী আছে।" এই গল্পটি শুনিয়া সকলেই হাসে এবং সেই তালেবে এল্‌মটিকে বোকা সাজায় এবং বলে নিতান্ত অবান্তর লোক। ইহাও কি কোন ব্যবস্থা হইল যে, আমি সম্মত আছি, কিন্তু সে রাজী নাই। অথচ মারেফত তত্ত্ববিদগণ সেই অবস্থার উপর আরও অধিক হাস্য করিয়া থাকেন। কেননা, তালেবে এলমটি নিজের সম্মতিকে অর্ধেক বলিয়াছে আর এই সমস্ত ছুফীরা খোদাকে নিজেদের স্মরণ রাখাকে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের পুরাপুরি ব্যবস্থা মনে করিয়া থাকে এবং ইহাকেই যথেষ্ট মনে করিয়া মনে মনে খুব

গর্বিত আছে যে, খোদার সহিত আমাদের সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের দৃষ্টান্ত এরূপ মনে করিতে পারেন : যেমন, কোন ব্যক্তি কেবল মাত্র নিজের সম্মতিতে মনে করিতে লাগিল যে, আমার পুরাপুরি বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং সস্ত্রীক হইয়াছি।

স্মরণ রাখিবেন, বান্দার সহিত খোদার সম্বন্ধ, যাহার প্রকৃত স্বরূপ খোদার সন্তোষ, তাহা শুধু যেকের অভ্যাস করার দ্বারা সাধিত হয় না, বরং যেকেরের সহিত এবাদতের সমাবেশ হইলে সেই খাছ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আর যদি ইহাই মানিয়া লওয়া হয় যে, যেকেরের দ্বারা বান্দার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যায়, তথাপি এতটুকু মানিয়া লওয়া যায় না যে, কেবল মুখে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' উচ্চারণ করা কিংবা যেকের ও মুরাকাবার দ্বারাই যেকেরের কাজ সম্পন্ন হয়; বরং যেকেরের অর্থ আল্লাহ্ তা'আলার এবাদৎ ও আনুগত্য অবলম্বন করা যাহার মধ্যে এই মুখের যেকেরও অন্তর্ভুক্ত আছে। কেননা, মুখের যেকেরও فَاذْكُرُونِي "আমার যেকের কর" নির্দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রকার যেকেরের এক প্রকার। এই কারণেই 'হেছনে-হাছীন' কিতাবে লিখিত আছে, كُلُّ مُطِيعٍ لِلّٰهِ فَهُوَ ذَاكِرٌ "আল্লাহ্‌র প্রত্যেক প্রকারের অনুগত লোকই যাকের বলিয়া গণ্য।" ইহাতে বুঝা যায়, শুধু আলহাম্‌দুলিল্লাহ্, সোব্‌হানাল্লাহ্ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমাগুলির মধ্যে যেকের সীমাবদ্ধ নহে; বরং যে মানুষ যে কাজে আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আনুগত্য সম্পন্ন করিতেছে, সে-ই তৎকালে "যাকের" বলিয়া গণ্য। এই জন্যই তফ্‌সীরকারগণ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ আয়াতের তফ্‌সীরে বলিয়াছেন :

فَاذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرْكُمْ بِالْأَجْرِ وَالرَّحْمَةِ

"তোমরা আনুগত্য দ্বারা আমার যেকের কর, আমি বিনিময় এবং রহমত দ্বারা তোমাদের যেকের করিব।" আপনারা এতটুকু কথা যখন বুঝিতে পারিয়াছেন, এখন আমি বলিতেছি, যে ব্যক্তি শুধু স্মরণ রাখার স্থায়ী ক্ষমতা লাভ করিয়া বিধান ও নির্দেশাবলী পালনে শৈথিল্য করিতেছে সে যেকের ফেকেরও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কেননা, আনুগত্যের নাম যেকের। অথচ এই ব্যক্তি অনুগত নহে। আর যদি আজ-কালের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ইহাকেই যেকের বলা হয়, তবে আমি বলিব, শুধু যেকের পূর্ণ করিলে বান্দার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক স্থাপিত হয় না; বরং সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য এবাদৎ এবং আনুগত্যের প্রয়োজন রহিয়াছে, এখানে তাহা নাই। সুতরাং তাহার সহিত আল্লাহ্ তা'আলার সম্পর্ক নাই। যখন আল্লাহ্ তা'আলারই কোন সম্পর্ক নাই, তখন নেস্‌বত বা সম্বন্ধও

স্থাপিত হয় নাই। কেননা, উভয় পক্ষ হইতে সংযোগ স্থাপিত হওয়ার নাম নেস্‌বত্‌।

অতএব, নিজেকে মুখে "মিলনপ্রাপ্ত ব্যক্তি" বলিয়া দাবী করা তো সহজ, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মিলনপ্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়া বড়ই কঠিন এবং দুর্লভ। এইরূপে মুখে বলিয়া দেওয়া সহজ যে, আমি বেতন গ্রহণ করি না; বরং খোরাক-পোশাক বাবত ভাতা গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত ভাতা বা খোরাক-পোশাকের ক্ষেত্র হওয়া সহজ নহে। এই দাবীর উপযুক্ত হওয়ার জন্য কোন তত্ত্বজ্ঞানীকে নিজের শিরা দেখাও। যদি তিনি বলেন যে, বাস্তবিকই তোমার বেতন খোরাক-পোশাকের ভাতা, তবে তো তোমার অবস্থা পবিত্র। এইরূপে যাহারা শুধু খোদাকে স্মরণ রাখার স্থায়ী ক্ষমতা লাভ করিয়া নিজেকে খোদার মিলন লাভে সফলকাম মনে করিতেছে তাহাদের উচিত কোন তত্ত্বজ্ঞানীকে নিজেদের শিরা দেখান এবং নিজের সম্পূর্ণ অবস্থা ব্যক্ত করা। যদি তিনি বলেন যে, হাঁ তুমি সফলকাম হইয়াছ, তবে ইহাকে নেয়ামত মনে করিয়া শোকরগোযারী করিতে থাক। অন্যথায় নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিও না এবং দুই চারি জন মূর্খ লোক তোমাকে বুযুর্গ মনে করিতেছে এবং বুযুর্গ বলিতেছে দেখিয়া ধোকায় পড়িও না। কবি "সায়েব" কেমন সুন্দর বলিয়াছেন:

بنما ئے بصاحب نظرے گوہر خود را + عیسیٰ نتواں گشت بتصدیق خر چند

"কোন একজন অভিজ্ঞ লোককে নিজের রত্ন দেখাও, বাস্তবিকই ইহা রত্ন? না কাঁচের টুকরা। কেননা, কয়েকটি গাধার সমর্থনে তুমি "ঈসা" হইতে পারিবে না।"

।। পারিশ্রমিক ও খোরাকী-ভাতার প্রভেদ ।।

তা'লীমের বেতন সম্বন্ধে আমার মনে একটি মাপকাঠি আছে। তাহাই আমি প্রকাশ করিতেছি, ইহা ছাড়া কাহারও মনে অন্য কোন মাপকাঠি থাকে তো ভাল কথা, তিনি সেই মাপকাঠির সাহায্যে ভাতা ও পারিশ্রমিকের প্রভেদ নির্ণয় করিয়া নিন। ব্যাপার খোদার সঙ্গে,ইহাতে বাক্-বিতণ্ডা নিরর্থক। আমার মতে পারিশ্রমিকের প্রভেদ নির্ণয় করিবার মাপকাঠি এই যে,যে মুদাররেস্ বেতন গ্রহণ করিয়া পড়াইতেছেন তিনি চিন্তা করিয়া দেখুন, কোন স্থান হইতে যদি অধিক বেতনে তাঁহার তলব হয়, যেমন এখানে তিনি পঁচিশ টাকা পাইতেছেন, অপর এক স্থান হইতে তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকা বেতনে ডাকা হইতেছে অথচ বর্তমানের পঁচিশ টাকায়ই তাঁহার কাজ চলিতেছে। কিন্তু কাজ চলার অর্থ ইহা নহে যে, দৈনিক দশ ছটাক ঘি খাইতে পারেন এবং দুই টাকা গজের মসৃণ কাপড় পড়িতে পান; বরং কাজ চলার অর্থ এই যে, পঁচিশ টাকায় দিনাতিপাত করিতে খুব জাঁকজমক না হইলেও কোন প্রকার কষ্ট

হয় না। এতদ্ভিন্ন অন্যত্র যেখানে তিনি পঞ্চাশ টাকার লোভে যাইতেছেন তথায় ধর্মীয় ফায়দাও এখান হইতে বেশী নহে, তখন দেখা যাউক এই দ্বিগুণ বেতনের লোভে এখানকার খাঁটি ধর্মীয় খেদমত ত্যাগ করিয়া তিনি সেখানে যান কি না। যদি না যান, তবে বুঝিতে হইবে অবশ্যই তিনি যে বেতন গ্রহণ করেন তাহা খোর-পোশের ভাতা, পারিশ্রমিক নহে। আর যদি তিনি অধিক বেতন পাইয়া ধর্মীয় খেদমতের তারতম্য না করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, তবে তাঁহার গৃহীত বেতন পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবে এবং তিনি ভাড়ার টাট্টু ঘোড়ায় পরিণত হইবেন। অবশ্য তাহাতে তিনি গুনাহ্গার হইবেন না। কেননা, শেষ যুগের ওলামায়ে কেরাম তা'লীমের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার ফত্ওয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই তা'লীমের ও শিক্ষা প্রদানের জন্য কোন সওয়াবও পাইবেন না। কেননা, তাঁহার উদ্দেশ্য শুধু বেতন পাওয়া। এমতাবস্থায় তাঁহার এই তা'লীম এবাদৎ বলিয়া গণ্য হইবে না। একান্তপক্ষে ইহাকে একটি জায়েয কাজ বলা যাইতে পারে যাহার উপর শেষ যুগের আলেমগণ বিনিময় গ্রহণ জায়েয হওয়ার ফত্ওয়া দিয়াছেন। যদিও দ্বীনী এল্ম তা'লীম দেওয়া মূলতঃ উচ্চস্তরের এবাদতই ছিল কিন্তু দ্বীনী এল্ম তা'লীম দেওয়া যেহেতু তাঁহার নিয়ত ছিল না; বরং বেতন পাওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, কাজেই لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى "মানুষ যাহা নিয়ত করে তাহাই পায়" হাদীস অনুযায়ী ইনি সওয়াবের উপযোগী হইবেন না।

অবশ্য কোন স্থানে যদি তাঁহার বেতন এত কম হয় যে, উহাতে খুব টানাটানি এবং কষ্টের সহিত দিনাতিপাত হইতেছে অথবা দিন নির্বাহ কোনরূপে হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানে অন্য কোন প্রকারের কষ্ট আছে। যেমন পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা পারস্পরিক হিংসা ও শত্রুতা প্রভৃতি কিংবা এই শ্রেণীর অন্য কোন প্রকার কষ্ট হয়, এমতাবস্থায় অন্যত্র চলিয়া যাওয়া নিন্দনীয় নহে। কেননা, এই ব্যক্তি স্থানান্তরে গমনের উদ্দেশ্য অধিক বেতন পাওয়া নহে; বরং কষ্টের ও অসুবিধার হাত হইতে মুক্তি পাওয়া। অথবা এই স্থানে বেতনও কম এবং এখানে তাঁহার দ্বারা ধর্মের খেদমতও কম হয়। অন্যত্র গেলে বেতনও অধিক পাওয়া যাইবে এবং ধর্মের খেদমতও তথায় তাঁহার দ্বারা অধিক হইবার আশা আছে, এরূপ অবস্থায় অন্যত্র চলিয়া যাওয়া ক্ষতিকর নহে। যদি সত্যই তাঁহার উদ্দেশ্য এই হয় যে, সেখানে গেলে আমি ধর্মের কাজ অধিক করিবার সুযোগ পাইব।

খোদার সংগের ব্যাপার। তাহাতে নিজের নিয়ত বিবেচনা করিয়া স্বয়ং ফয়সালা করা উচিত। যুক্তি প্রদর্শন পূর্বক লোকের সম্মুখে আপনি যদি প্রমাণ করিয়া দেন যে, আপনার গৃহীত বেতন খোরপোশের ভাতা, পারিশ্রমিক নহে, তবে মনে রাখিবেন, খোদার সম্মুখে এই সব যুক্তি কার্যকরী হইবে না।

সূচী-পত্র

॥ এল্‌মের হাকীকত ॥

আমি বলিতেছিলাম, যাহাদের প্রতিভা ভাল এবং তাহারা পাঠ্য তালিকার কিতাব সমাপ্ত করিয়া শিক্ষকতার কাজে লাগিয়া থাকে তাহাদের মধ্যেও সকলের উদ্দেশ্য এল্‌ম্ বৃদ্ধি করা নহে ; বরং কতক লোকের উদ্দেশ্য শুধু বেতন লাভ করাই হইয়া থাকে। আর কতক লোকের উদ্দেশ্য ছাত্রদের মধ্যে সুনাম অর্জন করা। অর্থাৎ, ছাত্রদের মধ্যে এই সুনাম ছড়াইয়া পড়ুক যে, ইনি একজন ভাল শিক্ষক এবং গভীর জ্ঞানী আলেম ও উপযুক্ত শিক্ষক বলিয়া খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ুক। অবশ্য কোন কোন আল্লাহ্‌র বান্দা এমনও আছেন যে, এল্‌মের উন্নতি এবং অধিক জ্ঞান লাভ করাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ লোক পাওয়া যাইবে দশ শ্রেণী হইতে একজন, যাহা দুর্লভ এবং বিরল, উহা না থাকারই শামিল। অতএব, আমার আলোচ্য বিষয় তবুও গুরুত্বপূর্ণ এবং অনুধাবনযোগ্যই রহিল। আমি উহাতে অভিযোগ করিতেছিলাম যে, আমরা অধিক এল্‌ম্ হাছিল করাকে উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করি না। এই কারণে উহার অন্বেষণও কমই করিয়া থাকি। আবার এই অল্প সংখ্যক লোক যাঁহারা অধিক এলম অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাঁহারাও বাহ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক এল্‌মের অন্বেষণকারী। অর্থাৎ, বাহ্যিক এল্‌ম অধিক অন্বেষণ করেন। প্রকৃত এলম ইঁহারাও অধিক অন্বেষণ করেন না। কেননা আজকালকার সাধারণ ভাবধারা প্রকৃত এল্‌ম হইতে শূন্য, তবে উহার অন্বেষণকারী কেমন করিয়া হইবে ?

এখন আমি প্রথমে প্রকৃত এল্‌ম নির্ধারণ করিয়া দিতেছি। অতঃপর আলোচ্য আয়াতটিকে উহার সহিত এইরূপে খাপ খাওয়াইয়া দিব যে, এই আয়াত হইতে প্রকৃত এলম্ অধিক হাছিল করা উদ্দেশ্য হওয়া কিরূপে বুঝা যায়। কিন্তু তৎপূর্বে আমি মোটামুটি ভাবে প্রমাণ করিব যে, অধিক এল্‌ম্ হাছিল করা উদ্দেশ্য কেন ? আল্লাহ্ তা'আলা সূরা-'তোয়া-হা'য়ে বলিয়াছেন : وقل رب زدنى علما এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)কে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে যে, আপনি আপনার জ্ঞান বা এলম্ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ার জন্য আমার কাজে প্রার্থনা করুন। হুযুর (দঃ)-কে যখন এলম্ বৃদ্ধির দোআ করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইয়াছে, তখন ইহাতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এলম্ বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য হুযুর (দঃ)-এর এলম্ সকল মানুষের চেয়ে অধিক ছিল, এতদ্‌সত্ত্বেও যখন তাঁহাকে এল্‌ম্ বৃদ্ধির প্রার্থনা করিতে আদেশ করা হইয়াছে, তখন আমাদের মত লোকের এল্‌ম্ বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য এবং কাম্য কেন হইবে না ? অথচ হুযুরের এল্‌মের সহিত আমাদের এল্‌মের তুলনাই হইতে পারে না।

এখন আমি ঐ আয়াতগুলি দ্বারাও আমার এই বক্তব্য বিষয়টি প্রমাণ করিতে চাই যাহা আমি প্রথমে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু ইতিপূর্বে ইহার ভূমিকাস্বরূপ একটি

কথা বুঝিয়া লওয়া দরকার। হেদায়ত ও এল্মের মধ্যে পরস্পর কি সম্বন্ধ ? যাহা এল্মের হাকীকত তাহা কি হেদায়তের হাকীকত ? না হেদায়ত এবং এল্ম্ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু। হেদায়ত শব্দের অর্থ তালেবে-এল্মগণ খুব ভাল করিয়া জানে। ইহার অর্থ পথ প্রদর্শন করা। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা দুইটি অর্থ বুঝিবার জন্য লোগাতে সৃষ্ট হইয়াছে, একটি অর্থ উপরে বলা হইয়াছে। অপর অর্থ "উদ্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া।" কিন্তু বহু তত্ত্বজ্ঞানীর মতে 'হেদায়ত' শব্দটি উক্ত দুই অর্থের উদ্দেশ্যমূলকভাবে লোগাতে সৃষ্ট হয় নাই ; বরং মূলে তাহা শুধু পথ প্রদর্শন অর্থেই সৃষ্ট হইয়াছে, আর "উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া" উক্ত আভিধানিক অর্থ "পথ প্রদর্শনের"ই একটি শাখা অর্থাৎ অন্য কথায় হেদায়ত শব্দের অর্থ পথ প্রদর্শন করাই বটে, কিন্তু পথ প্রদর্শন দুই প্রকারে হইতে পারে, দুর হইতে পথ দেখাইয়া দেওয়া আর হাতে ধরিয়া নিকটে লইয়া গিয়া দেখাইয়া দেওয়া। এই দ্বিতীয় প্রকারের প্রদর্শনকেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া বলা হয়। অতঃপর বুঝিয়া লউন 'প্রদর্শন' শব্দটি সকর্মক ক্রিয়া ইহার অকর্মকরূপ হইতেছে দর্শন করা। তালেবে এল্মগণ অবগত আছেন যে, দর্শন দুই প্রকার। চোখের দর্শন আর অন্তরের দর্শন। যদি 'পথ প্রদর্শন' বা হেদায়ত অনুভবনীয়রূপে বাহ্যিক করা হয়, তবে প্রদর্শন অর্থ চক্ষু দ্বারা দেখাইয়া দেওয়া। আর যদি হেদায়ত আভ্যন্তরীণ হয়, তবে সেখানে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে দেখাইয়া দেওয়া। আর অন্তরের দর্শনের নামই এল্ম্। সুতরাং হেদায়তের সারমর্ম এল্মের কাছাকাছি বটে। কেননা, আভ্যন্তরীণ হেদায়ত এবং এল্মের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়ত (পথ প্রদর্শন) এবং এইরূপে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) ও কোরআনের হেদায়ত বাহ্যিক ও অনুভবনীয় নহে ; বরং তাহা আভ্যন্তরীণ। সুতরাং এই 'হেদায়ত' নিশ্চিতরূপেই এল্মের অনুরূপ এবং কাছাকাছি। অতএব, কোরআনের কোন আয়াত দ্বারা যদি হেদায়ত বৃদ্ধি উদ্দেশ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে উক্ত আয়াত দ্বারা এল্মের বৃদ্ধি উদ্দেশ্য বলিয়াও প্রমাণিত হইবে।

এখন বুঝিতে চেষ্টা করুন, এসমস্ত আয়াতে হেদায়ত বৃদ্ধি কাম্য হওয়ার কথাই উল্লেখ হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনের গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন : هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ "কোরআন পরহেযগার লোকদের জন্য হেদায়ত।" একথার উপর একটি প্রসিদ্ধ প্রশ্ন এই রহিয়াছে যে, পরহেযগার লোকেরা তো নিজেরাই হেদায়ত প্রাপ্ত। কোরআন তাহাদের জন্য হেদায়ত হওয়ার অর্থ কি ?

এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর হইতে পারে। একটি উত্তর এই যে, এখানে মুত্তাকীন বলিতে বর্তমানের মুত্তকীন উদ্দেশ্য নহে ; বরং যাঁহারা ভবিষ্যতে মুত্তাকীন হইবেন তাঁহারাই উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতের পরিপ্রেক্ষিতে এখন হইতে মুত্তাকীন নাম দেওয়া

হইয়াছে। কিন্তু মুত্তাকীনের মুখ্য অর্থ "বর্তমানের পরহেযগার" গ্রহণ করা সম্ভব হইলে উহাকে বাদ দিয়া "ভবিষ্যতের পরহেযগার" অর্থ গ্রহণ করা নীতি বিরুদ্ধ। সুতরাং অগ্রগণ্য ব্যাখ্যা এই যে, মুত্তাকীন তাহার মূল অর্থেই থাকিবে এবং হেদায়তের বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করা হইবে। কেননা হেদায়তের বহু স্তর রহিয়াছে। এই স্তরগুলির মধ্যে কোন কোন স্তরের হেদায়ত বর্তমান পরহেযগারদের মধ্যেও নাই কোরআন তাহাদিগকে সেসমস্ত স্তরে পৌঁছাইয়া থাকে। এই বর্ণনা হইতে ইহা তো প্রমাণ হইল যে, হেদায়তের বহু স্তর আছে।

এখন রহিল—হেদায়তের আধিক্য কাম্য হওয়ার প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'আলা 'সূরা-ফাতেহা'য় اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ "আমাদিগকে সরল পথ দেখাও।" আয়াতে মুসলমানকে হেদায়ত প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়াছেন। সূরা-ফাতেহার সহিত সূরা-বাক্বারার সামঞ্জস্য এবং সংযোগও রহিয়াছে। সূরায়ে ফাতেহাতে হেদায়তের প্রার্থনা রহিয়াছে আর সূরা বাকারাতে هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ আয়াতে সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন: নাও, একটি হেদায়তের কিতাব ইহা অনুযায়ী চল। আর اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আয়াতের উপর অনুরূপ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, তাঁহারা তো পূর্ব হইতেই হেদায়ত প্রাপ্ত রহিয়াছেন যাঁহাদিগকে হেদায়ত প্রার্থনা করার তা'লীম দিতেছেন। এখানেও এই উত্তরই দেওয়া হইবে যে, হেদায়ত বৃদ্ধির প্রার্থনা করার তা'লীম দেওয়া হইয়াছে। এখন আর هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ আয়াতেও কোন প্রশ্নের অবকাশ রহিল না। কেননা, অন্যান্য কিতাবসমূহ অশিক্ষিত লোককে শিক্ষা দিয়া থাকে—আর এই কিতাব(কোরআন) শিক্ষিত লোকদিগকে শিক্ষা প্রদান করে। অর্থাৎ, ইহা হেদায়ত প্রাপ্ত লোকদের জন্য হেদায়তকারী। আর একথা পূর্বে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন যে, হেদায়ত এবং এল্‌ম প্রায় একই বস্তু। সুতরাং এই আয়াত হইতে যখন হেদায়তের বৃদ্ধি কাম্য হওয়া প্রমাণিত হইল, তখন ইহা দ্বারা এল্‌মের বৃদ্ধি কাম্য হওয়াও প্রমাণিত হইল।

এই বিষয়টি আমি অন্য আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারিতাম। কিন্তু এল্‌ম বৃদ্ধি করার উপকরণসমূহ বর্ণনা করাও আমার উদ্দেশ্য যাহা হইতে তালেবে এল্‌মগণ সম্পূর্ণ অমনোযোগী, অন্যথায় তাহারা সে সমস্ত উপকরণ অবশ্যই অবলম্বন করিত। এতদ্ভিন্ন আমি এলম এবং এলম বৃদ্ধির হাকীকতও বর্ণনা করিতে চাই এবং এই বিষয়গুলি সমবেতভাবে অদ্যকার আলোচ্য আয়াতসমূহে উল্লেখ রহিয়াছে। এই জন্যই প্রথমে আমি এই আয়াতগুলি তেলাওয়াত করিয়াছি। যেহেতু আমি আলেমদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছি সুতরাং অধিক বিস্তারিতভাবে বলার প্রয়োজন মনে করি না। সংক্ষেপে বলিলেও তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট হইবে। অতএব, এখন আমি সংক্ষিপ্তরূপে

এল্‌ম ও এল্‌ম বৃদ্ধির হাকীকত এবং ঐগুলির উপকরণ বর্ণনা করিতেছি। আর এই উদ্দেশ্যে আয়াতগুলিকে প্রথম হইতে তরজমা করিতেছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الم। ইহার অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই অবগত আছেন, আর কেহ জানে না। হয়ত হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলা হইয়া থাকিতে পারে। এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন হরফগুলির অর্থ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। হয়ত আপনারা বলিতে পারেন, তাহাতে তো এল্‌ম বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে, যাহার জন্য আপনি উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। অতএব, প্রথমে ইহাদের অর্থ বলিয়া দিন। অতঃপর এল্‌ম বৃদ্ধির উৎসাহ প্রদান করুন। বিশেষতঃ এলম বৃদ্ধির উপকরণও আপনার জানা আছে। তাহা বলিয়া দেওয়ার ওয়াদাও আপনি এইমাত্র করিয়াছেন। আর যদি উপকরণসমূহ অবগত থাকা সত্ত্বেও আপনি এই অক্ষরগুলির অর্থ না জানেন, তবে ইমাম এবং মুক্‌তাদী উভয়ই তো সমান। কেননা, উভয়ে এল্‌ম বৃদ্ধির ব্যাপারে ত্রুটি করিতেছে।

এই সন্দেহের জবাব দিতে গেলে যেহেতু নিজের জন্য এলম বৃদ্ধির প্রমাণ দেওয়া হয়, কাজেই উত্তর হইতে বিরত হওয়াই ভাল ছিল কিন্তু জবাব না দিলে কেহ মনে করিতে পারেন—আমি ইহার অর্থ জানি। কিন্তু কোন কারণে বর্ণনা করিতেছি না। কাজেই আমি এখন জবাব দিতে বাধ্য এবং পরিষ্কার বলিতেছি যে, আমিও উহার অর্থ জানি না। এই অক্ষরগুলির অর্থ না জানার ব্যাপারে আপনারা এবং আমি সমান। কিন্তু একটি কথা এই থাকিয়া যায় যে, "জানেন না, অনুসন্ধান করিয়া অবগত হউন। অনুসন্ধান না করা তো এল্‌ম বৃদ্ধির পরিপন্থী। ইহার উত্তর এই যে, এলম বৃদ্ধি সম্বন্ধে একটি বিবরণ আছে। নিম্নের এই আয়াতটিতে উহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা ভাল করিয়া স্মরণ রাখিবেন। একটু পরে যাইয়া উক্ত বিবরণটি ইন্‌শাআল্লাহ্ জানিতে পারিবেন। আয়াতটি এই : ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ। ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই বাক্যটিতে কোরআনের প্রশংসা করা হইয়াছে যে, এই কিতাবটি পূর্ণতা গুণ সম্পন্ন। ইহাতে মনে সন্দেহ উৎপন্ন হইবার কোন কথা নাই। (তবে বলিতে পারেন—কাফেরেরা তো ইহাতে নানাবিধ সন্দেহ উত্থাপন করিয়া থাকে। ইহার প্রসিদ্ধ একটি উত্তর তো এই যে, কোরআনের কোন কথাই মূলতঃ সন্দেহের কারণ নহে। উত্থাপনকারীদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থিত হয়—তাহার উৎপত্তিস্থল কোরআনের বিষয়বস্তুগুলি নহে; বরং তাহাদের বোধশক্তির খর্বতাই ইহার কারণ। কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি দিনের বেলায় সূর্যের উদয় সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তবে তাহাতে সূর্যের উদয় সন্দিগ্ধ হইয়া পড়ে না। আর একটি জবাবের প্রতি هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে ইঙ্গিত রহিয়াছে। উক্ত জবাবের সারমর্ম এই যে, কোরআনের প্রতি কাহারও মনে

সন্দেহের উৎপত্তি হইলে তাহা ততক্ষণই থাকিতে পারে যতক্ষণ না সে কোরআনের তা'লীম অনুসারে আমল করে। আর যদি কোরআনের তা'লীম অনুযায়ী পুর্ণরূপে আমল করা হয়, তবে সর্বপ্রকারের সন্দেহ আপনাআপনি দুর হইয়া যাইতে বাধ্য। কেননা, কোরআন মুত্তাকীদের জন্য হেদায়ত। অতএব, সন্দেহকারীদের উচিত কোরআনের তা'লীম অনুসারে আমল আরম্ভ করিয়া দেওয়া— آفتاب آمد دلیل آفتاب "সূর্যই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ।" আমল করার পরে বুঝা যাইবে যে, কোরআন আদ্যোপান্ত হেদায়তই হেদায়ত। উহাতে কোন বিষয়েই সন্দেহের কারণ নহে।)

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতটির সহিতই আমার বক্তব্য বিষয়টি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। তাহা আমি পুর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। আমি প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, এই আয়াতটি হইতে হেদায়ত বৃদ্ধি বুঝা যাইতেছে এবং اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতটিকে ইহার সহিত মিলাইলে তাহা কাম্য হওয়া প্রমাণিত হয়। এখন বাকী রহিল এল্‌ম এবং এল্‌ম বৃদ্ধির উপকরণের বর্ণনা। هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতটির মধ্যে তৎপ্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। কেননা, ইহার তরজমা—"কোরআন হেদায়তকারী মুত্তাকীদের জন্য।" আর এখন জানিতে পারিয়াছেন যে, এখানে মূল হেদায়ত উদ্দেশ্য নহে। কেননা, মূল হেদায়ত তো মুত্তাকীদের মধ্যে পুর্ব হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছে; বরং অধিক হেদায়তই উদ্দেশ্য। ইহাতে বুঝা যায় যে, অধিক হেদায়ত এবং অধিক এল্‌ম মুত্তাকীদেরই হাছিল হইয়া থাকে এবং ইহা হইতে হেদায়ত বৃদ্ধির কারণও বুঝা গেল যে, তাহা তাক্ওয়া অর্থাৎ, পরহেযগারী। (কেননা, বালাগতের কায়েদা এই যে, কোন হুকুমকে কোন গুণবাচক অর্থের সহিত সংলগ্ন করিলে হুকুমটির মধ্যে সেই গুণবাচক অর্থটির সম্পর্ক থাকে? যেমন:

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا

অর্থাৎ, চুরির কারণেই তাহাদের হাত কাটার নির্দেশ আসিয়াছে। আরও যেমন: اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ অর্থাৎ, কুফরীর কারণেই তাহাদের জন্য দোযখের অগ্নি প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ হইতে ইহাও জানা গিয়াছে যে, এল্‌মের হাকীকত কি? অর্থাৎ, যাহা 'তাক্ওয়ার দ্বারা বৃদ্ধি পায় তাহাই প্রকৃতপক্ষে এল্‌ম। কেননা, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাক্ওয়া দ্বারা বাহ্যিক এল্‌ম বৃদ্ধি পায় না। তাক্ওয়ার দ্বারা কখনও তফ্‌সীরে মাদারেক এবং তফ্‌সীরে বায়যাবী খতম হয় না। সুতরাং বুঝা গেল যে, এল্‌মের হাকীকত এমন একটি বস্তু যাহা বাহ্যিক এল্‌ম হইতে স্বতন্ত্র, তাহা কেবল তাক্ওয়া দ্বারাই বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিতাব পড়িলে লাভ করা

যায় না। এখন হইতে ঐ সমস্ত লোকের ভুল প্রকাশিত হইয়া পড়িল যাহারা শুধু বাহ্যিক এল্‌ম বৃদ্ধিরই অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় এবং এল্‌মের হাকীকত হইতে সম্পূর্ণ গাফেল ও অমনোযোগী।

॥ কোরআন বুঝা ॥

এখন দেখিতে হইবে, সেই এল্‌মের হাকীকত বস্তুটি কি ? তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে। যাঁহারা হাদীসে অভিজ্ঞ তাঁহারা এ সম্বন্ধে অবগত আছেন।

বোখারী শরীফে হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহু হইতে রেওয়ায়ৎ আছে, তাঁহার খেলাফতের সময় কতক লোক একথা প্রচার করিয়াছিল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) তাঁহাকে কিছু খাছ এল্‌ম দানকরিয়া গিয়াছেনযাহা অন্য কাহাকেও শিখাননাই। মজার কথা এই যে, তাসাউফের কোন কোন কিতাবেও লিখা আছে যে, মে'রাজের রাত্রিতে হুযুর (দঃ)কে নব্বই হাজার এল্‌ম প্রদান করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে তিনি ত্রিশ হাজার এল্‌ম সর্বসাধারণকে বলিয়া দিয়াছেন। ত্রিশ হাজার এল্‌ম খাছ খাছ ছাহাবীদিগকে শিখাইয়াছেন আর ত্রিশ হাজার এল্‌ম শুধু হযরত আলী (রাঃ)কে দান করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটি লম্বা কেস্‌সাও আছে যে, হুযূর (দঃ) প্রথমে হযরত আবু বকর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন : 'তোমাকে সেই খাছ এল্‌ম শিখাইলে তুমি কি করিবে ?' তিনি বলিলেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমি খুব এবাদৎ করিব, জেহাদে সচেষ্ট থাকিব।' হুযূর (দঃ) বলিলেন : তুমি উক্ত খাছ এল্‌মের উপযুক্ত নও। نعوذ با لله অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি জবাব দিলেন, আমি অন্যান্য লোকদিগকে হেদায়ত করিব এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হইব।" হুযূর (দঃ) বলিলেন : "তুমিও ইহার উপযুক্ত নও।" অতঃপর হযরত ওসমান (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও এমনি একটা কিছু উত্তর দিলেন। তিনিও অনুপযুক্ত সাব্যস্ত হইলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : 'আমি মানুষের রহস্যসমূহ গোপন রাখিব।' ইহাতে হুযূর (দঃ) বলিলেন, হাঁ, তুমি উপযুক্ত। অতঃপর তিনি তাঁহাকে সেই ত্রিশ হাজার এল্‌ম দান করিলেন। কেহ খুব অবসর সময়ে বসিয়া কেস্‌সাটি রচনা করিয়াছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা দরকার যে, মে'রাজে হুযূরের সঙ্গে যে এত কথা হইয়াছিল, তুমি কি তাহা আড়ালে থাকিয়া শ্রবণ করিতেছিলে, যাহাতে তুমি একেবারে উহার সংখ্যা পর্যন্ত জানিয়া লইয়াছ ?

একজন বুযুর্গ লোককে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আল্লাহ্ তা'আলা মে'রাজে হুযূরের সহিত কি কি কথা বলিয়াছিলেন ? তিনি খুব সুন্দর জবাব দিয়াছেন :

اکنون کرا دماغ که پرسد ز باغبان + بلبل چه گفت وگل چه شنید وصبا چه کرد

"এখন কাহার মস্তিষ্কে কুলাইবে যে,বাগানীকে জিজ্ঞাসা করে—বুলবুল কি বলিল, ফুল কি শুনিল এবং প্রাতঃসমীরণ কি করিল ?"

মোটকথা, হযরত আলী (রাঃ) সম্বন্ধে তাঁহার জীবিত কালেই লোকে এরূপ ধারণা করিতেছিল যে, তাঁহাকে কিছু খাছ এল্‌ম দান করা হইয়াছে, এরূপ ধারণা করার কারণ এই ছিল যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখ হইতে মা'রেফাৎ এবং হেকমতের কথা প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পাইত। ইহাতে লোকে এরূপ ধারণা করিয়াছিল। অতঃপর কেহ কেহ স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল :

هَلْ خَصَّكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَىْءٍ دُوْنَ النَّاسِ -

"হুযূর (দঃ) অন্যান্য মুসলমানদের ছাড়া একাকী আপনাকে বিশেষ করিয়া কোন কিছু দান করিয়াছেন কি ?" তিনি উহার দুইটি উত্তর দিয়াছিলেন :

(১) لَا اِلَّا مَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ

"না কখনই না, এই চটিগ্রন্থে লিখিত বিষয়গুলি ছাড়া আর কিছুই না (উক্ত গ্রন্থে ছদকা এবং দিয়াৎ সম্বন্ধে কতকগুলি বিধান লিখিত ছিল তাহা যে খাছ তাঁহার জন্য নহে, ইহা সকলেই জানে।"

(২) قَالَ مَا خَصَّنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا فَهْمًا اُوْتِيَهُ الرَّجُلُ فِى الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ, আমাকে কোন খাছ এলম দান করা হয় নাই, কেবল একটি বোধশক্তি ছাড়া, যাহা আল্লাহ্ পাক তাঁহার একজন বান্দাকে কোরআন সম্বন্ধে দান করিয়াছেন। জবাবের সারমর্ম এই—আমা হইতে যে সমস্ত এল্‌ম প্রকাশ পাইতেছে উহার কারণ এই নহে যে, অন্যান্য মুসলমানকে ছাড়া আমাকে খাছ করিয়া কিছু এলম হুযূর (দঃ) দান করিয়া গিয়াছেন ; বরং উহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কোরআন অর্থাৎ দ্বীন সম্বন্ধে এক প্রকার খাছ বোধশক্তি দান করিয়াছেন।

ইহাই এল্‌মের হাকীকৎ। ইহা একমাত্র তাক্‌ওয়া দ্বারা হাছিল হইতে পারে। ইহা সেই ফেকাহ্ যাহা সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) বলিয়াছেন :

فَقِيْهٌ وَّاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ -

"শয়তানের নিকট একজন ফেকাহশাস্ত্রবিদ আলেম এক হাজার আবেদ অপেক্ষা অধিক কঠিন।" এখানে সেই 'ফকীহ' উদ্দেশ্য নহে যিনি ফেকাহ্‌র কিতাব পাঠ করিয়া 'ফকীহ্' হইয়াছেন। কেননা শুধু ফেকাহ্‌র কিতাব পাঠ করিয়া শয়তানের চাল বুঝিতে পারা যায় না ; উহা মা'রেফাত যাহা তাক্‌ওয়া দ্বারা হাছিল হইয়া থাকে। মারেফাত হাছিল হইলেই মারেফাতদার ব্যক্তির জ্ঞানও বোধশক্তি এমন পূর্ণ হইয়া যায় যে, তিনি তদ্দারা শয়তানের সমস্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে পারেন। শয়তান কোন কোন সময় দুনিয়াকে ধর্মের আকারে প্রকাশ করিয়া থাকে। মা'রেফাতদার লোক

তাহার ধোকা বুঝিতে পারিয়া মানুষকে জানাইয়া দেয়। তাহাতে মানুষ ধোকা হইতে রক্ষা পায়। এই কারণেই মা'রেফাতদার ফকীহ্ শয়তানের জন্য অতিশয় কঠিন। এই এল্‌মের ফযীলত সম্বন্ধেই হাদীসে আসিয়াছে: مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

"আল্লাহ্ তা'আলা যাহার ভালাই চাহেন তাহাকে দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন।" এই মৌলিক এল্‌ম কিতাব পড়িয়া হাছিল করা যায় না। কেননা, হুযূর (দঃ) তাঁহার ছাহাবায়ে কেরামের অশিক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে গর্ববোধ করিতেন এবং বলিতেন: اُمَّةٌ اُمِّيُّوْنَ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ "আমরা এমন এক সম্প্রদায়—লেখা পড়াও জানি না হিসাব কিতাবও জানি না।" বলুন, ছাহাবায়ে কেরাম কি লেখা-পড়া করিয়াছেন? কিছুই না; বরং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে তো দস্তখত পর্যন্ত জানিতেন না। কোন কোন ছাহাবী ফতুয়ার প্রয়োজন হইলে তাবেঈনদের হাওয়ালা করিয়া দিতেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও দ্বীনী এল্‌মে তাঁহারা সকলের সেরা ছিলেন। ছাহাবায়ে কেরাম সম্বন্ধে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসঊদ বলিয়াছেন: اَعْمَقُهُمْ عِلْمًا "উম্মতের মধ্যে ছাহাবায়ে কেরামের ধর্মীয় জ্ঞান সকলের চেয়ে অধিক গভীর।" সেই এলম কোন্ এল্‌ম ছিল? মাদ্রাসায় অর্জিত কিতাবী এল্‌ম? কখনই নহে; বরং ইহা ঐ কোরআনের মর্ম উপলব্ধি করার এল্‌ম যাহা হুযূর (দঃ)-এর সাহচর্যের বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা ছাহাবাদিগকে দান করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাদের তাক্‌ওয়ার কারণে আরো উন্নতি হইতে থাকিত। আর ইহাই সেই এল্‌ম যাহা সম্বন্ধে ইমাম শাফেঈ ছাহেব বলিয়াছেন:

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِىْ + فَاَوْصَانِىْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِىْ -

'আমি আল্লামা ওয়াকী-এর নিকট স্মরণ শক্তির অভাবের অভিযোগ করিলে তিনি আমাকে গুনাহের কাজ ত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন।" তাহা কোন্ এল্‌ম গুনাহ্ যাহার প্রতিবন্ধক? তাহা কি কিতাবী এল্‌ম? কখনই নহে। কিতাবী এল্‌ম যাহার স্মরণশক্তি প্রবল সেই অধিক স্মরণ রাখিতে পারিবে। একজন প্রবল স্মরণ শক্তিশালী ফাসেক ও গুনাহ্‌গার ব্যক্তি বড় হইতে বড় পরহেযগার লোকের চেয়ে কোরআন অধিক হেফ্‌য করিতে পারে; বরং আমাদের চেয়ে অধিক দ্বীনী মাসায়েল এবং হাদীসসমূহ কাফেরদেরও আয়ত্ত হইতে পারে। যেমন, বৈরূত শহরে কোন কোন খৃষ্টান আমাদের হাদীস ও ফেকাহ্ শাস্ত্র সম্বন্ধে খুব বড় জ্ঞানী রহিয়াছে। এক ব্যক্তি কোন পরিব্রাজক হইতে শুনিয়া আমার নিকট বলিয়াছে, জার্মানের একটি মাদ্রাসায় ইসলামী এল্‌মের তা'লীম যথারীতি হইয়া থাকে। কোন কামরার নাম 'দারুল ফেক্‌হ্' কোন কামরার নাম 'দারুল হাদীস' এবং সেখানে বোখারী শরীফ, হেদায়া প্রভৃতি সকল

কিতাবই পড়ান হয়, অথচ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সকলেই ঈসায়ী কাফের। আর তাহারা মতভেদযুক্ত মাস্‌আলাগুলিকে খুব বিস্তারিত ব্যাখ্যার সহিত আলোচনা করিয়া থাকেন। কেননা, জার্মান লাইব্রেরীতে আমাদের পূর্ব পুরুষগণের লিখিত বহু দুষ্প্রাপ্য কিতাবসমূহ সঞ্চিত রহিয়াছে—যাহাদের নামও আমরা শুনি নাই।

যাহা হউক, ইমাম শাফেঈ ছাহেব কিতাবী এল্‌ম সম্বন্ধে স্মরণ না থাকার অভিযোগ করেন নাই। ইমাম ওয়াকী-এর উত্তর হইতে বুঝা যায়, শাফেঈ (রঃ) অন্য কোন এল্‌মে স্মরণ শক্তির অভাবের অভিযোগ করিতেছিলেন যাহাতে গুনাহের দখল ছিল। ইহাই প্রকৃত এল্‌ম এবং ইহাই সেই বস্তু যাহার কারণে মুজ্‌তাহিদ্‌গণ মুজ্‌তাহিদ হইয়াছেন। অন্যথায় সুদূর প্রসারী দৃষ্টি এবং অধিক জানাশুনার ব্যাপারে কোন কোন মুকাল্লেদ্‌ কোন কোন মুজ্‌তাহিদের চেয়ে উন্নত হওয়াও সম্ভব। কবি কেমন সুন্দর বলিয়াছেন :

نه هر که چهره برا فروخت دلبری داند + نه هر که آئینه دارد سکندری داند
هزار نکته باریک تر ز مو این جاست + نه هر که سر بتراشد قلندری داند

"চেহরা উজ্জল করিয়া লইলেই চিত্তাকর্ষণ আয়ত্ত হয় না। আয়নার মালিক হইলেই সেকান্দরের ন্যায় জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত হয় না। এই স্থানে চুলের চেয়ে সূক্ষ্ম হাজার হাজার সূক্ষ্ম বিষয় রহিয়াছে। মাথা মুড়াইয়া নেড়েমুণ্ড সাজিলেই দরবেশী আয়ত্ত হয় না।"

বস্‌, এল্‌মের হাকীকত সম্বন্ধে ইহার চেয়ে অধিক সন্ধান আমি দিতে পারি না। হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তি : فَهْمًا أُوتِيَهُ الرَّجُلُ فِي الْقُرْآنِ "একটি বোধ শক্তি যাহা আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন সম্বন্ধে একজন মানুষকে দান করিয়াছেন।" যদিও ক্ষুদ্র একটি শব্দ কিন্তু ইহা অতি বড় কথা যে, সেই বোধ শক্তি কি পদার্থ এবং তাহা কোন্ শ্রেণীর হইয়া থাকে? মানুষের ভাষা ইহার বিবরণ দিতে অক্ষম। তবে উহা উপলব্ধি করিবার একমাত্র পথ এই যে, তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া দেখুন। সত্যিকারের কামালিয়ৎ ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না :

پرسید کسے که عاشقی چیست + گفتم که چو ما شوی بدانی

"এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : আশেকী কি জিনিস? উত্তরে বলিলাম, আমার মত হইলে বুঝিতে পারিবে।"

।। রুচি দ্বারা উপলব্ধির বিষয় ।।

মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) বলিতেন : যে বিষয়টি রুচি দ্বারা উপলব্ধি করার বস্তু তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। দেখুন, কেহ যদি কোন দিন আম না খাইয়া

থাকে আর তাহার সামনে আপনি আমের বিবরণ দিতে থাকেন যে,আম এরূপ সুস্বাদু এবং মিষ্ট, তবে সে বলিবে আম কি গুড়ের মত ? আপনি বলিবেন, না। সে বলিবে : "চিনির মত ? না আঙ্গুর বা আনারের মত ?" আপনি বলিবেন,না। আবারও সে জেদ করিবে : বলুন, আম কেমন বস্তু ? তখন আপনাকে ইহাই বলিতে হইবে যে, ভাই ! আমি উহার বর্ণনা দিয়া তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। তুমি খাইয়া দেখ, নিজেই বুঝিতে পারিবে। তখন তো সে ব্যক্তি আশ্চর্য বোধ করিবে এবং সেকথা বিশ্বাস করিবে না। মনে করিবে এ কেমন কথা! বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু যখন সে আম খাইবে, তখন সেও উহার স্বাদ বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিবে না।

ইহা কেবল আধ্যাত্মিক বা আভ্যন্তরীণ কামালিয়াতের সহিতই খাছ নহে; বরং বাহ্যিক ভাবে অনুভবনীয় পদার্থসমূহের মধ্যেও যে বস্তুর সম্পর্ক রসনা বা রুচির সহিত, ভাষায় উহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না।

জনৈক তুর্কী আমীর লোকের ঘটনা, কোন এক গায়ক তাঁহার মজলিসে কবিতা পাঠ করিতেছিল। তাহার প্রত্যেকটি বয়েতের শেষে نمی دانم نمی دانم "নামী দানাম নামী দানাম" "আমি জানি না, আমি জানি না" শব্দ বারবার আসিতেছিল। যেমন :

گل یا سوسنی یا سرو یا ماهی نمیدانم + ازین آشفته بیدل چه می خواهی نمی‌دانم

সেই তুর্কী আমীর শরাবে মত্ত ছিল, দুই একটি বয়েত সে শ্রবণ করিল, গায়ক যখন সেই "নামী দানাম" বারবার আওড়াইল,তুর্কী তখন তাহাকে এক ঘুষি মারিয়া বলিল, এই "নামী দানাম" কি বলিতেছ।" অর্থাৎ, যাহা জান তাহা বল যাহা জান না তাহা বারবার কেন আওড়াইতেছ ? এই মর্যাদা দিল সে কবিতার। আসলে ব্যাপার ছিল কি ? তাহার কবিতার রুচিই ছিল না। যদি রুচি থাকিত, তবে সে গায়কের এই কবিতা শুনিয়া পাগল হইয়া যাইত। কিন্তু কবিতায় যে ব্যক্তি স্বাদ পায় তাহাকে একটু জিজ্ঞাসা করুন তোকবিতায় কি স্বাদ ? বস্,সে শুধু এতটুকুই বলিবে যে, বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারি না। রুচি না জন্মিবার আগে আপনি বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু রুচি উৎপন্ন হইবার পরে আপনিও বলিবেন : "বর্ণনা করিয়া বুঝাইতে পারিব না।"

এক বুযুর্গ লোকের ঘটনা। তিনি বলিতেন,"এত ওলিআল্লাহ্ এন্তেকাল করিতেছেন, কিন্তু কেহই"আ'লমে বরযখের"(মধ্যলোকের)কোন খবর দিতেছেন না যে, উহা কেমন জগৎ ? অথচ তাঁহাদের মধ্যে এমনও অনেক ওলি আছেন যাঁহারা মৃত্যুর পরেও খবর দিতে পারেন। আচ্ছা; আমি নিশ্চয়ই 'বরযখ' সম্বন্ধে খবর দিব। আমাকে দাফন করার কালে আমার কবরের মধ্যে কাগজ, কলম এবং দোয়াত রাখিয়া দিও, আমি তথাকার যাবতীয় অবস্থা লিখিয়া পাঠাইব। তৃতীয় দিনে তোমরা আমার কবরের নিকট গেলেই, কাগজ, কলম, দোয়াত কবরের উপরে রক্ষিত পাইবে। ফলতঃ সেইরূপই করা হইল, তৃতীয় দিনে মানুষ কবরের নিকটে যাইয়া দেখিল,

ওয়াদা অনুযায়ী কাগজ, কলম প্রভৃতি কবরের উপরে রক্ষিত রহিয়াছে এবং তাহাতে লিখিত আছে প্রকৃত তথ্য ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ জানিতে পারিবে না। ইহার চেয়ে অধিক সন্ধান কেহই দিতে পারিবে না, যাহা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) হাদীস শরীফে বলিয়া দিয়াছেন। কবি সত্যই বলিয়াছেন :

آں راکہ خبر شد خبرش باز نیامد

"যিনি খবর জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে কোনই খবর ফিরিয়া আসিতেছে না।"

প্রকৃত কামালিয়ত সম্বন্ধে বুঝিতে এবং বুঝাইতে চাহিলেও তাহা বাঁকা ক্ষীরের মতই হইয়া পড়িবে। একটি বালক কোন এক জন্মান্ধ হাফেযজীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে দাওয়াত করিল। হাফেযজী জিজ্ঞাসা করিলেন : "কি খাওয়াইবে ?" সে বলিল : "ক্ষীর"। হাফেযজী বলিলেন : "ক্ষীর কেমন বস্তু ?" ছেলেটি বলিল : 'সাদা' হাফেযজী জীবনেও দেখেন নাই—সাদা কি, আর কালা কি ? কাজেই জিজ্ঞাসা করিলেন : "সাদা কিরূপ" ? সে বলিল : "বকের মতন"। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বক কেমন হয় ?" ছেলেটি তাঁহার হাত বাঁকাইয়া বকের গলার মত করিয়া তাহার সামনে নিয়া বলিল : "এইরূপ।" হাফেযজী বালকটির হাতের উপর হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলিলেন : "ভাই! এ ক্ষীর তো বড় বাঁকা, যাও, আমি তোমার দাওয়াত খাইব না। এই ক্ষীর তো আমার গলায়ই আট্‌কিয়া পড়িবে।"

দেখুন, ক্ষীরের গুণাগুণ ও স্বাদ রুচীর সহিত সংশ্লিষ্ট। কাজেই ভাষায় তাহা বুঝান গেল না এবং ব্যাপার কোথায় হইতে কোথায় গিয়া গড়াইল। ইহার সোজা উত্তর এই ছিল যে, হাফেযজী! এক লোকমা মুখে লইয়া দেখুন ক্ষীর কেমন হয়। বস, আমি ইহাই বলিতেছি যে, তাক্‌ওয়া দ্বারাই এল্‌মের হাকীকত বুঝা বা জানা যাইতে পারে। ভাষায় আপনারা উহার হাকীকত বুঝিতে পারিবেন না। অতএব, তাক্‌ওয়া অবলম্বন করিয়া দেখিয়া লউন।

॥ খোদা-প্রদত্ত এল্‌ম ॥

হাঁ, সন্ধান দেওয়ার জন্য আমি এতটুকু বলিতেছি যে, এলমের হাকীকত যাহার আয়ত্ত হয়, গায়েব হইতে তাহার অন্তরে সে সমস্ত এল্‌ম অবতীর্ণ হইয়া থাকে যাহা কিতাবে পাওয়া যায় না। মাওলানা বলেন :

علم چوں بر تن زنی مارے شود + علم چوں بر دل زنی یارے شود
بینی اندر خود علوم انبیاء + بے کتاب و بے معید و اوستا

এল্‌ম এমন বস্তু দেহে ধারণ করিলে সাপ হয়। আর হৃদয়ে ধারণ করিলে বন্ধু হয়। (আল্লাহ্‌র সুদৃষ্টি হইলে) নিজের মধ্যে আম্বিয়াদের এল্‌ম দেখিতে পাইবে কিতাব, দিশারী এবং ওস্তাদ ব্যতীত।"

ইহাতে বুঝা যায়, ঐ সমস্ত এল্‌ম খোদা-প্রদত্ত, উপার্জনীয় নহে। এসম্বন্ধে একটি রেওয়ায়েতে আসিয়াছে, مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ عَلَّمَهُ اللّٰهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ "যে ব্যক্তি যাহা জানে তদনুষায়ী আমল করে, আল্লাহ্ তাহাকে এমন বিষয়ের জ্ঞান দান করেন যাহা সে জানে না।" আজকাল লোকে বেশী জানা শুনাকেই এল্‌ম মনে করিয়া থাকে। অথচ এল্‌ম এবং জানা বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জ্ঞান আর জানা বিষয় এই দুইয়ের মধ্যে এক বিচিত্র প্রভেদ হযরত মাওলানা কাসেম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন। একবার তিনি বলিয়াছেন: "সকলে হযরত হাজী ছাহেব কেব্‌লার ভক্ত হইয়াছে তাঁহার পরহেযগারী, কিংবা অত্যধিক এবাদত কিংবা বুযুর্গী দেখিয়া, আর আমি ভক্ত হইয়াছি তাঁহার এল্‌ম দেখিয়া। ইহা শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্মিত হইল। হাজী সাহেব কেবলার মধ্যে এত এল্‌ম কোথায় যে, মাওলানা কাসেম ছাহেব তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন। বাহ্য দৃষ্টিতে তো মাওলানার এল্‌ম হযরত হাজী ছাহেব অপেক্ষা অধিক ছিল। হাজী ছাহেব তো কেবল 'কাফিয়া' কিতাব পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহার এল্‌মের অবস্থা এইরূপ ছিল যে, কাফিয়া পড়িবার কালেই মেশ্‌কাত শরীফের সবকে বসিয়া পড়িতেন। 'মেশ্‌কাত' মৌলবী কালান্দার জালালাবাদী ছাহেব পড়াইতেন। সবকের পরে ছাত্রদের মধ্যে কোন হাদীসের মতলব সম্বন্ধে মতভেদ হইলে হাজী ছাহেব উহার ছহীহ্ মতলব বলিয়া দিতেন। কোন কোন সময়ে ছাত্রগণ হাজী ছাহেবের সহিত বিতর্ক জুড়িয়া দিত "না এই অর্থ নহে" এবং তর্কে তাঁহাকে দমাইয়া রাখিত। কেননা, তর্ক করা হযরত হাজী ছাহেবের অভ্যাসের বাহিরে ছিল; কিন্তু মৌলবী কালান্দার ছাহেব যখন এই মতভেদ সম্বন্ধে অবগত হইতেন, তখন সর্বদা হাজী ছাহেবের কথাকেই ছহীহ্ বলিয়া মত প্রকাশ করিতেন। এইরূপে একবার মাওলানা শেখ মোহাম্মদ ছাহেবের সহিত মস্‌নবীর একটি বয়েতের মতলব সম্বন্ধে তাঁহার মতভেদ হইল। হাজী ছাহেবের বর্ণিত অর্থ তখন তো মাওলানা শেখ মোহাম্মদ মানেন নাই। কিন্তু একবার মস্‌নবীর সবকে সেই বয়েতটি আসিলে ওস্তাদজী হাজী ছাহেবের বর্ণিত অর্থই বলিলেন। হাজী সাহেব হুজ্‌রা হইতে বাহির হইয়া মাওলানা শেখ মোহাম্মদকে সালাম করিলেন। মাওলানা তখন স্বীকার করিলেন যে, আমারই ভুল ছিল। এখন ভাবিয়া দেখুন, হাজী ছাহেবের মধ্যে কোন্ এল্‌ম ছিল? ইহাই সেই প্রকৃত এল্‌ম, তাক্‌ওয়ার বদৌলতে হাজী ছাহেব যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একথাই মাওলানা কাসেম ছাহেব বলিতেন যে, এল্‌মের কারণে আমি হাজী ছাহেবের ভক্ত হইয়াছি। মানুষ উহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এল্‌ম এক বস্তু আর জানা জিনিষ আর এক বস্তু। আর এই প্রভেদও বর্ণনা করিয়াছেন

যে, দেখ, এক হইল দর্শন করা, আর এক হইল দর্শনীয় বস্তুসমূহ, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, এক ব্যক্তি ভ্রমণ বহুত করিয়াছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি খুব দুর্বল, আর এক ব্যক্তি ভ্রমণ খুব কমই করিয়াছে, কিন্তু তাহার দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর। অতএব দেখুন, যে ব্যক্তি দুর্বল দৃষ্টি শক্তি লইয়া অনেক ভ্রমণ করিয়াছে সে দর্শনীয় বস্তু-তো অনেক বেশী দেখিয়াছে, কিন্তু দর্শনীয় কোন বস্তুরই পূর্ণ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে নাই। কেননা, সে কোন বস্তুকেই ভাল রকম দেখিতে পারে নাই। প্রত্যেক বস্তুকেই সাধারণ ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখিয়াছে। পক্ষান্তরে যাহার দৃষ্টি প্রখর এবং ভ্রমণ বেশী করে নাই তাহার দর্শনীয় বস্তুর সংখ্যা যদিও কম, কিন্তু সে যে বস্তুর প্রতিই দৃষ্টি করে উহার পূর্ণ তথ্য জানিয়া লয়। আমাদের ও হাজী ছাহেবের মধ্যে এই প্রভেদ। আমাদের জানা বিষয় তো অনেক, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আর হাজী ছাহেবের জানা বিষয়ের সংখ্যা যদিও কম কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি অতিশয় প্রখর। কাজেই তাঁহার এল্‌ম্ যে কতটুকু আছে তাহা সম্পূর্ণই সঠিক এবং পূর্ণ। তিনি প্রত্যেকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকেন, আর আমরা গূঢ় তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছিতে পারি না।

এই প্রভেদটি একবার তিনি এরূপও বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমাদের মনে প্রথমতঃ কোন বিষয়ের প্রাথমিক বিষয়গুলি উদিত হয়। অতঃপর উহাদের সমন্বয়ে ফল বা শেষ সিদ্ধান্ত আপনাআপনি প্রকাশিত হয়। কখনও তাহা সঠিক হয়, কখনও বা ভুল হয়। আর হাজী ছাহেবের মনে প্রথমেই ফল বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ পায় এবং তাহা নির্ভুল ও সঠিকভাবেই প্রকাশ পায়। আর প্রাথমিক বিষয়গুলি উহার অধীন হইয়া পরে উদিত হয়। মোটকথা, যেমন দর্শনীয় বস্তুর সংখ্যা অধিক হওয়ার নাম দর্শন নহে, তদ্রূপ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংখ্যা অনেক হওয়ার নাম জ্ঞান নহে; বরং যেই সুষ্ঠু ও শক্তিশালী বোধশক্তির সাহায্যে সঠিক ও নির্ভুল সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি পৌঁছা যায় তাহাই এল্‌ম, ইহাই এল্‌মের হাকীকত। যাহা শুধু পড়িয়া ও পড়াইয়া লাভ করা যায় না; বরং উহার আরও অনেক উপকরণ রহিয়াছে।

॥ তাক্‌ওয়ার হাকীকত ॥

তন্মধ্যে একটি উপকরণ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাকওয়া প্রাপ্তির দোআ করা যাহা اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ আয়াতে উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় উপকরণ তাক্‌ওয়া যাহা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ আয়াতে উল্লেখ আছে। আর তাকওয়ার অর্থ এই নহে যে, যেকের ফেকের এবং মুরাকাবা করা। ইহা তো তাক্‌ওয়ার অলঙ্কার মাত্র। তাকওয়ার হাকীকত

অন্যকিছু. তাহা আল্লাহ্ তা'আলা হইতেই জানিয়া লউন। আল্লাহ্ তা'আলা এই-স্থানেই তাক্‌ওয়ার হাকীকতও বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُونَ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ●

"তাহারাই মুত্তাকী যাহারা গায়েবের উপর ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, আর যাহাকিছু আমি তাহাদিগকে রেযেক দানকরিয়াছি তাহা হইতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে। আর ঐ সমস্ত লোক যাহারা আপনার নিকট অবতারিত কিতাবের উপর এবং আপনার পূর্ববর্তীকালে অবতারিত কিতাবসমূহের উপর ঈমান রাখে এবং তাহা-রাই আখেরাতে বিশ্বাস রাখে।" এস্থলে আল্লাহ্ তা'আলা আকায়েদ এবং 'এবাদতে বদনিয়াহ্ ও মালিয়াহ্' (এবং কারবারের) মূলনীতি বর্ণনা করিয়াছেন। (পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের উল্লেখ করিয়া এ দিক ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, মুসলমানদের গোঁড়া ও হটকারী হওয়া উচিত নহে। কেবল সেই কিতাবই মান্য করিবে যাহার সম্পর্ক তাহাদের নিজেদের সহিত আছে। আর যে কিতাবগুলির সম্পর্ক অপরের সহিত তাহা মান্য করিবে না, এমন হওয়া উচিত নহে। মুসলমানদের উচিত ন্যায়বান এবং মধ্যমপন্থী হওয়া। অর্থাৎ, যে কিতাবেরই যতটুকু কথা এই ধর্মের দৃষ্টিতে সত্য তাহা মান্য করিবে। অতএব, ইঞ্জীল ও তাওরাত যদিও আমলের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সহিত কোন সম্পর্ক নাই কিন্তু এতটুকু কথা তো সত্য যে, এই কিতাবগুলি ইহুদী ও নাছারা সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ হইতে নাযেল হইয়া-ছিল। অতএব, উহাকে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না ; বরং সেগুলিকেও আল্লাহ্‌র অবতারিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিবে। অবশ্য ইহুদী নাছারারা উক্ত কিতাব-সমূহে নিজেদের মনগড়া যে পরিবর্তন করিয়াছে তাহা অবশ্যই অবিশ্বাস করিতে হইবে। এই শিক্ষার ভিতর দিয়া মুসলমানদিগকে ন্যায়নিষ্ঠা ও মধ্যম পন্থা অবলম্বনের জন্য তাকীদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ, অমুসলমানরা বিরোধিতায় সীমা ছাড়াইয়া যাইবে না এবং ইহা সমস্ত দুনিয়াবী কারবারের আসল নীতি।)

সারকথা এই যে,তাহারাই মুত্তাকী যাহারা ধর্মে-কর্মে পূর্ণ ও ত্রুটিহীন। তাহাদের আকায়েদও শুদ্ধ হয়। দৈহিক ও আর্থিক এবাদতে (এবং কাজে কারবারেও) কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি না হয় এবং ইহাই ধর্মকর্মে পূর্ণ হওয়ার সারমর্ম। এই তফসীর তখনই শুদ্ধ হইতে পারে, যখন الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ الخ কথাটিকে মুত্তাকীন

শব্দের ব্যাখ্যাকারী বিশেষণ বলা হইবে। তাহা না হইলেও আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। কেননা, আমারউদ্দেশ্য—তাক্ওয়া হইল এল্ম বৃদ্ধির উপকরণ। এখন যদি এই আয়াতে উল্লেখিত সবগুলি বিষয়ের সমষ্টিই তাকওয়া হয় কিংবা যদি বর্ণিত বিষয়গুলির সমষ্টি হইতে যে একটি অবিমিশ্র অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহাকেই তাকওয়া বলা হয়—যাহা 'মুত্তাকীন' শব্দ হইতে বুঝা যাইতেছে—সে বিষয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আমার নাই। ইহা সুস্পষ্ট কথা যে, তাকওয়ার জন্য সর্বপ্রকারের গুনাহের কাজ হইতে দূরে থাকা আবশ্যক এবং তাহা তখনই সম্ভব হইতে পারে, যখন শরীয়তের যাবতীয় নির্দেশ মানিয়া চলা হয়। কেননা, নির্দেশিত কার্য ত্যাগ করাও গুনাহের কাজ। এই গুনাহ বর্জন করা অর্থাৎ উক্ত নির্দেশাবলী পালন করা তাক্ওয়ার জন্য জরুরী। এখন তাক্ওয়াকে অনেকগুলি বিষয়ের সমষ্টি মনে কর কিংবা একটি অবিমিশ্র বস্তু মনে কর। অস্তিত্ব বিশিষ্ট মনে কর কিংবা অস্তিত্ব বিহীন মনে কর, উহার জন্য আকায়েদ, আমল: এবং কারবার বিশুদ্ধ থাকা সকল অবস্থায়ই জরুরী। ইহাকে তাক্ওয়ার শর্তই মনে করা হউক কিংবা তাক্ওয়ার অংশ মনে করা হউক। কিন্তু অন্য একটি আয়াতের মর্মে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে,

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ الخ

মুত্তাকীন শব্দের ব্যাখ্যাকারী বিশেষণ এবং এ সমস্ত কার্য তাকওয়ার মৌলিক অর্থের অন্তর্ভুক্ত, যদিও আভিধানিক অর্থে তাকওয়া একটি অস্তিত্ববিহীন বিষয়; কিন্তু শরীয়-তের ব্যবহারিক অর্থে অস্তিত্ববিহীন নহে; বরং শরীয়তে তাক্ওয়ার অর্থ ধর্ম-কর্মে পূর্ণতা। ইহাই অন্য একটি আয়াতের দ্বারা বুঝা যাইতেছে; সেই আয়াতটি এই :

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيّٖنَ -

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরান নেক কাজ নহে; বরং নেককার সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্, পরকালের দিন, ফেরেশ্তা, কিতাব এবং নবীগণের সত্যতার উপর ঈমান রাখে।" এপর্যন্ত আকায়েদেরই উল্লেখ হইয়াছে এবং তফ্সীরকারকগণ একথায় একমত আছেন যে, بِرٌّ শব্দের অর্থ بِرٌّ كَامِلٌ অর্থাৎ, পূর্ণ নেককাজ। পূর্ণ নেক কার্যের এক অংশ আকায়েদ দুরুস্ত করা। অতঃপর বলিতেছেন :

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ -

"আর আল্লাহ্‌র মহব্বতে মাল দান করে নিকট-আত্মীয়গণকে, এতিমদিগকে, মিস্‌কিনদিগকে, মুসাফিরকে, ভিক্ষুক বা প্রার্থীদিগকে "এবং গোলাম আযাদ করার ব্যাপারে।"

এখানে মালের হকসমূহ এবং সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থার কথা উল্লেখ হইয়াছে। আরও বলিয়াছেন : وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ "এবং নামায কায়েম করিল এবং যাকাত আদায় করিল।" ইহাতে এবাদতে বদনী ও মালী-এর উল্লেখ করা হইয়াছে।

وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ -

"আর ওয়াদা পালনকারিগণ যখন তাহারা ওয়াদাবদ্ধ হয়, আর আপদে বিপদে ও যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় ছবরকারীগণ।" ইহাতে আখলাক সম্বন্ধীয় নীতির উল্লেখ হইয়াছে। মোটকথা, বাহ্যিক আমলসমূহ, দৈহিক ও আর্থিক এবাদত এবং অন্তরের আকীদা সম্বন্ধীয় কাজ প্রভৃতি সবকিছুই এই আয়াতে বিদ্যমান রহিয়াছে। এসমস্ত বর্ণনা করিয়া পরে বলিতেছেন :

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ -

"এসমস্ত লোকই খাঁটি এবং এসমস্ত লোকই মুত্তাকী।" ইহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে, উপরোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত গুণাবলীতে যাহারা বিভূষিত তাঁহারাই মুত্তাকী। অতএব, প্রমাণিত হইল যে, ধর্ম-কর্মে পূর্ণতা লাভ করাই তাকওয়ার হাকীকত আর আকায়েদ বিশুদ্ধ রাখা, দৈহিক এবং আর্থিক এবাদত পালন করা, কারবার ও সামাজিক আচার ব্যবহার দুরুস্ত রাখা এসমস্ত উহার অংশ। এখন পরিষ্কার হইয়া গেল যে, ধর্ম-কর্মে পূর্ণতা লাভের অর্থে মুত্তাকী শব্দটি অস্পষ্ট।

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ الخ

আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলি উহার অস্পষ্টতা ব্যঞ্জক গুণ বা বিশেষণ। অতএব, দেখিতে পাইলেন যে, শুধু যেকের এবং ওযীফা ও মুরাকাবার নাম তাক্‌ওয়া নহে। ইহা তাক্‌ওয়ার অলঙ্কার; বরং এই আয়াতে বর্ণিত কার্যাবলী পালন করার নামই তাক্‌ওয়া। এখন সারকথা এই দাঁড়ায় যে, ধর্ম-কর্মে কামেল (পূর্ণ) হওয়ার নাম তাক্‌ওয়া। অতএব, هدى للمتقين বাক্যের সারমর্ম এই যে, ধর্ম-কর্মে পূর্ণতা লাভ হইলে হেদায়ত ও এল্‌ম বৃদ্ধি হয়। তালেবে এল্‌মগণ এদিকে আদৌ গুরুত্ব প্রদান

করে না। তাহারা এবিষয়ে সীমাহীন ত্রুটি করিয়া থাকে। এই ত্রুটিসমূহের ব্যাখ্যা আমি কত করিব ? এবং কোন্ কোন্ বিষয় বর্ণনা করিব ? তাহাদের মধ্যে কেহ দুই সপ্তাহের জন্য কোন তত্ত্বজ্ঞানীর সংসর্গে থাকুক এবং তাঁহার নিকট সংশোধনের আবেদন করুক। আর সেই মহাজ্ঞানী তত্ত্ববিদ বিনা দ্বিধায় তাহার দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করিতে থাকুন, তখন সে তাহার ত্রুটিসমূহের হাকীকত বুঝিতে পারিবে।

॥ তাক্ওয়ার দৃষ্টান্ত ॥

তাকওয়ার একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিতেছি। লক্ষৌতে আমার নামে একটি বিয়ারিং কার্ড আসিল। আমি উপস্থিত ছিলাম না। আমার বন্ধুগণ তাহা ফেরত দিলেন। তাঁহারা ধারণা করিলেন, প্রাপক হয়ত গ্রহণ নাও করিতে পারেন। ডাক-পিয়ন তাঁহাদিগকে বলিল : আপনারা ইচ্ছা করিলে ইহা পড়িতে পারেন এবং প্রাপককে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে অবহিত করিতে পারেন। অতএব, আপনারা ইহা পাঠ করিয়া ফেরত দিন। আমার বন্ধুরা বলিল : ইহা তো জায়েয নাই। কেননা, আমরা পাঠ করিলে তো উহা দ্বারা উপকৃত হইলাম, উপকার লাভের পর তো আর ফেরত দেওয়ার অধিকার থাকে না।

বলুন, তখন কার্ডটি পড়িয়া লওয়ার বাধা কি ছিল, যখন ডাক পিয়ন স্বয়ং অনুমতি দিতেছিল ? শুধু খোদার ভয় বারণ করিতেছিল। পরন্তু খোদার ভয় হইতেই তাকওয়া লাভ হইয়া থাকে। খোদার ভয়ের অভাব রহিয়াছে বলিয়াই তালেবে এল্মদের মধ্যে তাকওয়ার অভাব। আজকালকার অবস্থা তো এইরূপ যে, যে কাজ করিবার ইচ্ছা হয় তাহাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া জায়েয করিয়া লওয়া হয়। যদিও অন্তর জানে যে, ইহা নাজায়েয। কেহ কেহ মনে করে, আমাদের পীর ও ওস্তাদ ছাহেবান খুব নেক কাজ করিয়া থাকেন। আমাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে মাফ করিয়া দেওয়া হইবে। কিয়ামতের দিন তাঁহারা আমাদিগকে মাফ করাইয়া লইবেন। ইহা তো ঠিক সেইরূপ হইল : যেমন নাছারা ও ইয়াহুদীদের অবস্থা :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاءُهٗ -

"আর ইয়াহুদী এবং নাছারারা বলে, আমরা আল্লাহ্র পুত্র এবং প্রিয় জন।" তাহারা নবীর বংশধর এবং আলেম হওয়ার জন্য গর্বিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের গর্ব ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছেন। তোমরা কি এই হাদীসটি শুন নাই ?

وَيْلٌ لِّمَنْ لَا يَعْلَمُ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِّنَ الْوَيْلِ وَوَيْلٌ

لِّمَنْ يَعْلَمُ وَلَا يَعْمَلُ سَبْعٌ مِّنَ الْوَيْلِ ـ

"অর্থাৎ, জাহেলের জন্য একটি শাস্তি, আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহাকে আলেম করিতে পারেন। আর যে আলেম এল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না তাহার সাত গুণ শাস্তি।" এই হাদীসটি অনুযায়ী আমল করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা কি অপর কোন মানব জাতি সৃষ্টি করিবেন ? এ সমস্ত শিক্ষা কি আমাদের জন্য নহে ?

।। তালেবে এল্‌মদের ত্রুটি ।।

তালেবে এল্‌মদের মধ্যে একটি ত্রুটি এই যে, শ্মশ্রু গোঁপ বিহীন অল্প বয়স্ক বালকদের প্রতি দৃষ্টি করার ব্যাপারে এবং তাহাদের সহিত মেলামেশা করার ব্যাপারে আত্মরক্ষা করিয়া চলে না। অথচ ইহা তাক্‌ওয়ার জন্য হলাহল বিষতুল্য। আখেরাতের কঠিন শাস্তি তো আছেই তদুপরি দুনিয়াতেও ইহাতে আলেমদের খুব দুর্নাম হয়। দ্বীনী এল্‌ম শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

আর এক ত্রুটি তাহারা চাঁদা উশুল করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করে না। মর্যাদাশালী লোকের দ্বারা চাপ দেওয়া হয়, তাঁহারা চাঁদা উশুল করেন।

আর এক ত্রুটি এই যে, তালেবে এল্‌মগণ ওস্তাদের সহিত আদব রক্ষা করিয়া চলে না। যে সমস্ত ওস্তাদের আদব করে তাহা ওস্তাদ হিসাবে নহে ; বরং বুযুর্গী এবং খ্যাতির কারণে। ওস্তাদ হওয়ার জন্য যদি ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, তবে যে সমস্ত ওস্তাদ বিখ্যাত ও বুযুর্গ নহেন এবং সমাজের গণ্যমান্য লোক নহেন তাঁহাকেও শ্রদ্ধা করা হইত। কেননা, ওস্তাদের সম্মান পাওয়ার অধিকার তাঁহারও আছে।

কানপুর শহরের কোন এক মাদ্রাসার জনৈক ছাত্র নিজে আমার কাছে বর্ণনা করিয়াছে যে, এবৎসর ওস্তাদ ছাহেব আমাকে "তাহরীহ্" নামক কিতাবটি পড়িতে বলিয়াছেন, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার মুখ দিয়া 'শরহে চেস্‌মণী' কিতাবের নাম বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, তাই উহার উপরই আমি জেদ ধরিলাম এবং শেষ পর্যন্ত তাহাই পড়িয়া ছাড়িলাম।

এইরূপে আর এক মাদ্রাসায় কোন কিতাব খতম হওয়ার পরে তালেবে এল্‌মগণের এবং ওস্তাদের রায় হইল 'শামসে বাযেগাহ্' আরম্ভ করা হউক। একজন তালেবে এলমের মত হইল,না 'ছদ্‌রা হওয়া উচিত। যাহা হউক মতাধিক্যে 'শামছে বাযেগাহ্' মঞ্জুর হইয়া গেল। ইহাতে সেই ছাত্রটি রাত্রিকালে ওস্তাদের কাছে যাইয়া

তাঁহাকে ঘর হইতে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া বলিল ঃ মৌলবী ছাহেব ; যদি ভালই চান, তবে "ছদ্‌রা" কিতাবই পড়ান ঃ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

এমতাবস্থায় এ সমস্ত হতভাগাদের কি এল্‌ম হাছিল হইবে ? কেবল কিতাবের পর কিতাব শেষ করিয়া যাইবে ; কিন্তু এল্‌ম যাহার নাম উহার বাতাসও ইহাদের গায়ে লাগিবে না। আবার আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে ওস্তাদ ঘরে পড়াইয়া থাকেন তাহাদের কিছু কদর করা হয়, ছেলে পেলেরাও করে, তাহাদের মা বাপেও করে। অথচ তাহাদিগকে কিছু বেতনও দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে মাদ্রাসার ওস্তাদগণের কিছুই সম্মান করা হয় না।

অথচ তাহাদিগকে ছাত্রগণ কিংবা তাহাদের মাতা-পিতা কোন বেতনও দেয় না যাহার দাবী থাকিতে পারে ; বরং মুদাররেসগণ মাদ্রাসা হইতে বেতন পাইয়া থাকেন। কিন্তু তালেবে এলমগণ এ সমস্ত ওস্তাদেরই নাফরমানী অধিক করিয়া থাকে। অথচ মুদাররেসগণ তাহাদিগকে কিছু বলিতে পারেন না। কেননা, মাদ্রাসা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। ছাত্র মাদ্রাসা ছাড়িয়া চলিয়া গেলে চাঁদা কমিয়া যাওয়ার ভয়। অতএব, বুঝা যায়, মাদ্রাসার ওস্তাদ সাহেবানের উদ্দেশ্য চাঁদা। এই উদ্দেশ্যেই তালেবে এলম জোগাড় করিয়া রাখা হয়। কিন্তু চাঁদার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে বলা হয় ঃ "তালেবে এল্‌মদের সাহায্যের জন্যই চাঁদা লওয়া হইতেছে।" বুঝিতে পারি না যে, এই একে অন্যের উপর নির্ভরতা কিরূপ— "চাঁদার উদ্দেশ্য ছাত্র আর ছাত্রের উদ্দেশ্য চাঁদা"। এই কারণেই ছাত্রেরা মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দের সম্মান করে না। তাহার কারণ, মনে করে যে, মাদ্রাসার অস্তিত্ব আমাদেরই দ্বারা। আমরা না থাকিলে মাদ্রাসাই থাকিবে না। সুতরাং তাহারা যদৃচ্ছা ওস্তাদ ছাহেবানকে নাচায়। কিন্তু স্মরণ রাখিও, এইরূপে এল্‌ম হাছিল হয় না। এই মহাধন একমাত্র আদবের দ্বারাই হাছিল হইয়া থাকে।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেবের নিকট কেহ হযরত মাওলানা কাসেম ছাহেবের এল্‌মের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। তিনি আমার সামনেই উত্তর দিয়াছিলেন ঃ "মাওলানা এই এল্‌মের শ্রেষ্ঠত্বের অনেক কারণ আছে—তন্মধ্যে একটি কারণ ইহাও যে, তিনি নিজের ওস্তাদ ছাহেবানের খুব আদব ও ভক্তি করিতেন।

একবার থানা ভোয়ানের জনৈক আতর বিক্রেতা মাওলানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যখন বলিল যে, "আমি থানা ভোয়ানের বাসিন্দা" এইকথা শুনিবা মাত্র মাওলানা একেবারে গলিয়া গেলেন। তাহার খাতির সমাদরের জন্য মাটিতে বিছাইয়া যাইতে লাগিলেন। শুধু এই কারণে যে, লোকটি থানা ভোয়ানের অধিবাসী

যাহা তাঁহার মুরশেদের জন্মভূমি। আফ্সুস! এ সমস্ত মহাপুরুষ নিজেদের ওস্তাদ মুরশেদের দেশীয় মূর্খ ও অশিক্ষিত লোকদেরও এরূপ সম্মান করিতেন। আর আজ কাল স্বয়ং ওস্তাদ মুরশেদেরই সম্মান করা হয় না।

॥ আলেমদের সম্মান ॥

বন্ধুগণ! আলেমদের সম্মান করা নিতান্ত আবশ্যক। হাদীসে আছে:

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا (وَلَمْ يُجِلَّ عَالِمَنَا) فَلَيْسَ مِنَّا -

"অর্থাৎ, যাহারা আমাদের ছোটদের প্রতি সদয় ব্যবহার না করে এবং বড়দের সম্মান না করে (এবং আলেমদের কদর না করে।) তাহারা আমাদের মধ্যে নহে।" ইহা কত কঠিন ধমক! কিন্তু আফ্সুস! তালেবে এল্মগণ ইহার উপর আমল করে না। তদুপরি এ সমস্ত ওস্তাদ ছাহেবান আলেম এবং মুরব্বি হওয়া ছাড়াও তাঁহাদের সম্মান এইজন্যও করা আবশ্যক যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর ওয়ারিস এবং রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

* يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ -

* وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ -

* وَلَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا -

* وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوْا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوْهُ -

অর্থাৎ, 'রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে অগ্রবর্তী হইও না এবং রাসূলুল্লাহকে কখনও এমনভাবে ডাকিও না যেমন ভাবে তোমরা একে অন্যকে ডাকিয়া থাক; বরং আদবের সহিত কথা বলিও। আর যখন কোন মজলিসে তাঁহার নিকট বসিয়া থাক, তখন তাঁহার অনুমতি গ্রহণ ভিন্ন তথা হইতে উঠিয়া যাইও না।"

এই আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত হক বর্ণিত হইয়াছে হুযূর (দঃ)-এর পরে তাঁহার খলীফা ও এল্মের ওয়ারিসগণ সে সমস্ত হকের অধিকারী। কেননা, নির্দিষ্ট হওয়ার কোন দলিল নাই; বরং যে হাদীসে

ওলামায়ে কেরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তাকীদ আসিয়াছে সে সমস্ত হাদীসে এই হুকুম রাসূলের সমস্ত এল্‌মী ওয়ারিসগণের জন্য ব্যাপক বলিয়াই বুঝাইতেছে। এই কারণে প্রাচীনকালের আলেমগণ রাসূলের ওয়ারিসগণের তদ্রূপ সম্মানই করিতেন যাহা উপরোক্ত আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে। যাহা হউক, ওস্তাদের সম্মান করাও তাক্‌ওয়ার অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে যে ব্যক্তি ত্রুটি করিবে সে মুত্তাকী হইবে না। ইহাতে ত্রুটি করার প্রধান কারণ এই যে, তালেবে এল্‌মগণ তাক্‌ওয়ার প্রতি কোন গুরুত্বই দেয় না। তাক্‌ওয়া সম্বন্ধে আপনাদিগকে একটি নিগূঢ় কথা বলিয়া দিতেছি, স্মরণ রাখিবেন। তাহা এই যে, নফল এবাদত এবং যেকের ও ওযীফা অধিক পরিমাণে না হইলেও পরহেযগারী অর্থাৎ সর্বদা পাপ কার্য এবং শরীয়ত-নিষিদ্ধ কার্য পরিহার করার প্রতি খুব লক্ষ্য রাখিবেন। হাদীসে আছে :

لَا تَعْدِلْ بِالرِّعَةِ

"কোন বস্তুকেই পরহেযগারীর সমকক্ষ করিও না।"

॥ আন্‌ওয়ার ও আস্‌রার ॥

আমার বর্ণনার মধ্যস্থলে এল্‌ম বৃদ্ধির তফ্‌সীল পেশ করিবার যেই ওয়াদা করিয়াছিলাম—এখন তাহা পালন করিতেছি। তাহা এই যে, এল্‌ম-এর বৃদ্ধি ঐ সমস্ত এল্‌মের মধ্যেই উদ্দেশ্য যাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। আর যে সমস্ত এল্‌মের বিষয় প্রকাশ করা হয় নাই, তাহাতে বৃদ্ধি কাম্য নহে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে : একবার ছাহাবায়ে কেরাম তকদীর সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। হুযূর (দঃ) ইহাতে খুব অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন :

أَبِهٰذَا خُلِقْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهٰذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ لَقَدْ

هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِيْنَ تَنَازَعُوْا فِي الْقَدْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ

أَنْ لَّا تَنَازَعُوْا فِيْهِ - ترمذى' ابن ماجه' مشكواة

"এজন্যই কি তোমরা সৃষ্ট হইয়াছ ? কিংবা এবিষয়ে কি তোমাদিগকে হুকুম করা হইয়াছে ? অথবা এবিষয় লইয়াই কি আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছি ? তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ এই কাযা ও কদর (তকদীর) সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতে গিয়াই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি তোমাদিগকে কসম দিতেছি। আমি তোমাদিগকে কসম দিতেছি, এসম্বন্ধে কখনও তর্ক-বিতর্ক করিও না।" —তিরমিযী, ইবনে মাজা,

মেশ্‌কাত। কোন্ কোন্ এল্‌ম যাহির করা হইয়াছে আর কোন্‌ কোন্‌ এল্‌ম যাহির করা হয় নাই—তাহাই এখন আমি নির্দিষ্ট করিয়া বলিতেছি। ইহার মাপকাঠি এই যে, কোন কোন এল্‌ম এমনও আছে—আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভে কিংবা আল্লাহ্ হইতে দুরে সরিয়া পড়াতে উহাদের দখল রহিয়াছে। যেমন, আল্লাহ্‌র আদিষ্ট কার্যসমূহ এবং নিষিদ্ধ কার্যসমূহ। এ সমস্ত বিষয়ের এল্‌ম তো শরীয়ত যাহির করিয়াই দিয়াছে। ছাহাবায়ে কেরাম এসমস্ত বিষয়ের এল্‌ম বৃদ্ধি করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করিতেন। হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন:

كَانُوا يَسْأَلُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ أَقَعَ فِيهِ -

অর্থাৎ, "ছাহাবায়ে কেরাম ভাল কাজের বিষয় নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন, যেন উহা পালন করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার অধিক নৈকট্য লাভ করিতে পারেন। আর আমি তাঁহাকে মন্দ কাজ সম্বন্ধে অধিক জিজ্ঞাসা করিতাম যেন তাহাতে পতিত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলা হইতে দুরে সরিয়া না পড়ি।" এই কথাটি কোন কবি বলিয়াছেন:

عَرَفْتُ الشَّرَّ لَا لِلشَّرِّ لٰكِنْ لِتَوَقِّيْهِ + وَمَنْ لَّا يَعْرِفُ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَعْ فِيْهِ

"আমি মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে উহার পরিচয় লাভ করি নাই; বরং উহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য অবহিত হইয়াছি। আর যে ব্যক্তি ভাল-মন্দের পার্থক্য জানিয়া লয় নাই, সে ব্যক্তি মন্দ কাজে লিপ্ত হইয়া পড়িবে।"

ফলকথা, যে সমস্ত এলম সম্বন্ধে শরীয়ত নির্দিষ্টরূপে যাহির করিয়া দিয়াছে সে সমস্ত এলমের বৃদ্ধি তো অবশ্যই কাম্য। আর এক প্রকারের এলম আছে নৈকট্য লাভ করা এবং দুরে সরিয়া পড়ার ব্যাপারে যাহার কোন দখল নাই। যেমন, তকদীরের তথ্য জানিয়া লওয়া। পুলসিরাতের হাকীকত্‌ জানা, নামায কেন পাঁচ ওয়াক্ত নির্দিষ্ট হইল, কম বেশ কেন হইল না? এসমস্ত বিষয়ের হাকীকত জানিয়া লওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। এই জ্ঞানলাভে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জনেও কোন উন্নতি হয় না। না জানিলেও দুরে সরিয়া পড়িতে হয় না। এসমস্ত এলমকে আসরার অর্থাৎ রহস্য বলা হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভেও তাহা হইতে দুরে সরিয়া পড়ার ব্যাপারে যে সমস্ত এল্‌মের দখল আছে উহাদিগকে আনওয়ার অর্থাৎ 'আলো' বলা উচিত। উহা-দের জন্য এই উপাধিটি এইজন্য সমীচীন হইতেছে যে, 'নুর' প্রকৃতপক্ষে নিজে যাহির বা প্রকাশ্য এবং অপরকে যাহির অর্থাৎ প্রকাশকারী। আর এসমস্ত এল্‌মও এইরূপই যে, মূলতঃ ঐ সমুদয় এলম স্বয়ং প্রকাশ্য এবং তদনুযায়ী আমল করিলে রহস্যসহ,

উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে,যদিও রহস্য(আসরার)অবগত হওয়া কাম্য নহে। তথাপি আসরার সম্বন্ধীয় এল্‌ম হাছেল করিবার উপায় এই নহে যে, বিনা মাধ্যমে উহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবে; বরং প্রকৃষ্ট উপায় ইহাই যে, প্রথমতঃ আনওয়ার নামক এলমগুলি হাছিল কর। অতঃপর তদনুযায়ী তাকওয়ার সহিত আমল কর। তাহা হইলে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজেই যাবতীয় রহস্য সম্বন্ধীয় এলম তোমাদের অন্তরে উৎপন্ন করিয়া দিবেন। এসমস্ত এলমকে আনওয়ার নামে আখ্যায়িত করার পোষকতায় আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিতেছেনঃ

يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

"আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের নূরের প্রতি যাহাকে ইচ্ছা হেদায়ত করিয়া থাকেন।" অন্যত্র তিনি আরও বলিয়াছেন :

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِىَ اَقْوَمُ

"কোরআন সরল পথের দিকে হেদায়ত করিয়া থাকে।" বলাবাহুল্য, যাহা কোরআনের হেদায়ত তাহাই আল্লাহ্‌র হেদায়ত। অতএব, যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোরআন হেদায়ত করিয়াছে অর্থাৎ যে সমস্ত বিষয়ের এল্‌ম নির্দিষ্টরূপে যাহির করিয়া দিয়াছে তাহা নূর অর্থাৎ প্রকাশ্য হওয়া প্রমাণিত হইয়া গেল।

অতএব, الٓمّٓ বাক্যে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হে শ্রোতাগণ। যে সমস্ত এল্‌মের বৃদ্ধিকরণ কাম্য উহা তাহাই যাহা যাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তোমরা উহাতে উন্নতি বা বৃদ্ধি কামনা কর এবং রহস্য বা আসরার সম্বন্ধীয় এল্‌মের পশ্চাতে লাগিও না যাহার নমুনা এই : الٓمّٓ । এই বিষয়টি "আলে এমরান" সূরায় আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে :

هُوَ الَّذِىْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ط فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ج وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ م وَالرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ لا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ ○

"তিনি সেই আল্লাহ্‌ তা'আলা যিনি তোমাদের উপর কিতাব নাযিল করিয়াছেন। যাহার এক অংশ ঐ সমস্ত আয়াত যাহার উদ্দেশ্য দুর্বোধ্য হওয়া হইতে রক্ষিত অর্থাৎ উহাদের মর্মার্থ প্রকাশ্য ও স্পষ্ট এবং এই আয়াতগুলিই উক্ত কিতাবের মূল লক্ষ্য। (অর্থাৎ, অস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট আয়াতগুলিকেও এসমস্ত স্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট আয়াতগুলির

অনুরূপ করিয়া লওয়া হয়)আর অপর অংশের আয়াতগুলি দুর্বোধ্য। (অর্থাৎ, উহাদের অর্থ গুপ্ত রহিয়াছে।) যাহাদের অন্তরে বক্রতা রহিয়াছে তাহারা এসমস্ত আয়াতের পাছেই লাগিয়া যায় যাহা দুর্বোধ্য। উদ্দেশ্য—ধর্মের মধ্যে ফেৎনা সৃষ্টি করা এবং ভুল অর্থ আবিষ্কার করা। (যেন নিজেদের ভ্রান্ত মতে উহা হইতে পোষকতা লাভ করা যায়। অথচ উহার সঠিক মতলব ও রহস্য আল্লাহ্ তা'আলা ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে। আর (এই কারণেই) যাহাদের এল্‌ম্ দৃঢ় ও মজবুত তাহারা (এসমস্ত আয়াত সম্বন্ধে) এরূপ বলিয়া থাকে—আমরা ইহার উপর (মোটামুটি) বিশ্বাস রাখি। সমস্ত আয়াতই আমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে বটে। (স্পষ্ট অর্থ বিশিষ্ট আয়াতগুলিও এবং অস্পষ্ট অর্থবিশিষ্ট আয়াতগুলিও। অতএব, বাস্তবিক এসমস্ত আয়াতের প্রকৃত অর্থ যাহা—তাহা সত্য) আর নছীহত (সম্বন্ধীয় কথা) তাহারাই কবুল করিয়া থাকে যাহারা জ্ঞানী (অর্থাৎ, আকলও ইহাই চায় যে,) হিতকর এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে মশগুল হও এবং ক্ষতিকর ও অনর্থক কিস্‌সা কাহিনীতে লিপ্ত হইও না। বয়ানুল কোরআন। এই আয়াতটিতে এল্‌মকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটি এল্‌মে মুহ্‌কাম, আর একটি এল্‌মে মুতাশাবেহ্ এবং ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এল্‌মে মুহ্‌কামই (স্পষ্ট ও যাহিরকৃত এল্‌মগুলিই) কাম্য ও উদ্দেশ্য এবং এলমে মুতাশাবেহের (অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য এল্‌মগুলির) পাছে লাগা নিন্দনীয়। বাস,এখন এলম বৃদ্ধিকরণ সম্বন্ধে সুন্দর ও বিস্তারিতভাবে পরিষ্কার বুঝা গেল যে,প্রত্যেক এলমই কাম্য নহে; কেবল স্পষ্ট এবং যাহিরকৃত এল্‌মই উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় আজকাল মানুষ এসমস্ত এলমের পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে। অথচ ইহার পাছে লাগিতে নিষেধ করা হইয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করে—নামায পড়ার যুক্তি কি? কেহ বলে—জমাতে নামায পড়ার মধ্যে দার্শনিক যুক্তি কি? কেহ রোযা এবং হজ্জ ফরয হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করে। অথচ শরীয়ত খোদার নির্দেশসমূহের কারণ জানার জন্য আদেশ করে নাই। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কারণ বর্ণনা করিয়াছেন—যেমন, বিড়ালের ঝুটা সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

انها من الطوافين عليكم و الطوافات

"বিড়াল তোমাদের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়ায়।" তাহাও মুজতাহেদগণের জন্য বর্ণনা করিয়াছেন যদ্দ্বারা শরীয়তের বিধানসমূহ আবিষ্কার করিতে পারেন। সাধারণ লোকের তাহা অবগত হওয়ার দরকার নাই। কেননা, সাধারণ লোকের মধ্যে এজ্‌তেহাদের যোগ্যতা তো দূরের কথা কোন কোন যুক্তি বুঝিবার যোগ্যতাও নাই। সুতরাং উক্ত আস্‌রার অর্থাৎ দুর্বোধ্য ও গুপ্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কর্তব্য এই যে, كل من عند ربنا "সবগুলিই আমাদের পরওয়ারদেগারের তরফ হইতে" বলিয়া উহাকে বিশ্বাস কর যে, আল্লাহ্ তা'আলার বিধানসমূহে অবশ্যই

যুক্তি আছে—যদিও আমরা জানি না। আর দুর্বোধ্য আয়াতসমূহেও কোন অর্থ নিশ্চয়ই আছে—যাদিও আমরা অবগত নহি। উহাতে যে উদ্দেশ্য আছে তাহা সত্য বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিতেছি। কোরআন শরীফের পৃথক পৃথক হরফসমূহের বেলায়ও এরূপ বিশ্বাস রাখা উচিত।

এখন আমি ওয়ায শেষ করিতেছি। যদিও বক্তব্য বিষয় মনে আরও আসিতেছে। কিন্তু এখন রাত্র বারটা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রোতাগণও ঘুমাইতে আরম্ভ করিয়াছেন আমিও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমার বর্ণনার সারাংশ এই যে, সমস্ত মুসলমানের প্রতি বিশেষ করিয়াতালেবে এল্‌মদেরপ্রতি এলম বৃদ্ধি করারএবংএলমের নূর হাছিল করার আদেশ করা হইয়াছে। ইহার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। উহার উপায় দুইটি—দোআ করা এবং গুনাহের কাজ হইতে দূরে থাকা। এই বিষয়টি হইতে যেহেতু অনেকের মনই শূন্য অথচ বিষয়টি নিতান্ত জরুরী ছিল। এই কারণেই আমার অদ্যকার ওয়াযে উক্ত বিষয়টি অবলম্বন করিয়াছি। অবশ্য বেশী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা গেল না। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলীর অধিকাংশই আলেম, আশা করি এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই তাঁহাদের জন্য যথেষ্ট হইয়া থাকিবে।

এখন দোআ করুন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন আমাদিগকে ইহা পালনের তওফীক দান করেন :

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوٰنَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

॥ কতিপয় তাওজীহ্ ॥

ওয়াযের ভিতরে কোন কোন বিষয় মনে বিদ্যমান ছিল। শেষ পর্যন্ত মনে থাকে নাই। আর একটি বিষয় শেষভাগেই মনে আসিয়াছে। বিশেষ হিতকর বলিয়া লিখিয়া দেওয়া হইতেছে। প্রথমত: (এই বিষয়টি পরে মনে আসিয়াছে) ইহা খোদা প্রদত্ত এল্‌ম যাহা তাকওয়ার কারণে হাছিল হয়।

ইহা সম্বন্ধে হাদীসে আসিয়াছে :

مَنْ اُوْتِیَ زُهْدًا فِی الدُّنْیَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَاِنَّهٗ یُلَقَّی الْحِكْمَةَ

"যাহাদিগকে ইহজগতে যোহ্‌দ অর্থাৎ সংসারের প্রতি বিরাগভাব দান করা হয় এবং কমকথা বলার অভ্যাস দান করা হয় তাহাদের সংসর্গে যাও। কেননা, তাহাদের অন্তরেই হেকমত প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, (ইহা এবং পরবর্তী বিষয়টি ওয়াযের মধ্যস্থলে মনে বিদ্যমান ছিল) এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, "আপনার বর্ণনানুযায়ী هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ হইতে বুঝা যায় যে, হেদায়তের উপকরণ তাকওয়া এবং এল্‌ম বৃদ্ধির সহায়ক। আর :—

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰهُمْ تَقْوٰىهُمْ

"যাহারা হেদায়ত প্রাপ্ত হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের হেদায়ত বৃদ্ধি করেন এবং তাহাদিগকে তাক্‌ওয়া দান করেন।" আয়াত হইতে বুঝা যায়, হেদায়তই হেদায়তের কারণ। আর হেদায়ত হইতে তাক্‌ওয়া উচ্চস্তরে যাহা খোদা-প্রদত্ত বটে। অতএব, উভয় আয়াতের সমষ্টির সারমর্ম এই হয় যে, মানুষ যখন প্রথমতঃ ইচ্ছা ও চেষ্টা পূর্বক তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে, তখনই হেদায়ত হাছিল হয় এবং এই হেদায়তের উপর সুদৃঢ় থাকিলে আপনাআপনি উহাতে উন্নতি হইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হেদায়তের সর্বোচ্চ স্তরও উহারই ফলে তাহাকে প্রদত্ত হয়। اٰتٰهُمْ শব্দ হইতে বিশেষভাবে খোদাপ্রদত্ত বুঝা যায়। আর হেদায়ত যে তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর তাহার নিদর্শন মুহ্‌তাদীনের প্রতি ধাবমান সর্বনামটির দিকে তাক্‌ওয়া শব্দটিকে اَضَافَتْ অর্থাৎ সম্বন্ধ করা। ইহাতেই বুঝা যায়, এখানে কামেল হেদায়ত উদ্দেশ্য। وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا অর্থাৎ, اَلسَّعْىُ الْمُنَاسِبُ لَهَا উহার উপযোগী চেষ্টা করিয়াছে। এইরূপে এখানেও অর্থ اَلتَّقْوٰى الْمُنَاسِبُ لِشَانِهِمْ তাহাদের উপযোগী তাকওয়া এবং তাহারা কামেল।

وَهُمُ الْكَامِلُوْنَ فَالتَّقْوٰى الْمُنَاسِبُ لِلْكَامِلِيْنَ هُوَ الْكَامِلُ مِنْهُ

অতএব, কামেল লোকের উপযোগী তাক্‌ওয়া কামেলই হইবে।

তৃতীয়তঃ এই ওয়াযটির নাম মনোনীত হইল "কাওসারুলওলুম" কেননা, ইহাতে এল্‌মের বৃদ্ধিকরণ হেকমতের উৎস-এর বর্ণনা রহিয়াছে। আর "আল্লাহ্ তা'আলা যাহাকে হেকমত দান করেন তাহাকে ভুরি ভুরি মঙ্গল দান করেন :

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِىَ خَيْرًا كَثِيْرًا

আর كَوْثَر শব্দের তফ্‌সীরও "ভুরি ভুরি মঙ্গলই" করা হইয়াছে। এই ভিত্তিতেই বেহেশ্‌তের নির্দিষ্ট নহরকে 'কাওসার' বলা হইয়াছে। কেননা, তাহাতে ভুরি ভুরি মঙ্গল রহিয়াছে ; বরং কোন কোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানী তফ্‌সীরকারক সেই নহরের প্রকৃত অর্থই এল্‌ম এবং হেকমত বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা এই যে, তত্ত্ববিদগণ বর্ণনা করিয়াছেন আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী ও গুণাবলীর কিছু সদৃশ আকার গুণ ও অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলমে বরযখে ও আলমে আখেরাতের মধ্যে আল্লাহ্

তা'আলা সৃষ্টি করিয়াছেন ; কোন কোনটির কথা হাদীস শরীফেও উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন, সূরা-বাকারাহ্ এবং সূরা-আলে-এমরান দুইটি বাদলীয় (ছাতার) মত প্রকাশিত হওয়া এবং উভয় সূরার মধ্যস্থিত 'বিস্‌মিল্লাহ্' উক্ত বাদলীদ্বয়ের মধ্যস্থলে চমকের মত দিপ্তীমান থাকা ইত্যাদি বর্ণনা করা হইয়াছে।

এইরূপে শরীয়তের আকার পুলসিরাতকে বলা হইয়াছে এবং এল্‌ম ও হেকমতের ছুরত হাউযে কাওসারকে বলা হইয়াছে। আর এই সামঞ্জস্য হেতু, হুযূরে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে যে দুধ দেখিয়াছিলেন, উহাকে এলমের ছুরত বলিয়া তা'বীর করিয়াছেন। কেননা উভয়ের মঙ্গলই অফুরন্ত, আর হাউযে কাওসারের পানি দুধের আকার বলিয়া হাদীসে বর্ণিত আছে।

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ